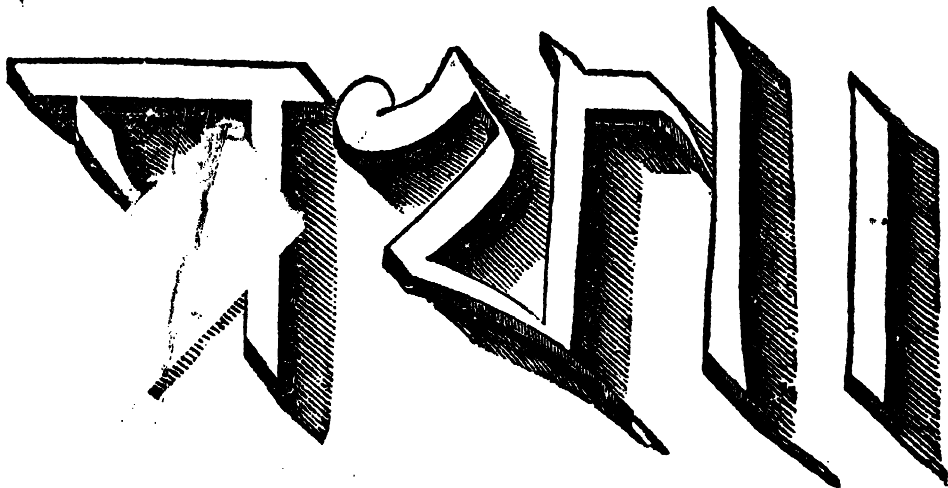


প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

দশম ভাগ।

১৮৯২।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

"THE CHILD IS THE FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা
৩৩নং মুসলমানপাড়া লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সূচীপত্র।



জানুয়ারি, ১৮৯২।

সম্ভাষণ।

জেগেছি মোরা উষার সাথে,
এসেছি "সখা" লইয়ে হাতে,
নব বরষে নবীন প্রাতে
নূতন উপহার।

এস বালক বালিকা যত,
খেলিব খেলা মনের মত,
"সখা"র মুখে শুনিব কত
সুখের সমাচার॥

দশম বর্ষ।

সখার বয়স আজ দশ বৎসর। ছেলের জন্ম দিনে ঘরে কত আনন্দ উৎসব হয়, কিন্তু আমাদিগকে প্রতি বৎসরই এই আনন্দের দিনে শোক করিতে হয়। প্রতিবৎসরই সখার জন্মদিনে প্রমদাচরণের শোক নূতন হইয়া উঠে। প্রমদাচরণ যাহাকে শিশু রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার সেই অনাথ শিশু দশ বৎসরের হইয়াছে। এই দশ বৎসরের সখাকে দেখিয়া তাঁহার আজ কতই না আনন্দ, কতই না সুখ হইত! আজ জন্মতিথিতে সখাকে তিনি কত সুন্দর বসন ভূষণে সাজাইয়া, সখার আত্মীয় স্বজন, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদিগকে লইয়া উৎসব করিতেন। কিন্তু আমাদিগকে এই পিতৃহীন শিশুকে লইয়া এ দিনে প্রতিবৎসরই শোক করিতে হয়।

একদিকে যেমন প্রমদাচরণের শোক, আর একদিকে,—পিতৃমাতৃহীন সন্তানের যেমন অযত্ন হয়, প্রমদাচরণের অভাবে সখার ও তেমনি অযত্ন হইতেছে—ইহাও আমাদের এক গুরুতর শোক। পিতৃমাতৃহীন সখার উপযুক্ত প্রকার যত্ন ও লালন পালন হইতেছে না, আমরা তাহা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি। অনাথ বলিয়া যে ইহাকে অযত্ন করিতেছি—পিতৃমাতৃহীন বলিয়া যে ইহাকে তাচ্ছিল্য করিতেছি তাহা নহে। তবে প্রমদাচরণের যত্ন, আদর, স্নেহ আমরা কোথায় পাইব? তাঁহার আদরের সখার প্রতি তাঁহার যে যত্ন, মমতা ও স্নেহ ছিল, আমাদের শত চেষ্টা সহস্র যত্নও তাহার তুলনায় তুচ্ছ। আমরা তাঁহার আদরের শিশুকে কোনমতে এই দশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছি মাত্র। তাঁহার অভাবে তাঁহার যত্নের সখার অকাল মৃত্যু ঘটে নাই, সকল কষ্টের মধ্যে আমাদের ইহাই একটু মাত্র সান্ত্বনা।

সখার পাঠক পাঠিকা এবং সখার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখক অনুগ্রহ করিয়া এবার সখাতে লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, স্থানান্তরে তাঁহাদের কয়েকজনের নামও পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। আমাদের আশা আছে এই সকল কৃতবিদ্য এবং জ্ঞানী ও বহুদর্শী লেখকগণের সাহায্যে সখা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতররূপে পরিচালিত হইবে, এবং যে উদ্দেশ্যে প্রমদাচরণ সখার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা উত্তম রূপে সিদ্ধ হইবে।

যাঁহারা কৃপা করিয়া সখাতে লিখিয়াছেন, যাঁহারা সখার উন্নতির জন্য সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহারা ইহার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং যে সকল পাঠক পাঠিকা সখাকে "সখা" বলিয়া আদর করিয়া লইয়াছেন, আজ সখার জন্মদিনে তাঁহাদিগের সকলকেই অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যদি সখার কোন হিতৈষী বন্ধু বা পাঠক পাঠিকা আমাদিগের কোন ত্রুটী বশতঃ বিরক্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের সে ত্রুটী ক্ষমা করিয়া, তাঁহাদের সখাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের সহিত গ্রহণ করুণ। প্রমদাচরণ স্বর্গ হইতে তাঁহার আদরের সখাকে আশীর্ব্বাদ করুণ, আমরা সেই আশীর্ব্বাদ এবং যিনি সকল শুভ কার্য্যের চির সহায় সেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লইয়া সখার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হই।

পাঠক পাঠিকাগণ! নববর্ষে—আজ সখার জন্মদিনে তোমাদিগকে আন্তরিক স্নেহ জানাইতেছি, তোমরাও তোমাদের "সখাকে" স্নেহের সহিত গ্রহণ কর।



বিবিধ।

আমরা অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, নশিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী কুন্দকুমারী গুপ্তা, আমাদের সখার একজন গ্রাহিকা, বৈদ্যনাথ এবং বোম্বাই কুষ্ঠ নিবাসের সাহায্যের জন্য আমাদের নিকট ২৪৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। নিরাশ্রয় নিঃসহায়, দুঃখী অনাথদিগের প্রতি দয়া জন্মাইবার জন্য যে সমস্ত প্রবন্ধ বা গল্প "সখা"য় লেখা হইয়াছে, আজ সে সমস্ত আমরা স্বার্থক মনে করিতেছি। আমরা আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ শ্রীমতী কুন্দকুমারীর এই সৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবেন।

*
* *

এণ্টারপ্রাইজার নামক জাহাজ খানি ঝড়ে জলমগ্ন হইলে, আণ্ডামান দ্বীপের যে কয়টী বন্দিনী স্ত্রীলোক আপনাদিগের প্রাণের মমতা না করিয়া সেই জাহাজের কয়েকজন জলমগ্ন নাবিককে উদ্ধার করিয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের এই সৎকার্য্যের জন্য সকলেরই কারাদণ্ড কমাইয়া পুরস্কৃত করিয়াছেন।

*
* *

মুক্তিফৌজের পর-হিতৈষী পুরুষও রমণীরা এক সপ্তাহকাল, প্রত্যেকে প্রতিদিন কিছু কিছু কম করিয়া আহার করিয়া, দুই লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছেন। এই দুই লক্ষ টাকা অনাথ দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য ব্যয় করা হইতেছে। পরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা থাকিলে কত প্রকারে তাহা করিতে পারা যায়।

*
* *

এবৎসর আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে। কত দুঃখী অনাথ দুর্ভিক্ষে এক মুঠা অন্নের অভাবে মরিবে। আমরা আশা করি, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ দুঃখী অনাথকে এক মুঠা অন্ন দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

*
* *

ফনোগ্রাফের নাম বোধ হয় তোমরা শুনিয়া থাকিবে। এই ফনোগ্রাফের আবিষ্কার যিনি করিয়াছেন, তাঁহার নাম এডিসন, তিনি একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক। এডিসন সাহেব সম্প্রতি নাকি এমন একটী ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন যে, ঘড়ীটি আবশ্যকমত কথা বলিতে পারিবে। রাত্রি প্রভাত হইলে ঘড়ী বলিয়া উঠিবে "উঠ, উঠিবার সময় হইয়াছে।"

*
* *

গত ২৩শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং বড়লাট উপস্থিত থাকিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন। এবৎসর ২৪০ বি,এ ; ৫২ জন এম এ, একজন এম ডি ; ৪জন এম বি উপাধি পাইয়াছেন। এবার দুইটী মহিলা—শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা সোম এম এ,এবং শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত বি এ, উপাধি পাইয়াছেন।



এলবার্ট ভিক্টর।



রাজপৌত্র এলবার্ট ভিক্টরের অকালে মৃত্যু হইয়াছে। সখার পাঠক পাঠিকাগণ এ শোক সংবাদ এতদিনে অবশ্যই পাইয়াছ। যাহার জন্ম আছে, তাহারই মৃত্যু আছে। চির দিন কেহই বাঁচিয়া থাকে না। সুতরাং মৃত্যুতে শোক করা বৃথা। কিন্তু মানুষের মনে তাহা বুঝে না। বিশেষ, যদি প্রবল ঝড়ে একটী পুরাতন শুষ্ক বৃক্ষ পড়িয়া যায়, তাহাতে মনে বড় দুঃখ হয় না। কিন্তু ফল ফুলে শোভিত একটী কচি গাছকে যদি ঝড়ে ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যায়, তবে মনে বড় কষ্টটাই হয়। তোমরা সেই প্রফুল্ল মূর্ত্তি, সৌন্দর্য্য ও সরলতা মাখা মুখ খানি বোধ হয় এত শীঘ্র ভুলিয়া যাও নাই। সে অধিক দিনের কথা নহে,—দুই বৎসরের পূর্ব্বে এই

জানুয়ারী মাসেই তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন, এবং সেই উপলক্ষে কত উৎসব কত আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল। আর ১৮৯২ সালের ১০ই জানুয়ারী সেই প্রফুল্ল মূর্ত্তি, সেই সৌন্দর্য্য ও সরলতা মাখা মুখ খানি চির দিনের জন্ম মলিন হইয়া গিয়াছে।

বিলাতের লোক এই দারুণ শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এদেশের লোকেও আজ সেই শোকে ম্রিয়মাণ। আমাদের রাজার পরিবারে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাই এলবার্ট ভিক্টরের মৃত্যুতে আমরাও দুঃখ করিতেছি। অন্যের দুঃখের কথা যাক; এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি মহারাণী পিতামহী ভিক্টোরিয়ার হৃদয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে কি দারুণ আঘাৎ লাগিল? মহারাণী তাঁহার আদরের এডিসের বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, সে বিবাহের আয়োজন আজ মৃতের সৎকারে নিয়োজিত হইল। আবার ভাবিয়া দেখ দেখি যোগ্য পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবৎসল পিতা প্রিন্স অবওয়েলসের হৃদয়েই বা কি কঠিন আঘাৎ লাগিয়াছে। আর ভাবিয়া দেখ সেই অভাগিনী জননীর অবস্থা; তাঁহার স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করিয়া, তাঁহার কোল শূন্য করিয়া প্রাণের প্রিয়তম পুত্র—স্নেহের পুত্তলী এলবার্ট তাঁহাকে চিরদুঃখে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছে। অভাগিনী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন—কিন্তু নিজের জীবন দিয়াও ত যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরাইয়া পাইবেন না! এলবার্টের শোকে আরও একজন আজ মৃত-প্রায়; ইনি প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া মেরি অব টেক্। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলবার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। মহা ধুমধামের সহিত বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইতেছিল, বৃদ্ধা পিতামহী, পিতা ও স্নেহময়ী জননী, বড় সাধ করিয়া যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, আজ মৃত্যু সে সাধে বিষম বাদ সাধিয়াছে। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক কুসুমের ন্যায় আজ এই দারুণ শোকে প্রিন্সেস্ মেরি মৃত প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। শুনিতেছি চিকিৎসকেরা ইহাঁদের অবস্থা দেখিয়া নানা প্রকার মন্দ আশঙ্কা করিতেছেন। মানুষের সাধ—মানুষের আশা এমনি করিয়া ফুরায়!

আমরা সংক্ষেপে যুবরাজকুমারের জীবনের কথা বলিব। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ৮ই জানুয়ারী যুবরাজপত্নী প্রিন্সেস্ অবওয়েল্‌সের প্রথম পুত্র জন্মে। এই সুখের সংবাদে পিতামহী ভিক্টোরিয়া স্বামীর মৃত্যুশোক কতক ভুলিলেন। রাজ্যের চারিদিকে এই সংবাদ অল্পকাল মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িল। রাজবাড়ী এবং দেশের প্রতি গৃহে উৎসব হইতে লাগিল। ইহাঁর নাম হইল—প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর ক্রিশ্চান এডওয়ার্ড। যুবরাজ-কুমার বয়সের সঙ্গে খুব সুশ্রী হইয়া উঠিলেন। আকৃতিতে মাতার সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃতিতে মাতার সদ-গুণরাশি অনেকটা পাইয়াছিলেন। বাল্য বয়সে যে সকল শিক্ষা তাহা গৃহে মাতার নিকটই পাইয়াছিলেন। বার বৎসর পর্য্যন্ত গৃহে মাতার নিকট নানা প্রকার সুশিক্ষা পাইয়া তের বৎসর বয়সের সময় কনিষ্ঠভ্রাতা প্রিন্স্ জর্জ্জের সহিত ব্রিটেনিয়া নামক যুদ্ধ জাহাজে নৌযুদ্ধ-বিদ্যা শিখিবার জন্য ক্যাডেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর কাল এই কার্য্য শিক্ষা করেন। সাধারণ সৈনিকের ন্যায় কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি রাত্রি, কি দিন, সকল সময়েই এই গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইত,—তাহাতে কখনও অবহেলা করেন নাই। তারপর ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসে ব্যাকান্টী নামক যুদ্ধজাহাজে ইংরাজ ও অন্যান্য রাজাদিগের অধিকৃত সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশ ও নগর গুলি দেখিবার জন্য যাত্রা করেন। নানাদেশ ও নগর দেখিয়া ইহাঁদের

নানা প্রকার শিক্ষা হইবে, এই জন্যই প্রিন্স অব-ওয়েলস্ এপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৮৮২ সালের ৪ঠা আগষ্ট ব্যাকান্টী যুদ্ধ জাহাজ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল। দুই ভাই অনেক দিন পরে আবার বাড়ী ফিরিলেন। এই সকল শিক্ষা লাভ করিয়া ভিক্টর কেম্ব্রিজ ও হিডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া, যুদ্ধ-বিদ্যা শিখিবার জন্য এলডারশটে যুদ্ধ বিদ্যা শিখিবার যে বিদ্যালয় আছে, সেখানে যান। ১৮৮৩ সালে তিনি কে, জি, অর্থাৎ অর্ডার অব দি গার্টার উপাধি পান। তার পর নানা প্রকার উপাধিতে ভূষিত হইয়া ১৮৮৯, সালে ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য যাত্রা করেন। নভেম্বর মাসে বোম্বাই উপস্থিত হইয়া, ১৮৯০ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা আসেন। তখন এখানে যে উৎসব এবং আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল তাহা তোমাদের মনে থাকিতে পারে। ১৮৯০ সালের ২৩শে জুলাই এলবার্ট ভিক্টর "ডিউক অব ক্লেয়ারেন্স এণ্ড এভণ্ডেল" উপাধি পান।

এই রূপে যুবরাজকুমার এলবার্ট ভিক্টরের সম্মান ও গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধা পিতামহী মহারাণী পৌত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। মহা সমারোহে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। এমন সময় কাল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে যুবরাজকুমার পীড়িত হইলেন, দেখিতে দেখিতে রোগ কঠিন হইয়া, নিউমনিয়া রোগে দাঁড়াইল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! ১৪ই জানুয়ারী বেলা দশটার সময় এলবার্ট ভিক্টর, সুখের সংসার শোকে আঁধার করিয়া, চলিয়া গেলেন! এত আশা—এত আকাঙ্ক্ষা সকলই ফুরাইয়াগেল—এমন সাধে মৃত্যু বাদ সাধিল!



অদ্ভূত সৃষ্টি।

ছেলেবেলা যখন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিখিতাম, তখন মুগুর দিয়া পিটিলে যেগুলা বাজে তাহাকেই ঘড়ী বলিয়া জানিতাম; তদ্ভিন্ন আপনি চলে, আপনি বাজে, এমন ঘড়ী যে আছে তাহা জানিতামও না। সে অনেক দিনের কথা; এখন পাড়াগাঁয়ে ঘড়ীর অভাব নাই। তারপর ইংরাজী পড়িবার জন্য যখন কলিকাতায় আসিলাম তখন প্রথম ঘড়ী দেখিলাম। ছোট একটি আলমারির মত; দুই পার্শ্বে দুইটা লোহার হন্দরের মত দড়ি দিয়া ঝুলান। টক্ টক্ শব্দ করিতেছে। অনেকক্ষণ ত হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিলাম, তারপরে দেখি গলা ভাঙ্গা রকম স্বরে ঢঙ্ ঢঙ্ করিয়া সাতটা বাজিল। তখন আমার আমোদ দেখে কে। একটা দাসী নিকটে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওটা বাজালে কে ও টক্ টক্ করছে কে? সে বলিল ওর ভিতর ধর্ম্মরাজ আছেন তিনিই বাজান্; ওর নাম ধর্ম্ম-ঘড়ী ও আপনিই বাজে। কিছুদিন যে ঘরে ঘড়ীটা ছিল

সে ঘরে যাইয়া অশিষ্ট ব্যবহার করিতে ভয় হইত। ক্রমে দেখিতে দেখিতে আর সে ভাব থাকিল না, ঘড়ীর মধ্যে একটা যে কিছু আশ্চর্য্য আছে তাহা ভুলিয়া গেলাম। ৮৯ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটা মেলা হইয়াছিল; তাহাতে কত রকম নূতন কলকার খানা, কত রকম আশ্চর্য্য জিনিস মানুষে প্রস্তত করিয়া আনিয়াছিল তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। কৃষ্ণনগর হইতে যে সকল মাটির পুতুল আসিয়াছিল, যাহার অধিকাংশ এখন কলিকাতার যাদুঘরে রাখা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হইল যে, যে ব্যক্তি এই সকল পুতুল প্রস্তত করিয়াছে তাহার কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য। কেবল প্রাণটি দিতে পারে নাই আর সব ঠিক জীবন্ত মানুষের মত করিয়াছে। যে কয়দিন কলিকাতা ছিলাম প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। ক্রমে দেখিতে দেখিতে অভ্যাস হইয়া যাইতে লাগিল। মনে আশ্চর্য্যের ভাবটা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। এই মেলায় যে সকল অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে কেহ ধর্ম্মরাজের কথা কহিল না। স্বর্গীয় পিতামহ ঠাকুরের সেই বৃদ্ধা দাসী জীবিতা থাকিলে সে কি বলিত জানি না। একালের লোকেরা কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সকল বিষয় মিমাংশা করিতে চেষ্টা করে। ধর্ম্মরাজের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে না। মনুষ্য যতই শিল্পী হউক না কেন, সৃষ্ট পদার্থ সকল নানা কৌশলে একত্র করিয়া তদ্দারা আমাদিগের নানা প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে কিন্তু একটি বালুকণাও সেই পরম শিল্পী ভিন্ন আর কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না। মানুষের প্রস্তত করা কল অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আশ্চর্য্য বিষয় সকল আমাদিগের চতুর্দ্দিকে নিয়ত রহিয়াছে তাহা আমরা একবার ভাবিয়াও দেখি না এবং তাহা বুঝিবারও চেষ্টা করি না। পরিষ্কার রাত্রে ঘরের বাহিরে গিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিলে দেখিতে পাই, কোটী কোটী হীরকখণ্ড ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আবার প্রাতে উঠিয়া দেখি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পূর্ণিমার রাত্রে যে চাঁদের আলোতে মন আনন্দে নাচিতে থাকে, প্রাতঃকালে ঐ চাঁদ আর থাকে না। আবার পরদিন রাত্রে সেই চাঁদ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকি; সন্ধ্যা অতীত হইয়া যায়, চাঁদ আর উদয় হয় না। চারিদিক অন্ধকারে পরিপূর্ণ; মনে ভাবি চাঁদের বুঝি আজ অসুখ করিয়াছে আজ আর উঠিবে না। অনেকক্ষণ পরে চাঁদ উঠিল, কিন্তু আজ আর সেরূপ ঠিক গোল চাঁদ নাই, একটুখানি যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আবার পরদিন আরও দেরিতে চাঁদ উঠিল, দেখিলাম আরও খানিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই প্রকারে দিন দিন অন্ধকার বাড়িতে থাকে; চাঁদও ছোট হইতে থাকে। অমাবস্যার দিন একেবারেই চাদ দেখিতে পাই না। আবার একটু একটু করিয়া চাঁদ বড় হয়: আবার কিছুদিন পরে সেই পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতে পাই। কাহার আদেশমত চাঁদ এই প্রকারে অনন্তকাল উদয় হইতেছে ও অনন্তকাল উদয় হইবে? আর যে সূর্য্যদেব দিনের বেলায় আপন রশ্মিজালে চতুর্দ্দিক আলোকিত করেন সন্ধ্যার পর তাঁহার এ গৌরব, তাঁহার এ তেজই বা কোথায় যায়? কোন্ পুরুষের আদেশ মত সূর্য্য প্রতিদিন নিয়মিতরূপে তাঁহার কার্য্য করিতেছে? সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এ গুলি কি, কোথা হইতে আসিল, কোথা যাইবে, ইহাদিগের গতিবিধির কোন নিয়ম আছে, না যেটি যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপে চলিয়া বেড়ায়, না একের সহিত অন্যের সংস্রব নাই। এই সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে, আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে যে

কত আশ্চর্য্য বিষয় দেখি অথচ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি না, তাহা বুঝিতে পারিবে। গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেলে কোন সময়ে দেখি, জল খিদিরপুরের দিকে যাইতেছে, ঘাটের অনেক নীচে জল পড়িয়াছে, খানিকটা খানিকটা কাদা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, লোকের স্নান করিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে। আবার কোন সময়ে দেখি সিঁড়ির উপরের ধাপের কাছে জল উঠিয়াছে; কাশীপুরের দিকে জল ছুটিতেছে। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন জল এদিকে ওদিকে যায়, কেন বাড়ে কমে, সে বলিল জোয়ারের সময় জল বাড়ে আর কাশীপুরের দিকে যায়, আর ভাঁটার সময় জল কমে ও খিদিরপুরের দিকে যায়। এক দিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছি, দেখিতে দেখিতে একটা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল, মাঝি মাল্লারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া নৌকা সাবধান করিতে লাগিল। ঝড় নাই, বাতাস নাই, কোথাও কিছু নাই, একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া নদীবক্ষ ছাইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম একি, সে বলিল ইহাকে বাণ ডাকা বলে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, জোয়ার ভাঁটা কেন হয়? বাণ কেন ডাকে? সে বলিল পরমেশ্বর করিয়াছেন বলিয়া এই রূপ সব নদীতেই হয়। কিন্তু আমি একবার মুঙ্গের গিয়াছিলাম, সেখানকার গঙ্গাতে জল এক দিকেই যাইতে দেখিলাম, সে দেশের লোকে জোয়ার ভাঁটা বা বাণ ডাকার নামও কখন শোনে নাই। তখন মনে হইল নিশ্চয়ই কোন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে প্রকাণ্ড তিমি পর্য্যন্ত কি নিয়মে জন্ম গ্রহণ করে, কি উপায়ে বা বর্দ্ধিত হয়, এবং কি কারণেই বা মরিয়া যায়, মরিয়া গেলেই বা তাহাদের শরীর কোথা যায় এবং প্রাণীগণ যে সকল দ্রব্য আহার করে, তন্মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে যদ্দ্বারা তাহাদিগের শরীর পুষ্ট ও বলশালী হয়, এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে একই প্রকার নিয়ম অনুসরণ করিয়া জীবের পোষণ কার্য্য চলিতেছে। আবার দেখ একটী ক্ষুদ্র বীজ বপন করিয়া তাহাতে জল সেচন করিলাম, বীজ অঙ্কুরিত হইল; ক্রমে কচি কচি পাতা বাহির হইল; কালে তাহা একটী কঠিন গুঁড়িযুক্ত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ রূপে পরিণত হইল। কোমল বীজ কিসের আশ্রয়ে এইরূপ বৃহৎ বৃক্ষের আকার ধারণ করিল?

জলের এমন কি শক্তি আছে যাহাতে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সম্ভবে? প্রাণীগণের ও উদ্ভিদের পোষণ কি একই নিয়মের বসবর্ত্তী না ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়মে হইয়া থাকে মনে এই প্রশ্ন সদাই উঠে। উদ্ভিদের ত মুখ নাই দাঁত নাই পাকস্থলী নাই তবে কেমন করিয়া একই নিয়মে উদ্ভিদ ও জঙ্গমগণ পোষিত হয়? আকার গত সাদৃশ্য আমরা দখিতে পাই আর না পাই সৃষ্টির অপ্রতিহত নিয়মে একই ভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণিগণ পরিপুষ্ট হইতেছে, যখনই আমরা ইহা জানিতে পাই তখনই একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, যে বায়ু আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যে জল আমাদের জীবন স্বরূপ, যে সূর্য্য তারা চন্দ্র পরিশোভিত আকাশ আমাদের মস্তকোপরি বিরাজমান রহিয়াছে, এই সকল সম্বন্ধে এবং জীব ও উদ্ভিদ শরীরের উৎপত্তি, পোষণ ও মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা এই প্রবন্ধে বুঝাইয়া দিব। মৃত্যুর দ্বারা জীবের বা উদ্ভিদের শরীরের অংশ ধ্বংস হয় না। কেবল রূপান্তর মাত্র হইয়া বিশ্লিষ্ট অণু সকল স্বীয় স্বীয়

কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। বিশ্ব শিল্পীর এক অলক্ষ্য নিয়মে সৃষ্টি হইতেছে ও জীব-শরীর দ্বারা উদ্ভিদ-শরীর ও উদ্ভিদ-শরীর দ্বারা জীব-শরীর পুষ্ট হইতেছে। বায়ু ও জল নিয়ত গঠন, পোষণ ও পরিবর্ত্তন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সখার সুকুমারমতি পাঠক পাঠিকাগণের যাহাতে ধারণা হইতে পারে, তদ্রূপ ভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল ভ্রান্ত সংস্কার আছে তাহাও আমরা বুঝাইয়া দিব। এই সকল বিষয় বুঝিতে পারিলে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি হইবে।

ক্রমশঃ



পণ্ডিত অযোধ্যানাথ।

ভারত মাতার এবার বড়ই দুরদৃষ্ট। তাঁহার মুখ-উজ্জ্বলকারী সুসন্তানের সংখ্যা অতি কম। যে কয়েকটীর গুণে তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইতেছিল, একে একে তাঁহারা সকলেই অসময়ে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। অল্পদিন হইল ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সমস্ত ভারতবাসীকে কাঁদাইয়া মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়াছেন। সেই শোকের আগুন না নিভিতে নিভিতেই আবার পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সমস্ত ভারতকে শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। অযোধ্যানাথের নাম ইদানীং বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বড়দিনের (Christmas) সময় আমাদের দেশে যে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) অধিবেশন হইতেছে, অযোধ্যানাথ সেই মহাসমিতির সহযোগী জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। কংগ্রেসের জন্য প্রাণপণে খাটিয়া তিনি দেশের লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই কংগ্রেশরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান উপলক্ষেই অযোধ্যানাথের যশ ও গৌরব ভারতের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি কংগ্রেসের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন এবং সেই কংগ্রেসের জন্যই প্রাণ দিয়াছেন। গত বড়দিনের অবকাশে যে নাগপুরে কংগ্রেশের অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতেও তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার কণ্ঠ রবের প্রতিধ্বনি লয় হইতে না হইতেই তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। নাগপুর হইতেই ফিরিবার সময় তাঁহার সামান্য সর্দ্দি হয় এবং উহাই শেষে ভয়ানক নিউমনিয়াতে পরিণত হয়। সুচিকিৎসার অধীনে থাকা সত্ত্বেও ঐ নিউমনিয়া রোগেই ১১ই জানুয়ারী সোমবার প্রাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। ভগবান কাহাকে কখন কি অবস্থায় রাখেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

১৮৩৯ সালে অযোধ্যানাথ আগ্রা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। কাশ্মির হইতে আসিয়া আগ্রায় অযোধ্যানাথের পিতা বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তথাকার একজন প্রধান বণিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বাল্যাবস্থায় অযোধ্যানাথ আগ্রার কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ছেলেবেলা হইতে অযোধ্যানাথ অত্যন্ত প্রখরবুদ্ধি ছিলেন। অযোধ্যানাথ বড় হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে

বাণিজ্য ব্যবসায়ে ভালরূপ শিক্ষিত করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু অযোধ্যানাথ নিজে আইন ব্যবসায় অবলম্বন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পিতা পুত্রের প্রবৃত্তিতে বাধা দিলেন না। অতঃপর অযোধ্যানাথ আইন পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তথাকার প্রধান উকীল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। এই খ্যাতি তিনি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার যশ ও সম্মান দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।



শিপাহি বিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্টের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে উঠিয়া আসে। অযোধ্যানাথও সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদে চলিয়া আসেন। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে পৈতৃক বিপুল সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি ওকালতির সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক বাণিজ্য ব্যবসায়ও সুন্দররূপে চালাইতে লাগিলেন এবং সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অনুগ্রহে তাঁহার পিতার সেই বিপুল সম্পত্তি ক্রমে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বাণিজ্য ও আইন ব্যবসায়ে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয়

কেহ এলাহাবাদে ছিলেন না, কিন্তু তথাপি অযোধ্যানাথ সাধারণের হিতকর কার্য্যে উদাসীন ছিলেন না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যানাথ "ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড" নামে এক খানি দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা খুব প্রশংসার সহিত তিনি চালাইয়াছিলেন। সাধারণের হিতকর বিষয়েই তিনি এই পত্রিকা উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী নিয়তই ধাবিত হইত। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পত্রিকা বেশী দিন চলিল না। এই হতভাগ্য দেশের লোকে পয়সা দিয়া কাগজ পড়ে না। কয়েক বৎসর বহু অর্থব্যয় করিয়া কাগজ খানি চালাইয়া, শেষে যখন দেখিলেন যে কেহ আর উহার মূল্য দিতে চাহে না, তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিতই অযোধ্যানাথ কাগজ খানি তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কাগজ খানি উঠিয়া গেলে অনেক উচ্চপদস্থ উদার মতের ইংরাজগণ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সর্ব্ব প্রথম ইহার "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন। তাহা ছাড়া, উক্ত প্রদেশে যখন ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইল, সেখানকার তথকার সে সময়ের ছোটলাট সার্ আলফ্রেড্ লায়াল সাহেব অযোধ্যানাথকে উক্ত সভার প্রথম দেশীয় সভ্য নিযুক্ত করেন। অতিশয় যোগ্যতার সহিত অযোধ্যানাথ এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলেও তিনি উক্ত পদে দ্বিতীয়বার সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর একজন ক্ষমতাবান কমিশনর ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এলাহাবাদের অনেক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি হইয়াছিল। অযোধ্যানাথ ২৪।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত এলাহাবাদের মুইর সেণ্ট্রাল কলেজের আইনের অধ্যাপক ছিলেন এবং বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৮১ সালে এলাহাবাদের হাইকোর্টে দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইলে, সেখানকার সাময়িক প্রধান বিচারপতি সার রবার্ট ষ্টুয়ার্ট পণ্ডিত অযোধ্যানাথকে মনোনয়ন করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট, দুর্ভাগ্য বশতই হউক আর সৌভাগ্য বশতই হউক, সার রবার্ট ষ্টুয়ার্টের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। সৈয়দ মামুদ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হইলে বোধ হয় দেশের হিতের জন্য এত খাটিতে পারিতেন না। ইচ্ছা থাকিলেও গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বলিয়া কংগ্রেসে তিনি কখনই যোগ দিতে পারিতেন না। ভারতের সৌভাগ্য ক্রমেই বোধ হয় তিনি সেবার হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হয়েন নাই।

অযোধ্যানাথ যখন যে মঙ্গলকর কার্য্যে হাত দিয়াছেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। লোকহিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। শুদ্ধ এক কংগ্রেসের জন্য তিনি ৫০ সহস্রের অধিক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন; এবং এই এক কংগ্রেস ব্যাপারেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শ্রীযুক্ত হিউম সাহেবের পরই লোকে তাঁহাকে মনে করিত, আর বাস্তবিকই তিনি কংগ্রেসের জন্য খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। জননী জন্মভূমির পূজাতেই তিনি তাঁহার মূল্যবান জীবন ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় অহুতি দিয়াছেন। ঐ দেখ সেই সৌম্যমূর্ত্তি। এমন তেজের কথা ঐ মুখ

হইতে বাহির হইত যে, শত্রুগণ স্তব্ধ হইয়া যাইত। খোসামোদ কাহাকে বলে অযোধ্যানাথ তাহা কখনও জানিতেন না। চিরকাল স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিয়া শত্রু মিত্র সকলেরই সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে, সহজে তাহার পূরণ হওয়া অসম্ভব।



বিলাতের গল্প।*

খেলাঘর।

তোমরা সকলেই বোধ হয় বিলাতের নাম শুনেছ। বিলাত বড় উত্তম জায়গা, সেখানকার লোকেরা খুব কাজ করে, কত কাপড় তৈয়ের কোরে আমাদের দেশে পাঠায়, কত কলবল নির্ম্মাণ কোরে নানা স্থানে চালায়। সেখানে অনেক বড়লোক আছেন, কত স্কুল কলেজের ছড়াছড়ি—এ সবই তোমরা শুনিয়া বা বইএ পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু আমার বোধ হয়, যেসব ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে বিলাতের অত মহা কাজ সাধন করে, তাদের কথা তোমাদেরকে কেহ বলেন নাই, তাই আজ আমি তোমাদেরকে তাদের খেলা সম্বন্ধে দু একটা কথা বল্‌ব।

ছেলেবেলায় আমরা যেমন খেলা ভালবাসি, বিলাতী ছেলে মেয়েরাও সেই রকম অত্যন্ত ক্রীড়াপ্রিয়। কিন্তু আমরা বাড়ীর যেখানে সেখানে যেমন খেলা কোরে বেড়াই ও খেলাঘর পাতি, সে দেশের ভদ্র লোকের গৃহে সে রকম অগোছ হবার যো নাই। সেখানকার সব বড় বাড়ীতেই ছেলেদের জন্য উপরের একটী কোণের ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই ঘরটীকে তাহারা নর্সরি বলে। ঐ নর্সরিতে জন, মেরী, ফ্র্যাঙ্ক প্রভৃতি বাড়ীর সব শিশুরা জমা হয়ে কেউ বা দুপ্‌দাপ্ কোরে খেলে, আর কেউ বা চুপি চুপি খেলা করে। আমাদের মত বিলাতের বালকেরাও লুকোচুরি, কাণামছি, কপাটী প্রভৃতি খেলায় বড় আমোদ পায়, আর সে দেশের মেয়েরাও আমাদের ছোট ছোট বোনগুলির মত পুতুল খেলার বড় ভক্ত।

বাড়ীতে দুচারটী মেয়ে থাকলে তাদের কাজ কর্ম্মের আর শেষ থাকে না। আজ মেরীর মেয়ের দাঁত, কাল এথেলের ছেলের নতুন পোষাক পরার দিন, পরশু অমুকের নাতির বিয়ে—এই সবের উদ্যোগে বালিকাদের আর অবসর নাই। আমরা যেমন খেলাঘরের যজ্ঞীতে রাঁধুনী দিদির কাছ থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মোচার আগাটা, নাউয়ের বোঁটাটা ও লুচির এক চাকৃতী ময়দা নিই, তারাও সেইরূপে জিনিসের যোগাড় করে। এক জন বা অনেক মিনতি কোরে তাদের কুকের (রাঁধুনী) কাছথেকে এক চাক্‌লা রুটী নেয়, কেউ বা এক পেয়ালা চা আনে, কেউ বা ভাঁড়ার ঘর থেকে দুচারটা আলুর মাথা পায়, আর কোন মেয়ে বা মা খেয়ে খানিকটা কেক পকেটে লুকিয়ে রাখে—এই রকমে

---

* প্রবন্ধলেখিকা অনেকদিন বিলাতে ছিলেন। বিলাতের ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক জানা শুনা আছে। সখার নিয়মিতরূপে তিনি লিখিবেন এ প্রকার আশা দিয়াছেন। আমরা আশা করি, সখার পাঠক পাঠিকা, তাঁহার মনোহর প্রবন্ধ পড়িয়া বিলাতের অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন এবং অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।



ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২।



বিবিধ।

মধ্য এসিয়াতে বোখারা প্রদেশে কার্কী নামক নগরের নিকটে কতকগুলি বড় বড় পর্ব্বত গুহা আছে। সেই সকল পর্ব্বত গুহা মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে রুসীয়গণ মাটীর নীচে এক অতি পুরাতন ও অপূর্ব্ব নগর আবিষ্কার করিয়াছে। নগরটীর আয়তন খুব বড়; প্রশস্ত রাজপথ, মনোহর উদ্যান এবং দ্বিতল ও তৃতল গৃহে নগরটী শোভিত। খোদিত প্রস্তর-লিপি এবং রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা অনেক পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা সেই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন নগরটীর বয়স দু হাজার বৎসরেরও বেশী।

*
* *

এল্‌জীরিয়া প্রদেশে একটী কালির নদী আছে। দুটী ভিন্ন ভিন্ন নদীর স্রোত মিলিত হইয়া এই কালীর নদীটি উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ দুটী নদীর একটীর জলে খুব অধিক পরিমাণে লৌহ আছে এবং অন্যটীর জলে গ্যাল্লিক এসিড নামক পদার্থ আছে; লৌহ ও গ্যালিক এসিড জলে মিশ্রিত করিলে কালী হয়। শুনাযায় ঐ নদীর জলে সুন্দর লেখা যায়। সেখানকার লোকের আর বোধ হয় কালী তৈয়ার করিতে বা কিনিতে হয় না!

*
* *

কাশীর মহারাজ সোণা দ্বারা তুলট হইয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ সমস্ত সোণাই উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুক দিগকে দান করা হইত। এবার উহা হইতে ত্রিশ হাজার টাকায় দরিদ্রদিগের জন্য একটী এবং ব্রাহ্মণদিগের জন্য একটী, এই দুইটী দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

*
* *

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাঁহারা রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের মহারাণীই এখন সকলের অপেক্ষা অধিক দিন রাজত্ব করিতেছেন। মহারাণীর রাজত্ব এই ৫৪ বৎসর চলিতেছে। ব্রেজিলের সম্রাট ডম পেড্রো মহারাণীরও উপরে ছিলেন, তিনি ৫৯ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং আমাদের মহারাণীই এখন প্রথম স্থানীয়া। রাজা সম্রাটদের মধ্যে বয়সে আমাদের মহারাণী দ্বিতীয়া, ডেনমার্ক দেশের রাজা মহারাণীর অপেক্ষা এক বৎসরের মাত্র বড়।

*
* *

আমেরিকার উইলিয়ম মরিসন নামক এক ব্যক্তি এক নূতন রকমের গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন; এই গাড়ী বৈদ্যুতিক বলে চালান হইবে। সকল প্রকার রাস্তায়ই এই গাড়ী চলিবে, রেল প্রভৃতির আবশ্যক হইবে না। বারজন লোক অনায়াসে এই গাড়ীতে বসিতে পারিবে, আবশ্যক হইলে চব্বিশ জনেরও স্থান করা যাইতে পারিবে। চারি ঘোড়ার গাড়ী যে প্রকার বেগে চলে ইহা তাহার অপেক্ষাও অধিক বেগে চলিবে। গাড়ীর সম্মুখদিকে একটী ছোট চাকা আছে, সেই চাকাটীর দ্বারা গাড়ী খানিকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালান যাইবে; এবং এই গাড়ী চালাইতে একজন মাত্র লোকের আবশ্যক হইবে। আমেরিকার সকলই অদ্ভুত। গাড়ী চালাইতে এখন আর ঘোড়া বা ষ্টীম এঞ্জিনের দরকার হইবে না।

*
* *

স্তন্যপায়ীদিগের অপেক্ষা পক্ষীজাতি অনেক বেশী দিন বাঁচে। কথিত আছে কাক দুইশত চল্লিশ হইতে সাতশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। একথা সত্য কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু মানুষের অপেক্ষা যে ইহারা দীর্ঘ কাল বাঁচে তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে।

*
* *

হোরেসিও নেল্সন বিলাতের একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন,—জলযুদ্ধে সে সময় তাঁহার সমকক্ষ লোক ছিল না। নেলসনের বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তিনি একবার তাঁহার মাতামহীকে দেখিতে যান। হঠাৎ একদিন নেলসনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বৃদ্ধা মাতামহী সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন কোথাও তাঁহাকে খুঁজিতে পাইলেন না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল বালক গভীর ও অত্যন্ত প্রবল স্রোত বলিয়া পার হইতে না পারিয়া এক নদীর তীরে দাড়াইয়া রহিয়াছে; ভয় ও আশঙ্কার চিহ্নও নাই। নেলসনকে তখনই বাড়ী আনা হইল। বৃদ্ধা মাতামহী তাঁহাকে একাকী বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন যে অমন গভীর নদী ও প্রবল স্রোত দেখিয়াও কি তোমার ভয় হয় নাই। পাঁচ বৎসরের বালক উত্তর করিল, "দিদিমা ভয় কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না।" এই নির্ভিক বালকই শেষে একজন প্রধান বীর পুরুষ হইয়াছিলেন।

মৃগনাভি।

(শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

মৃগনাভি বলিয়া একটী আশ্চর্য্য বস্তু আছে। ইহা হরিণের উদরে জন্মে। সকল হরিণের উদরে কিন্তু জন্মে না। হিমালয়ের উপর যেখানে খুঁব শীত, সেইখানে একজাতি হরিণ বাস করে। এ হরিণের শৃঙ্গ নাই, কিন্তু ইহাদের মুখের দুই পার্শ্বে হাতির মত দুইটী বড় বড় দন্ত আছে। ইহাদের পেটে মৃগনাভি হয় বলিয়া ইহাদিগকে মুস্ক হরিণ বলে। পারসী ভাষায় মৃগনাভিকে মুস্ক বলে, ইংরাজিতে বলে মস্ক। তাই এ জাতীয় হরিণের এরূপ নাম। এই হরিণ অতি নিরীহ। বরফের মাঝখানে বেড়ায়, ঘাসপাতা খুঁটিয়া খায়, রাত্রিতে পাহাড়ের গর্ত্তে শুইয়া থাকে, কাহারও কোন কথায় থাকে না। কিন্তু নিরীহ হইলে কি হইবে ইহার যে সুবাসিত মৃগনাভি আছে? তাই মানুষে ইহাকে শীকার করে। হরিণীর উদরে মৃগনাভি হয় না। কেবল পুরুষ হরিণের পেটে ইহা জন্মে। হরিণের পেটে ছেলেবেলা হইতেও ইহা থাকে না। যখন হরিণ বড় হয়, তখন তাহার

উদরে ইহার উৎপত্তি হয়। হরিণের পেটে মৃগনাভির উৎপত্তি হইলে, তাহার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়। গন্ধ পাইলে, কুকুর সঙ্গে লইয়া, তীর ধনু হাতে করিয়া, শীকারীরা তাহাকে মারিতে যায়। সহজে কিন্তু তাহারা ইহাকে মারিতে পারে না। ইহারা খুব লাফাইতে পারে। লাফাইয়া এক বার এ পাথরের উপর একবার সে পাথরের উপর গিয়া পড়ে। হিমালয় অতি ভয়ানক স্থান। সহস্র সহস্র পর্ব্বতের চূড়া মেঘভেদ করিয়া উঠিয়াছে। সেই সমুদয় পর্ব্বত বার মাস বরফে ঢাকা। গ্রীষ্মকালেও সেখানে দারুণ শীত। সেখানে বরফ কোন সময়েই গলে না। তাছাড়া ও দিকে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, একবার পা পিছলাইয়া গেলে আর রক্ষা নাই। একবারে সহস্র সহস্র হাত নীচে গিয়া পড়িতে হইবে। পাথরে লাগিয়া সর্ব্ব শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই লম্ফ দিয়া যখন হরিণ এ পাথর হইতে সে পাথরের উপর গিয়া পড়ে, তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া বড় সহজ কথা নহে। এই রূপ যাইতে যাইতে অনেক শীকারীদিগের পা পিছলাইয়া যায়, এবং গড়াইতে গড়াইতে একবারে নীচে গিয়া পড়ে ও মুহূর্ত্তের মধ্যে মরিয়া যায়। কিন্তু মানুষের মনে ধন লাভের আশা বড়ই বেশী। তাই প্রাণভয় একবারে পরিত্যাগ করিয়া শত শত মনুষ্য এই লম্ফমান মৃগের অনুগামী হয়। পূর্ব্বে এই মৃগ অনেক ছিল এক্ষণে আর তত নাই, লোকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই হরিণের এক খানি চিত্র আমরা এইখানে দিলাম।

উদরের নীচে একটী থলিতে মৃগনাভি উৎপন্ন হয়। থলিটী দেখিতে, ডিমের মত, লোমে আবৃত, উদরের নীচে ঝুলিতে থাকে। ইহার ভিতর এক প্রকার কোমল দানা দানা পদার্থ থাকে। তাহাই মৃগনাভি। শোণিত বিন্দু শুষ্ক হইলে দেখিতে যেরূপ হয় মৃগনাভিও দেখিতে সেইরূপ। হরিণকে মারিয়া মানুষ এই থলিটী কাটিয়া লয়। টাটকা টাটকা মৃগনাভির সুবাস এত



তেজশালী যে, শীকারীরা তাহা সহ্য করিতে পারে না, একদিকে মুখ ফিরাইয়া তবে থলিটী কাটিয়া লয়। পুরাতন হইলে গন্ধ এত তেজশালী থাকে না। কিন্তু কোনও

স্থানে মৃগনাভি রাখিলে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানকে সুবাসিত করিয়া রাখে। একটী দানাও যদি ঘরে রাখা যায়, তবে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সেই দানাটীর গন্ধে ঘর আমোদিত হয়। ইহার গন্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করে। তাই সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম কস্তুরী। এথানে আমরা মৃগনাভি থলির দুইথানি চিত্র দিলাম।



সুগন্ধের নিমিত্ত সে কালে ভারতবর্ষে মৃগনাভি অনেক ব্যবহার হইত। আতর গোলাপ মৃগনাভি প্রভৃতি দেশীয় গন্ধদ্রব্যের পরিবর্ত্তে এখন লোকে বিলাতি সামগ্রির আদর করে। তাই মৃগনাভির ব্যবহার কমিয়া আসিয়াছে। ভাল তামাকে, ধূপ-বাতিতে লোকে ইহা মিশ্রিত করে; তাহাতে তামাকে ও বাতিত উত্তম গন্ধ হয়। পানে খাইবার জন্য কাশিতে একরূপ তামাকের বড়ি প্রস্তুত হয় তাহার সহিতও মৃগনাভি থাকে। সে কালে কস্তুরী, কুঙ্কুম, চন্দন প্রভৃতি লোকে গায়ে মাখিত। সে কালের পুস্তকে যেখানে রূপ বর্ণনা আছে, সেই খানেই কস্তুরীর কথা। প্রথম প্রথমকার বাজালা পুস্তকে ইহার বিলক্ষণ আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

পূর্ণিমা।

১

সুখের পূর্ণিমা তিথি
চাঁদিমা জ্যোছনা ময়
এত রূপ—অপরূপ!
আর কভু নাহি হয়!

২

ভুবন মোহন ছটা
মধুর মধুর হাসি,
পূর্ণিমার চাঁদ যেন
কেবলি রূপের রাশি!

৩

হীরা কুচি তারাগুলি
ঘিরে আছে চারিধার,
আসে যায় কালো মেঘ
বাড়াইতে সে বাহার!

৪

মেঘে ঢাকা শশী হাসে—
যেন খেলা ঘরে আড়ি—
ঘোমটা দিয়েছে বউ
প'রে নীলাম্বরী সাড়ী!

৫

মধুর জ্যোছনা কিবা
খেলিছে তরুর গা'য়,
চিকি মিকি করে পাতা
বহিছে মৃদুল বা'য়।

৬

উথলি উথলি নদী
চাঁদেরে ধরিতে চায়

হাসিয়া হাসিয়া শশী
ঢলিয়া পড়িছে তা'য়!

৬

সারি সারি দাঁড়ি মাঝি
গাইছে মধুর গান;
জ্যোছনা লহরে যেন
ভেসেছে সবারি প্রাণ।

৮

হসি মুখে ফুল ফোটে
সুখে পাখী গান গা'য়
আলো-আলোময় ধরা
হাসি মাখা পূর্ণিমা'য়।

৯

পথ ঘাট মাঠ বাড়ী
জ্যোছনায় যায় ভেসে,
চাঁদের পূর্ণিমা তাই
জগত উঠিছে হেসে!

১০

এমন মধুর হাসি
কে-সে হাসাইল বল,
কার হাসি মেখে আজ
হাসি মাখা ধরাতল!

১১

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সব
যাঁহার মহিমা রাশি,
তপনে তাঁহারি আলো
চাঁদেও তাঁহারি হাসি!

১২

তাই'ত সোণার চাঁদ
কতবার দেখি তোরে,
দেখিয়া দেখিয়া সাধ
একবারে নাহি পোরে।

১৩

খোকা কাঁদে "রাঙ্গা চাঁদ
ধ'রে দাও মা আমায়"
মা ডাকেন "চিক দিবি
চাঁদ আয়! চাঁদ আয়!"

১৪

পুঁটু চায়, চাঁদ পেড়ে
গাঁথিবে উজল হার,
প্রিয় চায়, চাঁদ এসে
খেলা সাথী হোক্ তার।

১৫

আমার প্রাণের সাধ
চাঁদ যদি ধরা পাই,
পাঠাই তোমার কাছে
বালক বালিকা তাই;

১৬

হাতে ধ'রে চাঁদিমারে
ক'য়ে দিই শিখাইতে—
তোদেরো হৃদয় গুলি
চাঁদ পানা করে দিতে।

১৭

সরল বিমল তোরা
সদা সুশীলতা ভরা,
তা'হলে সফল মোর
পূর্ণিমার চাঁদ ধরা!



সমুদ্র।

মানচিত্রে ভিন্ন সমুদ্র দেখা আমাদের অনেকেরই ঘটে না। মানচিত্র দেখিয়া এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের মধ্যে কল্পনায় আমরা একটা অতলস্পর্শ অনন্ত বিস্তৃত জলরাশিকে সমুদ্র বলিয়া খাড়া করি। বাস্তবিক সমুদ্র তাহাই বটে। পৃথিবীর জন্মের পূর্ব্বে সমস্তই জলময় ছিল; কি প্রকারে সেই জলরাশী হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আমরা পৃথিবীর জন্মকথা নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। পৃথিবীর সৃষ্টি হইলে এই জলরাশি ক্রমে ভূ-পৃষ্ঠের নিম্ন স্থল সকল অধিকার করিয়া সমুদ্র নাম ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীর চারিদিক বেষ্টিত এই জলরাশি একই, কিন্তু মানুষ আপন সুবিধার জন্য ইহার এক এক স্থলের এক এক নাম দিয়াছে।

সমুদ্রের জল সাধারণতঃ গভীর নীল। কিন্তু নদীর মোহানার নিকট সমুদ্রজল ঘোলা দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, নদীগুলি অবিশ্রান্ত সমুদ্র জলে পলি আনিয়া ফেলিতেছে। কোন কোন স্থানে সমুদ্র জল লাল এবং পীত দৃষ্ট হয়।

সমুদ্রের জল অতিশয় লোণা। একটা বড় রকম পাত্রে সমুদ্র জল রৌদ্রে রাখিলে, সূর্য্যের তাপে ঐ জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেলে পাত্রের তলায় লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ লবণকে 'করকচ' লবণ বলে। সাধারণতঃ যে লবণ আমরা ব্যবহার করি ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক অপরিষ্কৃত, সেই জন্য খাইতে কিছু বিস্বাদ লাগে। সমুদ্র তীর-বাসী লোকেরা প্রায়ই এই রূপে লবণ বাহির করিয়া থাকে। লবণ ভিন্ন সমুদ্র জলে চূণও মিশ্রিত থাকে। সমুদ্রে যে সকল শঙ্খ ঝিনুক ও কড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহার খোলা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, এই চূণ ঐ সকল প্রাণীগণ সমুদ্র জল হইতে গ্রহণ করে। ফস্ফরেসেণ্ট ? নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটাণু সমুদ্র জলে বাস করে। সাগরের নীল জল কোন প্রকারে আলোড়িত হইলে এক প্রকার কোমল আলোক দেখা যায়, এই সকল কীটই এই আলোকের কারণ।

সমুদ্র জলে অনেক প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলে যেমন নানা প্রকার জীব জন্তু পশু পক্ষী আছে; সমুদ্রের মধ্যেও তাহার অনেক আছে। উড্ডীয়মান মৎস্য, সিন্ধু ঘোটক প্রভৃতির কথা তোমরা জান, সুতরাং সমুদ্র মধ্যে পশু পক্ষী উভয়ই আছে। বেশীর মধ্যে, স্থলে যে সকল জীব দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদ্রে তাহার অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব বাস করে। তিমি প্রভৃতির সহিত স্থলচর কোন জীবেরই তুলনা হয় না। সে কথা এখন থাক্, সমুদ্রবাসী জীব জন্তুর বিষয় পড়ে বিস্তারিত করিয়া লেখা যাইবে।

সমুদ্র বলিলেই আমাদের মনে হয়, ইহার কূল কিনারা নাই, এবং ইহার গভীরতারও সীমা নাই। দেবাসুরে যখন সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল তখন মন্থন দণ্ডের জন্য মন্দার পর্ব্বত এবং মন্থনরজ্জুর জন্য বাসুকীর আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতাও মানুষ পরিমাণ করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা অধিক, ইহার কোন কোন স্থান সাত আট মাইল গভীর। আটলাণ্টিক মহাসাগর তিন হইতে পাঁচ মাইল গভীর। ভারত সমুদ্র চার হইতে ছয় মাইল গভীর। এবং বঙ্গ সাগর প্রায় দুই মাইল।

পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, পৃথিবীর মত সমুদ্রের তলও অসমান, অর্থাৎ কোথাও উচ্চ কোথাও নিম্ন।

আর দুই একটা কথা বলা হইলেই সমুদ্রের কথা এক প্রকার শেষ হয়। সমুদ্র জলের স্রোত আছে কিনা? বাস্তবিক সমুদ্র জলের একটা কোন নিয়মিত স্রোত নাই। কিছুকাল ধরিয়া ক্রমাগত এক দিক হইতে যখন বাতাস বহিতে থাকে, তখন সমুদ্র জলে একটা স্রোত উৎপন্ন হয়। এই স্রোত সকল স্থানে এক প্রকার নহে; নানা স্থানে নানা রূপে প্রবাহিত হয়। বঙ্গ সাগরে বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে স্রোত খুব প্রবল হয়, মৌসমী বাতাসই এই স্রোতের কারণ, এবং অগ্রহায়ণ পৌষে স্রোত প্রায় থাকে না।

সমুদ্র জলে অনেক সময় প্রবল তরঙ্গ উঠে। এই তরঙ্গের কারণ প্রবল বায়ু। একটা বাটীতে খানিকটা জল রাখিয়া পাখা করিলে যেমন বাটীর মধ্যে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতে থাকে, তেমনি এই অনন্ত বিস্তৃত জল বাটীর উপর যখন বায়ু বহিতে থাকে, তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিতে থাকে। এই ঢেউ সমুদ্রের তলভাগে পৌছায় না কেবল উপরিভাগে থাকে। বায়ুর বেগ না থাকিলে সমুদ্র অতি স্থির ও প্রশান্ত থাকে।

স্রোত ও ঢেউ কেবল সমুদ্রের উপরিভাগের জল আলোড়িত করে। কিন্তু পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে ও চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের অল্পতা ও আধিক্য বশতঃ সমুদ্র জল তলা পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়; এই আকর্ষণের তারতম্যে সাগরজল কোথাও স্ফীত হইয়া উঠে কোথাও নিম্নগামী হয়। ইহাকেই জোয়ার ভাটা বলে। দিবা-রাত্রির মধ্যে সমুদ্রজল দুইবার উচ্চ ও নিম্ন হয়। একস্থানে আকর্ষণের আধিক্য হেতু জল স্ফীত হইলে তাহাকে জোয়ার বলা যায়; কোন স্থানের জল ঐ প্রকার আকর্ষণে স্ফীত হইলে, অন্য স্থানের জল কাজে কাজেই নামিয়া যায়, ইহাকেই ভাটা বলে। ইহা ভিন্ন সমুদ্রে বান ডাকে। যখন এক স্থানে জোয়ার হয় তখন সে স্থানের জলের একটা গতি হয়। এই জোয়ারের তরঙ্গ নদীর মুখে খুব উচ্চ হইয়া উঠে এবং প্রবল বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাকেই বান ডাকা বলে। গঙ্গায় মধ্যে মধ্যে ভয়ানক বান আসে। বানের সময় তীরে থাকিলেই বিপদ, কারণ বানের জল তীরে গিয়া প্রবল বেগে ভাঙ্গিতে থাকে। মধ্য নদীতে নৌকা রাখিলে তাহার আর কোন আশঙ্কা থাকে না। বানের বেগ ঘণ্টায় সাত আট মাইল হইতে কুড়ী একুশ মাইল পর্য্যন্ত হয় এবং স্থানে স্থানে বান আট দশ হাত উচ্চ হইয়া থাকে।



বিলাতের গল্প।

(শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস লিখিত।)

বাহিরের খেলা।

বিলাতের ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে কেমন খেলা করে, তাহা তোমরা গেল মাসের 'সখা'তে পড়িয়াছিলে। আজ তোমাদিগকে তাদের বাহিরের খেলা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পূর্ব্বেই বলেছি, ৬।৭ বৎসর বয়সে ইংরেজ বালক বালিকারা স্কুলে যায়, আর সেই খানেই তাদের

পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যত বলকর ক্রীড়া আরম্ভ হয়। আমাদের দেশের হাতেখড়ি দেবার দিনের মত ইংলণ্ডেও ছেলেদের প্রথম বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবার কাল বড় আনন্দের সময়। ভোর হতে না হতে জন-বাবা উঠে হাত মুখ ধুয়ে নূতন পোষাক পরে বোসে আছে, আর তার ওঠার শব্দ পেয়েই তার বাপ মা এসে তাকে চুমো খেয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। ছোট ভাই ফ্রাঙ্ক ও মেরী বোনটী এসেও জনের হাত ধরে চুমো খেলে ও তার নূতন বই, স্লেট, পেন্‌সিল সব একে একে পরীক্ষা কর্‌তে লাগল। বেলা আটটার সময় যত আত্মীয় বন্ধুরা সব একত্র হয়ে, পুরুত মহাশয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে জনের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। ছোট বেবিটী ও কপ্‌চাতে কপ্‌চাতে তাতে যোগ দিল। পরে সকলে মিলে আমোদ আহ্লাদে 'ব্রেকফাষ্ট' (প্রাতঃর্ভোজন) খাইলেন।

এদিকে ঘড়ীর কাঁটা যেই ৯টার ঘরে গেছে, অমনি জনের পিতা বলিলেন, জন! সাড়ে ৯টায় গাড়ী ছাড়বে, এইবেলা সব গুছিয়ে লও। সে যে স্কুলে যাবে, তাহা তাদের বাড়ী থেকে প্রায় ২০ ক্রোশ, কলের গাড়ীতে যেতে হবে। জন একদমে উপরে গিয়ে নিজের কাপড় চোপড় বই স্লেট সব ছুটী ছোট পেঁটরায় পূরে ফেলিল। তার একখানি ছোট অ্যালবাম (ছবি রাখার বই) ছিল, তাতে সে মা বাপ ও ভাই বোনদের ফটো (ছবি) গুলি যত্নে রাখিয়া দিল। মা ছেলের সাহায্য করতে উপরে এসে দেখেন যে, সে নিজেই সব কোরে ফেলেছে। তিনি ছেলের গালধরে আদর কর্‌লেন ও তাকে লজেন্স খাবার জন্য একটী টাকা দিলেন। বাবাও তার হাতে একটী টাকা দিলেন। সে টাকা পকেটে পূরে নূতন রাস্তায় নূতন স্কুলে যাবে, সেখানকার সঙ্গীরা কি রকম, সেখানে কেমন লেখা পড়া শিখ্‌বে, কত খেলা করবে, এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে মা বাপ ও ভাই বোনদের সঙ্গে গাড়ী কোরে ষ্টেশনে গেল।

সেথায় সে সকলকে চুমো খেয়ে ও পিতামাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে রেলের গাড়ীতে উঠিল। বড় জোর এক ঘণ্টায় সে স্কুলে গিয়ে পৌঁছিল।

জন এই প্রথম কিছু দিনের জন্য বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে বোলে মার বড় মন কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল। গাড়ী চলার বাঁশী বেজেছে, তবু তিনি ছেলের হাত ছাড়তে চান না। জন কিন্তু তাঁর বুকে মাথা রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলিল "ভাবনা কি মা! আমি এই চল্লিশ মাইল দূরে থাক্‌ব বইত নয়, তোমাকে রোজ চিঠি লিখ্‌ব, আর ছুটীর সময় আবার বাড়ী এসে তোমাদেরকে দেখ্‌ব।" পুত্রের এই আশ্বাস বাক্যে মা ধৈর্য্য ধরিলেন। গড়্‌ গড়্‌ শব্দে জন বাবা স্কুলে চলিলেন।

ভদ্র ইংরেজদের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি হয়। স্কুলেতেই তারা খায় দায়, বেড়ায়, ঘুমায় ও লেখাপড়া শেখে। কেবল শীত গ্রীষ্ম ছুটীর সময় ও কখন কখন শনি রবিবারে বাড়ীতে যায়। এই রকম এক একটী বড় স্কুলে প্রায় এক শ জন ছেলে বাস করাতে, তাদের মধ্যে খেলা আলাপ ও শিক্ষা সকল দিকেই বেশ সুবিধা হয়। বোর্ডিং স্কুলের ছেলেদের বয়স সচরাচর সাত আট থেকে ষোল সতর পর্য্যন্ত। গরীব ও গৃহস্থের ছেলেমেয়েরা আমাদের দেশের সাধারণ ছাত্রদের মত বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে রোজ সকালে দশটার সময় স্কুলে যায় ও চার পাঁচটার সময় ফেরে। মাঝে তাদের বারটা থেকে ছুটা পর্য্যন্ত একবার খাবার ছুটী হয়।

বোর্ডিং স্কুলে গিয়ে আমাদের জন বাবা লেখা-পড়ার সঙ্গে সকল প্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়ামেও মন

দিল। শিশুকাল থেকেই ভ্রমণ, শিকার ও দৌড়াদৌড়ি খেলার দিকে তার বেশী টান। কাজেই অল্প দিনের মধ্যে সে ক্রিকেট ও ফুটবল ইত্যাদি ক্রীড়াতে একজন অতি দক্ষ হইয়া উঠিল। বিলাতের সব স্কুলেই ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার ন্যায় খেলাতেও সব বিষয়ে আড়া আড়ি চলে। মনে কর, জন হ্যারো স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে; ঐ স্কুলের ছাত্র ও রাগ্‌বী নামে আর একটী বিখ্যাত বিদ্যালয়ের পোড়োদের মধ্যে ফি বৎসরই ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ ও নৌকাদৌড় ইত্যাদিতে মহা প্রতিদ্বন্দিতা হয়ে থাকে। এবার জন তাদের স্কুলের ক্রিকেট ম্যাচের একজন মুখপাত্র খেলুড়ে। সে খুব ছুটতে পারে, তার গায়ে অত্যন্ত জোর ও বড় চমৎকার খেলে। তার সাহস ও কার্য্যপটুতা দেখে অন্যান্য ছেলেরা তাকে প্রভুর ন্যায় মান্য করে। জনও তাদের উপর বড় স্নেহশীল।

ক্রমে উভয় দলে ক্রিকেট খেলার দিন আসিল, স্কুলের মধ্যে রৈ রৈ পড়ে গেল। আজ শনিবারে হাফ-হলিডে পেয়ে, সব ছেলেরা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে একত্র হয়ে—কেউ বা এক ব্যাগ গোলা, কেউবা এক বোঝা দাণ্ডা, দু তিন জনে ধরাধরি কোরে এক ব্যাগ ব্যাট, কোন ছেলের কাঁধে গোটাদুই নিশান—এইরূপে সব ছাত্রেরা একরকম পোষাকে সজ্জিত হয়ে (ইংরেজিতে যাকে ইউনিফরম্ বলে) খেলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট মাঠে চলিল। মাঠে পৌছিয়া দুই দলের ছাত্রেরা নিজ নিজ দিকের জমির তিনধারে নিশান পুতিয়া দিল ও খেলিবার সব সরঞ্জাম বার কোরে সব ঠিকঠাক করিল; ফি দলের এগার জন প্রধান খেলুড়ে নিয়ে ক্রীড়া আরম্ভ হলো। ৩টা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত খুব খেলা চলিল। যেই এক দলের ছেলেরা একটী বেশী মার্ক পায়, অমনি সেই দিকের ছাত্রেরা হাত তালি দিয়ে বাহবা দেয়, খেলুড়েদের তাতে বড় উৎসাহ বাড়ে, তারা আরো ছুটে খেলে।

খেলার চোটে বল এসে কারুর বা মাথায় কারুর বা গালে লাগিতেছে, কিন্তু বালকদের গ্রাহ্য নাই, তারা—প্রাণ যায় আর থাকে জিত-বই—এই মনে কোরে ক্রীড়ায় মত্ত। ঐ দ্যাখ, একটা গোলার আঘাৎ লেগে জনের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তার মা ভাই বোনেরা ও আজ ঐ ক্রিকেট ম্যাচ্ দেখিতে এসেছিলেন। ছেলের রক্তপাত দেখে মা ভয়ে দৌড়ে পুত্রের মুখে জল দিতে গেলেন। জন রুমাল খানি লাল কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে ঝিলের জলে তাহা কাচিল ও মাকে অভয় দিয়ে আবার ক্রীড়ায় খেলায় যোগ দিল। মা বল্লেন—ওরে বাবা! তোর আজ আর্ খেল্‌তে হবে না, চল্ বাড়ী চল্। জন আশ্চর্য্য হয়ে বলিল—সে কি মা! আমি যদি এখন খেলা ছেড়ে যাই, তাহলে নিশ্চয় আমাদের দলের হার হবে, আমাদের লজ্জা অপমানের শেষ থাকবে না। সে কি হয়, যখন সব ছাত্রেরা আমাকে তাদের নেতা করেছে তখন আমি কি এসময়ে ওদের ফেলে যেতে পারি? মা কি করিবেন, চুপ্ কোরে ছেলের সাহস দেখিতে লাগিলেন। ঐরূপে আর এক ঘণ্টা ভয়ানক যুদ্ধের পর জনের দলের জয় হলো। তাদের স্কুলের ছাত্র ও আত্মীয় বন্ধুরা খুব আনন্দে হাত তালি দিয়ে খেলকদেরকে ঘিরে দাঁড়াল। মায়ের কাছে এসে জন তাঁর হাত ধোরে বলিল—কেমন মা! আমি বলেছিলাম আজ জিত্‌বই জিতব। তার নাকে যে এত লেগেছে, কপালে যে কালশিরা পড়েছে, তার দিকে তার ভ্রুক্ষেপও নাই, নিজের দলের যে জয় হয়েছে—এই আনন্দেই সে যেন সব নিজের কষ্ট ভুলে গেছে।

অল্প দিনের পর ফ্র্যাঙ্কও এক বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি হয়। কিন্তু ক্রিকেট ফুটবলের চেয়ে দাঁড় বহা, ছবি আঁকা, সাঁতার দেওয়াতেই তার বেশী আগ্রহ। সে একখানি ছোট নৌকায় দাঁড় বেয়ে বেয়ে ঝিলের বা নদীর এক নির্জ্জন স্থানে যায়, এবং সেইখানে নৌকা লাগিয়ে কাগজ বা কেম্বিসের উপর যত সুন্দর গাছপালা, কুঁড়ে, মাঠ, নদী, আকাশ ইত্যাদি স্বাভাবিক শোভা চিত্র করে। অনেক সময় ছবিগুলি বড়ই মনোহর হয়। সে ঐরূপ ছবি এঁকে স্কুলে নিজের ঘরটী পূরে ফেলেছে, আর তার মা বাপ ভাই বোন সকলকে এক এক খানি উপহার দিয়েছে। এই দু তিন বছরে সে চিত্রবিদ্যা ছাড়া নৌকা বহাতেও বিশেষ দক্ষ হয়ে উঠেছে। গেল বছর তার স্কুল ও ইটন নামে বিখ্যাত স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যে নৌকা দৌড় হয়, ফ্র্যাঙ্ক তাতে সকলের প্রধান মাঝি মনোনীত হয়, আর ঐ নৌকাদৌড়ে তাদের স্কুলের জিত হওয়াতে সে একটী মেডেল পুরস্কার পেয়েছিল।

বিলাতে বড় মানুষের মেয়েদের জন্যও ঐরূপ বোর্ডিংস্কুল আছে। মেরী সেখানে লেখাপড়ার সঙ্গে, শিল্প, রান্না প্রভৃতি অন্যান্য গার্হস্থ্য কাজ কর্ম্ম শিখেছে। ঐ দেখ, এখন সে খেলাঘরের রান্না-বাড়া ছেড়ে, প্রকৃত কিচেনে (রান্নাঘর) হাতাবেড়ী ধরেছে। পুতুলের ঘাগরা সেলাই ফেলে নিজের গাউন প্রস্তুত কত্তে ব্যস্ত রয়েছে। সে স্কুলে ভর্ত্তি হবার ছুমাস পরে ছুটী কামিজ তয়ের কোরে তার ভাই জন ও ফ্র্যাঙ্কের জন্য পাঠিয়ে দেয়, তারা বোনটীর হাতের তোয়েরি জামাছুটী পেয়ে যার পর নাই আহ্লাদিত হল। আর দুই ভায়ে পরামর্শ কোরে নিজেদের জল খাবারের পয়সা থেকে মেরীর জন্য একটী সুন্দর সেলাইর বাক্স কিনে তাকে উপহার দিল। সেবারকার শনিবারে ভাইবোনদের সাক্ষাৎ হলে তাদের আহ্লাদ আর দেখে কে? বোনের স্নেহ দেখে ভাইদের আনন্দ, ভাইদের ভালবাসাতে ভগিনীটীও তেমনি উল্লাসিত। কত দিনের পর তাদিগে আবার বাড়ীতে দেখে বাপ মাও যার পর নাই সুখী হলেন। ছোট বোনটী এখন তিন বছরের হয়েছে, সেও দিদি দাদাদের দেখে আহ্লাদে সকলের কোলে উঠে আদর খেলে।

এই রকমে খেলা, পড়া, আমোদ আহ্লাদে ও পরস্পরের স্নেহের মধ্যে বিলাতের ছেলে মেয়েদের বাল্যজীবন চলিতে থাকে।



প্রকৃতি-রহস্য।

চিরপ্রজ্বলিত অগ্নি।



পারশিয়া প্রদেশে কাস্পিয়ান হ্রদের সন্নিকটস্থ স্থান সমূহে এক প্রকার অগ্নি দেখা যায়, উহা চির প্রজ্বলিত ঐ সকল স্থান কেবলই প্রস্তরময়; প্রস্তরের উপরি ভাগ অল্প পরিমাণ মৃত্তিকায় ঢাকা। কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দূরে সরাইয়া অগ্নি সংযোগ করিলে ঐ স্থান তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে, এবং কোন প্রকারে না নিভাইলে উহা চিরদিন সমভাবে জ্বলিতে থাকে। এই অগ্নি নিভাইতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণে ভিজা মাটি উহাতে নিক্ষেপ করিতে হয়।

এই স্থানের নিকটেই সন্ন্যাসীদিগের জন্ত একটী আশ্রম আছে। আশ্রমের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রভৃতি আসিয়ার অন্যান্ত স্থানের অনেকগুলি সন্ন্যাসী বাস করেন। তাঁহারা বলেন এই অগ্নি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে জলিতেছে। এই প্রকাণ্ড আশ্রমের দেওয়ালে অনেকগুলি ছিদ্র আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে কোন একটী ছিদ্রে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা অমনি জ্বলিয়া উঠে, এবং অন্যান্ত সংযুক্ত ছিদ্রগুলিকেও প্রজ্বলিত করে। কিন্তু ইহা অতি সহজেই নির্ব্বাণ করা যায়। এই সকল সন্ন্যাসীরা নিজ নিজ রন্ধন পাত্রের অনুযায়ী গহ্বর খুঁড়িয়া অগ্নি প্রস্তুত করেন এবং বিনা কাষ্ঠাদিতে ইহা দ্বারা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তাঁহাদের আশ্রম আলোকিত করিবার জন্ত ও অন্ত আলোকের প্রয়োজন হয় না। ভূমিতে একখণ্ড বেত্র অথবা যষ্টি পুতিয়া তাঁহারা উহার অগ্রভাগে অগ্নি সংযোগ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে অতি পরিষ্কার আলো বাহির হইতে থাকে। এই আলো না নিভাইলে চিরকাল সমভাবে জ্বলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনবরত জ্বলিতে থাকিলেও ঐ বেত্র অথবা যষ্টিখণ্ড আদৌ দগ্ধ হয় না।

এই আশ্রম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অনেকগুলি পার্ব্বত্য তৈলের (naptha) খনি দেখিতে পাওয়া যায়। এই তৈল অতিশয় জ্বলনশীল। অগ্নি সংযুক্ত হইলে ইহার প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত ধূম এবং দুর্গন্ধ বাহির হয়, কিন্তু শীলা হইতে শীলা খণ্ডের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হওয়াতে ক্রমশঃই এই তৈলের আবর্জনা রাশি পরিষ্কার হইয়া যায় এবং পরিশেষে ইহা হইতে অতি সুন্দর আলো বাহির হইতে থাকে।

এই স্থানের মৃত্তিকা এবং প্রস্তর অতিশয় লবণাক্ত। এখানে একটী লবণের হ্রদ আছে। হ্রদের অতি নিকট হইতেই কতকগুলি পার্ব্বত্য তৈলের (naptha) ঝরণা প্রবাহিত হইয়াছে। এই তৈল নানা প্রকার ঔষধের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

লোহিতবর্ণ তুষার।

আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত তুষার (snow) দেখেন নাই। ইহা অতিশয় শ্বেতবর্ণ, দেখিতে পরিষ্কার তুলার ন্যায়। আমাদের দেশে কেবল উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে ইহা পতিত হয়, কিন্তু য়ুরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে সমতল ভূমিতেও প্রচুর পরিমাণে পড়িতে দেখা যায়। ইহা বৃক্ষাদিকে এরূপে আবৃত করিয়া ফেলে যে, দেখিলে বোধ হয় শ্বেতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা ঐ বৃক্ষ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সময় সময় পর্ব্বতের ন্যায় স্তূপাকার তুষাররাশীর নীচে জীবজন্তু, গৃহ কুটির প্রভৃতিও চাপা পড়ে। জেনোয়া (Genoa) দেশে লে লেংহি (Le Langhe) নামক পর্ব্বতে একবার গাঢ় লোহিতবর্ণ তুষার পড়িয়াছিল। পরে ঐ তুষার গলিয়া রক্তবর্ণের ঝরণা চারিদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। আমাদের দেশেও অনেক সময় রক্তবৃষ্টির কথা শুনা যায়।

জগতের সীমা।

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ৯০ হাজার মাইল স্থির করিয়াছিলেন। অনেক গণনার পর এখন প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৮০০০ হাজার মাইল স্থির হইয়াছে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে সূর্য্যালোক পৃথিবীতে আসিতে ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড লাগে। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্যালোকে কামান

ছোড়া সহজ হইত, তাহা হইলে অত্যন্ত বেগবান্ গোলাও সূর্য্যে পৌঁছিতে ১৭ বৎসরের অধিক সময় লইত। পৃথিবীর খুব নিকটস্থ তারা হইতে এখানে আলো আসিতে ৩ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক সময় লাগে। এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাহা হইতে আলোক আসিতে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়। আবার কোন কোন তারা এতদূরে অবস্থিতি করিতেছে যে, সৃষ্টির আদি হইতে—প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৮০০০ মাইল—ছুটিতে আরম্ভ করিয়াও আজ পর্য্যন্ত তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। পাঠক পাঠিকা বুঝুন জগতের সীমা কোথায়!

—ধর্ম্মবন্ধু।

হাইকোর্টের দেশীয় জজ

৺দ্বারকানাথ মিত্র।

আমাদের দেশে যে কয়জন বড় লোক জন্মিয়াছেন দ্বারকানাথ মিত্র তাহার একজন। নিজের চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে যে, সম্মান ও পদগৌরবের উচ্চসীমায় উঠিতে পারা যায়, ইঁহার জীবনে আমরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমরা সংক্ষেপে দ্বারাকানাথ মিত্রের জীবনের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি।

হাবড়া জেলার অন্তর্গত আগুনসী নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে ১২৩৮ সালে দ্বারকানাথ মিত্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র মিত্র ইনি হুগলীতে মোক্তারী কার্য্য করিতেন। দ্বারকানাথ পিতার সহিত হুগলীতে আসিয়া, হুগলী কলেজে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। পিতা হরচন্দ্র পুত্র দ্বারকানাথের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন।

বালক দ্বারকানাথ স্বভাবতঃই খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিলেন। তাঁহার যখন বয়স বার বৎসর তখন জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বারকানাথ হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন এবং আট বৎসর কাল প্রাণপণ যত্ন, অক্লান্ত শ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিয়া বিশ বৎসর বয়ক্রম কালে হুগলী কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সে সময় দ্বারকানাথ হুগলী কলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। হুগলী কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ইংরাজী ভাষায় দ্বারকানাথের এই সময়েই বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। তাঁহার প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর এবং তাঁহার এই সময়ের রচিত অনেক ইংরাজী প্রবন্ধ তখনকার শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনীতে খুব আদরের সহিত মুদ্রিত হইত। ১২৫৯ সালের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনীতে বেকন (একজন বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার) সম্বন্ধে দ্বারকানাথের একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধটী এত উৎকৃষ্ট এবং রচনা এত পরিপাটী হইয়াছিল যে সকলেই তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন; এবং এই এক প্রবন্ধেই তিনি সে সময়ের হিন্দু-কলেজের ছাত্রবর্গের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত

হন। লেখাপড়ায় দ্বারকানাথের যেমন মনোযোগ ছিল, শরীরের প্রতিও তাঁহার তেমনি মনোযোগ ছিল। ক্রীকেট খেলায় দ্বারকানাথের বিশেষ উৎসাহ ছিল। একবার হুগলী ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের ক্রীকেট ম্যাচ্ হয়, এই উপলক্ষে বলের আঘাতে দ্বারকানাথের একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।

সাধারণত আমরা দেখি, যাঁহার সাহিত্যে বেশ একটু অধিকার আছে, অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁহার তেমন নাই। আবার যাঁহার অঙ্ক শাস্ত্রে অধিকার আছে, তাঁহার সাহিত্যে তেমন নাই। কিন্তু দ্বারকানাথের সাহিত্য ও গণিত উভয় বিষয়েই সমান অধিকার জন্মিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দ্বারকানাথের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। গণিতের পুস্তক সকলও তিনি অনায়াসে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দ্বারকানাথ ১২৬২ সালে কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে দোভাষীর (Interpreter) কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য করিতে করিতে তিনি সদর আদালতের আইনের পরীক্ষা দেন, এবং ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সদর আদালতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময় সদর দেওয়ানী আদালতে পারসী ভাষায় শিক্ষিত প্রাচীন উকীলগণেরই আদর ছিল, ইংরাজী শিক্ষিত দ্বারকানাথ এজন্য প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিভা কখনও লুকান থাকে না—প্রতিভা থাকিলে আজ হউক কাল হউক, লোকে তাহার পুরস্কার ও সমাদর করিবেই করিবে। ক্রমে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর জ্ঞান, আইনে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা এবং অসাধারণ প্রতিভা লোকে জানিতে পারিল। ক্রমে লোকে তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিল, যাহারা বিদ্বেষী ছিল তাহারাও তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। মৃত জজ শম্ভূনাথ পণ্ডিত সেই সময় সদর দেওয়ানী আদালতের একজন জজ ছিলেন। শম্ভূনাথ প্রথম হইতেই দ্বারকানাথকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দ্বারকানাথ একজন প্রখর বুদ্ধিশালী ও অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি। শম্ভূনাথ প্রথম হইতেই দ্বারকানাথকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিছিলেন।

১২৬৯ সালে পুরাতন সদর দেওয়ানী আদালত উঠিয়া যায় এবং বর্ত্তমান হাইকোর্ট প্রথম স্থাপিত হয়। হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ভাল ভাল উকীল কৌনসুলী বারিষ্টারগণ এদেশে আসিলেন। ইহাদের সংসর্গে দ্বারকানাথ ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতিভাও ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আইনে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, জটিল কুট বিষয় সকল সহজে ধারণা এবং তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতা শক্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উকীল ব্যারিষ্টার এবং বিচারকগণ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। জজ্ সার বার্ণস্ পিকক্ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ এবং তাঁহার শিক্ষা ও জ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিতেন। অনেকের ধারণা আইনের ব্যবসা যাহারা করেন তাঁহারা সকল সময় সৎভাবে চলিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু দ্বারকানাথ আইন ব্যবসায়ী হইয়াও সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সীমা লংঘন করেন নাই।

দ্বারকানাথের বক্তৃতাতে এক মোহিনী শক্তি ছিল এবং তিনি যাহা বলিতেন তাহাতে এত সারবান কথা থাকিত যে, বিচারক বা অন্যান্য উকীল বারিষ্টারগণ সর্ব্বদাই তাহা অতি আগ্রহের সহিত শুনিতেন। একবার ফুলবেক্ষের বিচারে দশ

আইনের এক মোকর্দ্দমায় দ্বারকানাথ ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রাম বক্তৃতা করেন। প্রতি-দিন বেলা এগারটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেন, একমুহূর্ত্তের জন্যও উৎসাহহীন বা ক্লান্ত হন নাই। শুনা যায় এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে দ্বারকানাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্য কলিকাতা ও তাহার নিকটস্থ রাজা জমিদার ও বড় বড় ইংরেজ ও অন্যান্য অনেক লোক প্রতিদিন হাইকোর্টে উপস্থিত হইতেন। ফুলবেঞ্চে বারজন জজ উপস্থিত ছিলেন, এতদ্ভিন্ন হাইকোর্টের অন্যান্য সমস্ত উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ উপস্থিত থাকিতেন। হাইকোর্টে দ্বারকানাথ গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় উকীলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রশংসার সহিত কিছু-কাল ঐ কাজ সম্পন্ন করিয়া ১২৭৩ সালে হাই-কোর্টের জজের পদ লাভ করেন। মৃত জজ্ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের স্থানেই দ্বারকানাথ নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট দ্বারকানাথকে হাইকোর্টের জজের পদ প্রদান করিয়া দ্বারকানাথের অসাধারণ প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান করিয়াছিলেন। জজের পদ লাভ করিয়া দ্বারকানাথের আয় অনেক কমিয়া গিয়া-ছিল। তিনি বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পাইতেন; কিন্তু ওকালতি করিয়া তাহা হইতে অনেক অধিক উপার্জ্জন করিতেন। সাত বৎসর কাল দ্বারকানাথ দক্ষতার সহিত জজের কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়া-ছেন। তাঁহার সময় হাইকোর্টে এমন অনেক মোকর্দ্দমা হইয়াছে যাহাতে অন্যান্য সমস্ত জজেরা একমত হইয়াছেন এবং এক দ্বারকানাথের মত অন্যরূপ হইয়াছে, কিন্তু বিলাতে আপিলে দ্বারকা-নাথের মতই বজায় রহিয়াছে।

উচ্চপদ লাভ করিলে অনেকেরই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু দ্বারকানাথ এমন উচ্চপদ লাভ করিলেও তাঁহার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সরলতা, সহৃদয়তা নম্রতা এ সমস্ত দ্বারকানাথের প্রকৃতির ভূষণ ছিল। দেশের হিতকর সকল কার্য্যেই তিনি একগ্রতার সহিত যোগ দিতেন। প্রবলের পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা তাঁহার একটী প্রধান ব্রত ছিল। তিনি এই কার্য্যে অনেক সময় কর্ত্তৃপক্ষদের বিরক্তি-ভাজন হইলেও কখনও কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই। এত কার্য্য সত্ত্বেও দ্বারকানাথ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। যত দিন জীবিত ছিলেন এ দিকে, তাঁহার বিলক্ষণ অনুরক্তি ছিল। বিজ্ঞান শিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভার উন্নতির জন্য তিনি চারি হাজার টাকা দান করেন। নিরাশ্রয় দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দ্বারকানাথ সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন।

দ্বারকানাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা এই খানেই শেষ করিলাম। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ১২৮০ সালে ১৫ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে তাঁহার কণ্ঠক্ষত রোগে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে,বঙ্গদেশ একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাই-য়াছেন।



পথ ভিখারী।



আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাহারা কলিকাতায় থাক, পথে বাহির হইলেই "কাণা অন্ধকে একটী পয়সা দাও বাবা," এই প্রার্থনাটী তাহাদের সকলেরই কাণে প্রবেশ করিয়াছে সন্দেহ নাই। এই কলিকাতা সহরে ছোট বড় সকল রাস্তাতেই অসংখ্য কাণা খোঁড়া অন্ধ আতুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যা কত তাহা আমরা এবার তোমাদিগকে জানাইতে পারিলাম না; গত সেন্‌সস্ অর্থাৎ লোক গণনার রিপোর্ট অনুসন্ধান করিয়া আগামী বারে তাহা জানাইব। যাহা হউক কলিকাতার এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এত অন্ধ আতুর কোথা হইতে আসে? স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন মনে উঠে। ইহারা সকলেই কি এখানে জন্মে? আমরা এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিয়াছি তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। মানুষ কত নীচ হইতে পারে, অর্থ-লোভে মানুষ কত প্রকার জঘন্য এবং নিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, ইহাতে তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি জঘন্য লোক এই কলিকাতা সহরে আছে যাহারা এই হতভাগ্য দীন দুঃখীদের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থে নিজের উদর পূর্ণ করে। ইহাদের এক একটী আড্ডা আছে। এই সকল স্থানে এই জঘন্য লোকগুলি এই সকল অন্ধ আতুরদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখে। আপা-ততঃ বোধ হয় যেন ইহারা অতি মহৎ কাজ

করিতেছে। অন্ধ আতুর অনাথ নিরাশ্রয় দিগকে আশ্রয় দিয়া মহা সৎকাজ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সকল অনাথ লোক-দিগকে আশ্রয় দিবার জন্য ইহারা সংগ্রহ করে না। এটি তাহাদের একটী অর্থ উপার্জ্জনের পথ মাত্র।

এই লোকগুলির কার্য্য-তৎপরতা সামান্য নয়। কেবল যে এই সহরের অন্ধ আতুরদিগের দ্বারা ইহারা এই জঘন্য ব্যবসা চালায় তাহা নয়, ইহারা দূর মফঃস্বল ও পল্লীগ্রাম হইতে কাণা, খোঁড়া, অন্ধ আতুরদিগকে সংগ্রহ করিয়া আনে এবং তাহাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থে নিজের উদর পূর্ণ করে। প্রতি-দিন প্রত্যুষে এই হতভাগ্যদিগকে সহরের স্থানে স্থানে ইহারা বসাইয়া দেয়। হতভাগ্যগণ হেমন্তের শীত, চৈত্র বৈশাখের দারুণ রৌদ্র, আষাঢ় শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা মাথায় করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা করে। সন্ধ্যার সময় ইহাদের প্রভুরা আসিয়া ইহাদিগকে গৃহে লইয়া যায়। এবং এত কষ্টে ভিক্ষা করিয়া যে কয়টী পয়সা পায়, তাহা আত্মসাৎ করে। এই কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের পরিবর্ত্তে হতভাগ্যগণ প্রভুদের নিকট একমুঠা অন্ন মাত্র পায়। যদি কোন হতভাগা একদিন কিছু ভিক্ষা না পায় তবে সে দিন আর তাহার অদৃষ্টে সেই অন্নমুঠাও জুটে না! যদি কেহ ভিক্ষা করিয়া খুব অল্পই পায়, তবে তাহার অদৃষ্টে একমুঠার স্থানে অর্দ্ধ মুঠা অন্ন দেওয়া হয়। পেট ভরিয়া কেহই খাইতে পায় না। এই লোকগুলির নিষ্ঠুরতার কথা মনে করিতে শরীর কম্পিত হয়। কাহা-রও যদি এক দিন ভিক্ষা না মিলে তবে যে কেবল তাহাকে অনাহারে থাকিতে হয়, তাহা নহে; নৃশংস প্রভুদের নিকট তিরস্কার এবং অনেক সময় প্রহার পর্য্যন্তও সহ্য করিতে হয়। একবার চিন্তা করিয়া দেখ মানুষ কতদূর হীন ও নৃশংস হইতে পারে। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কত জঘন্য নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করে!

দুঃখী অন্ধকে দয়া করা মানুষের স্বাভাবিক। উহাদের রক্ষকদিগের প্রকৃতি দেখিলে কি, তাহা-দিগকে মানুষ বলিয়া বোধ হয়? বাস্তবিক ইহারা মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। বাহিরে ইহাদের মানুষের আকৃতি বটে কিন্তু ইহাদের হৃদয় বোধ হয়, পশুর অপেক্ষাও জঘন্য ও হীণ। সখার পাঠক পাঠিকা তোমরা যদি এই অসংখ্য অসংখ্য অন্ধ, আতুর, নিরাশ্রয় ও অনাথদিগের এক জনাকেও এক মুঠা অন্ন বা একখানি বস্ত্র দিয়া ইহাদের দুঃখমোচন কর, তবে আমাদের প্রাণ স্বার্থক মনে করিব।



ধাঁধা।

তিন অক্ষরে নাম মোর সকলে আদরে,
মস্তক কাটিলে মোরে সবে ত্যাগ করে;
কোমর কাটিলে মম দেহে যাহা রয়,
দুরূহ সকল কর্ম্ম তাহাতেই হয়।
চরণ বিহীন যদি করহে আমারে,
ন্যূনতা প্রকাশ করি সবার গোচরে।
অতঃপর বল ভাই আমার কি নাম,
জল, স্থল উভয় স্থানেই মম ধাম।



মার্চ্চ, ১৮৯২।



বিবিধ।

মহারাজা জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুর অনাথা বিধবাদিগের সাহায্যের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। অসহায় নিরাশ্রয় বিধবাদিগের দুঃখে ব্যথিত হইয়াই মহারাজা এই দান করিয়াছেন। তাঁহার এই টাকায় অনেক অনাথা বিধবা আশ্রয় পাইবে, এবং তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। এই প্রকার সৎকার্য্যে দান আমাদের দেশে বড়লোকদের মধ্যে বড় কম দেখা যায়। যাঁহাদের অর্থ আছে সামর্থ্য আছে, যাঁহারা বড়লোক, তাঁহারা দুঃখী অনাথদিগের দিকে না তাকাইলে আর কে তাকাইবে? মহারাজার এই দান অতি প্রশংসনীয়।

*
* *

কলিকাতা সহরের অন্ধদিগের সংখ্যা পাঠক পাঠিকাদিগকে এই মাসে জানাইব, গতবারে এই কথা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা এবারও সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই, আশা করি আগামীবারে জানাইতে পারিব। গত ১৮৯১ সালের 'সেনসস্' অর্থাৎ লোক গণনায় স্থির হইয়াছে যে আমাদের এই ভারতবর্ষে লোক-সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২৮৮০০০০০০। ইহার মধ্যে হিন্দু ২০৭,৬৫৪,৪০৭; মুসলমান ৫৭৩৬৫২০৪; খৃষ্টান ২২৮৪১৯১; জৈন ১৪১৬১৯৯; শিখ ১৯০৭৮৩৬; বৌদ্ধ ৭১০১০৫৭; পার্শী ৮৯৮৮৭; ইহুদী ১৭১৮৯; জন্তু উপাশক ৯৩০২০৮৩; নাস্তিক ২৮৯; অজ্ঞাত ধর্ম্মী ৫০০০০০; ব্রাহ্ম ৩৪০১। ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮১ সালে যে 'সেনসস্' হয় তাহা হইতে এবার ৩৫০০০০০০ লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে।

*
* *

আমেরিকার টেনিসি মেডিকেল সোসাইটীতে ডাক্তার বেল নামক একজন ডাক্তার একটী স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটীর বয়স এখন ৭১ বৎসর, দেখিলে বেশ সুস্থ বলিয়াই বোধ হয়, কোন প্রকার রোগ আছে এমন বোধ হয় না। একুশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম এই স্ত্রীলোকটীর আঙ্গুলের মাথার হাড় খসিয়া পড়ে। ইহাতে কোন প্রকার ফুলা বেদনা বা রক্তপাত বা অন্য কোন প্রকার অসুখ তাহার হয় নাই, এবং হাড় খসিয়া পড়িবার পূর্ব্বে কিছু জানিতেও পারে নাই। যে স্থান হইতে এই হাড় খসিয়া পড়িত, ঐ স্থানে পুনরায় আবার নূতন হাড় জন্মিত। এই প্রকারে প্রতি বৎসরই তাহার হাড় পড়িয়া যাইত এবং সেই স্থানে আর একখানি নূতন হাড় দেখিতে পাওয়া যাইত। ডাক্তার বেল ইহার

৬০০ শত টুকরা হাড় সংগ্রহ করিয়াছেন, মেডিকেল সোসাইটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ হাড় কোন প্রকার রোগগ্রস্ত নয়।

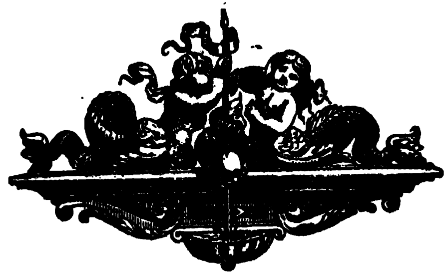
*
* *

ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর দেশ ছাইয়াছে। সহরে পল্লিতে যেখানে যাও প্রতি ঘরেই ইনফ্লুয়েঞ্জা। বিলাতে এই রোগে কত লোক মরিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। অনেকগুলি বড় লোকেরও এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের দেশে তত লোক না মরিলেও ইনফ্লুয়েঞ্জার ভোগ বড় কম হইতেছে না। এই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ জানিয়া রাখা মন্দ নয়। বার্লিনের ডাক্তার পিফার, ডাক্তার কিটাষ্টো এবং ডাক্তার ক্যানন পরীক্ষা দ্বারা ইনফ্লুয়েঞ্জার একই কারণ স্থির করিয়াছেন। ইহাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। এবং তিন জনেই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁরা বলেন যে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটাণুই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ; এই কীটাণু দ্বারাই এই রোগ সংক্রামিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা ইহাঁরা এই কীটাণুর আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই স্থির করিয়াছেন। এই কীটাণু ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর মুখের লালা, কফ এবং কাশির মধ্যে প্রচুর পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কখন কখন ফুস্ ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটায়। ডাক্তার ক্যানন এই কীটাণু ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর রক্তের মধ্যেও দেখিতে পাইয়াছেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর লালা কফ এবং কাশি খুব সাবধানে এমন স্থানে ফেলা উচিত যাহাতে ঐ সকল কীটাণু কোন প্রকারে সংক্রামিত না হইতে পারে। এই উপায়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে অনেক রক্ষা হইতে পারে।

আমেরিকার চিকাগো নগরে যে বিশ্ব-প্রদর্শণী হইবে, তাহাতে একটী প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে, এই মন্দিরের নাম হইবে "The odd fellow's temple"— অর্থাৎ অদ্ভুত লোকদের মন্দির। পৃথিবীতে যত মন্দির আছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইবে। ৫৫৬ ফুট অর্থাৎ তিনশত চার হাত উচ্চ এবং পরিধি ৩৫০০০০ বর্গ ফুট হইবে। মন্দিরটী বিশতলা হইবে। মন্দিরটী ষাইট মাইল দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

*
* *

মাটিতেই বৃক্ষ জন্মে, বরফে কিন্তু জন্মে না। বরং মাটিতে যাহা জন্মে বরফাবৃত হইলে তাহাও মরিয়া যায়, ইহাই জানিতাম। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসের 'সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান' পত্রিকায় একটি ছোট ফুলের গাছের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে, এই গাছ বরফে জন্মে, কালিফর্ণিয়া প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন সমস্ত বরফে আবৃত হইয়া যায়, বৃক্ষ লতা ফুল কোথাও কিছু আর দেখা যায় না—তখন ইহার ফুল ফুটিয়া উঠে। ইহার পাতা গুলি অনেকটা আমাদের দেশের ঘৃতকুমারী গাছের পাতার ন্যায়, ফুল গুলি থোপা থোপা এবং গাছটীর রং লাল।



মৃগনাভি।

(গত মাসের ২০ পৃষ্ঠার পর)

অন্নদা মঙ্গলে আছে :—

"দোঁহার আধ আধ আধ শশি, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী আধই চারু কবরী রে।
এক কাণে শোভে ফণি মণ্ডল, এক কানে শোভে মণি কুণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভুতি ধবল আধই গন্ধ কস্তুরী রে।

বাসবদত্তা নামক পুস্তকেও কস্তুরীর কথা অনেক। আসল কথা এই, কস্তুরি গায়ে না মাখিয়া সে কালের ভদ্র সমাজে যাইবার যো ছিল না। চীন দেশে এখনও লোকে ইহা গায়ে মাখিয়া থাকে। স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে ইহার ব্যবহার অধিক। চাউলের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া ইহা তাঁহারা মুখে মাখিয়া থাকেন। অন্য অন্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া মাথার চুলেও মাখেন। দেখ দেখ কেমন একটি চীন নারী কস্তুরী মাখিয়া, মাথার বেণি লম্বমান করিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছেন।



ইনি কুমারী। ইঁহার এখনও বিবাহ হয় নাই, তাই ইঁহার বেণি লম্বমান। যখন ইঁহার বিবাহ হইবে, তখন ইনি খোঁপা বাঁধিবেন। কিরূপ করিয়া খোঁপা বাঁধিবেন? পাঠক, পাঠিকা এই নাক সিঁটকাণী পাড়া কুন্দুলির ছবিতে দেখ না!



চীণ দেশেও অনেক মৃগনাভি হয়। সেখানকার মোহাঙ্গ মঙ্গ ও মহাঙ্গ বিনান প্রদেশেই ইহা অধিক জন্মে। চীণদিগের বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীতে এমন রোগ নাই যাহা মৃগনাভি দ্বারা দূরীকৃত হয় না। পাও-পোসি নামক এক জন চীণ ডাক্তার বলেন যে মৃগনাভি কাছে থাকিলে সাপে কামড়ায় না। তিনি বলেন যে কস্তুরি-হরিণ সাপ ধরিয়া খায়, সুতরাং যদি পায়ের নখের নিচে মৃগ নাভি রাখা যায়, তাহা হইলে ভয়ে সাপ পলাইয়া যায়, মানুষকে আর সাপে কামড়াইতে পারে না।

সেকালের মুসলমান দিগের মধ্যেও মৃগমদের বড় আদর ছিল। কোরাণে লিখিত আছে যে সপ্তমস্বর্গ মাটিদিয়া গঠিত নয়। মৃগনাভি ও কেশর মিশ্রিত সন্দেশ দিয়া ইহা গঠিত। আবার সেখানে যে দেবকন্যাগণ আছেন, তাঁহাদের সর্ব্বশরীর বিশুদ্ধ মৃগনাভি দিয়া নির্ম্মিত। এই কথা শুনিয়া ইউরোপ বাসী সাহেবেরা বলেন যে "আমরা এরূপ স্বর্গে যাইতে চাহি না; অল্প স্বল্প মৃগনাভির গন্ধ ভাল বটে, কিন্তু একস্থানে এরূপ রাশি রাশি মৃগনাভি থাকিলে সুগন্ধ বড়ই উগ্র হইয়া উঠিবে। আমরা তাহা সহ্য করিতে

পারিব না, আমরা মূর্চ্ছা যাইব।" মুসলমানেরা মৃগনাভি এত ভাল বাসেন যে কোনও কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি ঘর করিবার সময় চুণ সুরকির সহিত ইহা মিশাইয়া দেন। বহুকাল ধরিয়া মৃগনাভির গন্ধ থাকে সুতরাং সে ঘরও বহুকাল ধরিয়া সুবাসিত থাকে। তুরস্ক দেশে কড়া-আমেদ নামক নগরে একটী মসজীদ আছে। এই মসজীদটী একজন ধনবান বণিক নির্ম্মাণ করেন। ইহার চুণ সুরকির সহিত তিনি সত্তর জক্ মৃগনাভি মিশাইয়া দিয়াছিলেন। জক্ কাহাকে বলে জানি না। যাহা হউক লোকে বলে যে এই মসজীদে আজ পর্য্যন্ত মৃগনাভির গন্ধ আছে। আবার টরীস নামক নগরে যোবেদী নামক নারী আর একটী এই রূপ মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্তও তাহা হইতে মৃগনাভির গন্ধ বাহির হয়।

সচরাচর বাজারে তিন প্রকার মৃগনাভি দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতের মৃগনাভি চীণের মৃগনাভি, ও রুষের মৃগনাভি। তিব্বতের মৃগনাভি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তিব্বত ও ভারত-বর্ষের মৃগনাভিকে সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, যথা—

নেপালেঽপিচ কাশ্মীরে কাম ভূপেঽপি জায়তে।
কাম ভূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ,
কাশ্মীরে দেশ সম্ভবা কস্তুরীহ্যধমা স্মৃতা।

অর্থাৎ নেপালে, কাশ্মীরে ও কাম ভূপে মৃগনাভি হয়। কামভূপে যাহা হয় তাহা শ্রেষ্ঠ, নেপালে মধ্যম ও কাশ্মীরে যাহা হয় তাহা অধম।

বিশুদ্ধ মৃগনাভি পাওয়া বড়ই কঠিন। এক রতি মৃগনাভি দ্বারা গন্ধ করিয়া লোকে নানারূপ কৃত্রিম মৃগনাভি প্রস্তুত করে। কিম্বা আসল মৃগনাভি টুকু বাহির করিয়া থলিটী অপর কোন বস্তু দিয়া পরিপূর্ণ করে। লোকে বলে যে, একটী সূচের অগ্রভাগে হিঙের গন্ধ করিয়া থলির ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া বাহির করিয়া লইলে, যদি তাহাতে হিঙের গন্ধ আর না থাকে, তবেই জানিবে যে সে বিশুদ্ধ মৃগনাভি, আর যদি হিঙের গন্ধ থাকে তাহাহইলে সে ঠিক মৃগনাভি নয়। একথা সত্য কিনা জানি না। মৃগনাভি ঔষধিতে খুব ব্যবহার হয়।

আমাদের দেশে এক প্রকার গাছ আছে তাহাকে কস্তুরী গাছ বলে। ঢেঁড়স্ যে জাতীয় গাছ, ইহা ও সেই জাতীয় গাছ। ইহার বীজে ঠিক মৃগনাভির মত গন্ধ। এই বীজ মাথা-ঘসার মসলায় ব্যবহার হয়। এই গাছের ছালে আবার পাট হয়। আমরা ইহার একবার চাস করিয়াছিলাম। কোনও পাঠক যদি ইহার চাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 'সখার' অধ্যক্ষগণ দুই পয়সার টিকিট পাইলে এই বীজ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।



জীবনাগ্নি।*

সখার পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই জান যে মৃতদেহ দগ্ধ করা হয়। জীবিত অবস্থায় কেহ কখন লোককে দাহ করা দেখিয়াছ কি?

*লেখক শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম সখার পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সুপরিচিত। পূর্ব্বে ইনি সখার একজন প্রধান লেখক ছিলেন, গত কয়েক বৎসর অন্য স্থানে থাকায় তিনি সখায় লিখিতে পারেন নাই। এখন হইতে পুনরায় তিনি নিয়মিতরূপে লিখিবেন।

তোমরা আশ্চর্য্য হইবে যে এও কি কখন হইতে পারে? আজ কিন্তু এই বিষয়েই কিছু লিখিব আমরা জানিনা যে এই জীবিত অবস্থাতেই আমরা সকলে ধীরে ধীরে দগ্ধ হইতেছি। পাঠক পাঠিকা-গণ, তোমরা প্রত্যেকেই এবং আর সমুদয় বন্ধু বান্ধব, এই লেখক এবং অন্যান্য সব লোক ও যাবতীয় জীব জন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে পুড়িতেছে। শুধু তাই নয়, এই দাহনই জীবন। ইহা বন্ধ হইলেই এই জীবন ত্যাগ হয় ও দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ করা হয়। সুতরাং ইহাই প্রাণিগণের জীবনের লক্ষণ। যতক্ষণ জীব শরীরে এই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে ততক্ষণই সে জীবিত, যেই মাত্র এ অগ্নি নিভিয়া যায় অমনি জীব প্রাণত্যাগ করে। এই নিমিত্ত ইহাকে "জীবনাগ্নি" কহা যায়। সংক্ষেপে ইহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

"উত্তাপ জীব শরীরের এক নিরবচ্ছিন্ন লক্ষণ ও জীবনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান। আমাদের শরীরে উত্তাপ না হইলে এক মিনিটও চলিতে পারে না। হিম অঙ্গ হইলে তাই এত ভয় করি যে আর বাঁচিব না। এ উত্তাপ কোথা হইতে জন্মে? দেহের ভিতরে যে অগ্নি নিরন্তর জ্বলিতেছে এ তাহারই তাপ। যখন ইচ্ছা জিহ্বাতে হাত দিয়া দেখ গরম। যে বায়ু প্রশ্বাসরূপে নাশিকা হইতে বাহির হয় তাহাও গরম। জীবদেহের মল ও মূত্র যখন নির্গত হয়, সকলেই জান তাহাও গরম; এ সমুদায় ঐ ভিতরের অগ্নির পরিচয়। জ্বর হইলে এই উত্তাপ বৃদ্ধি হয়; তখন থার্ম্মমিটার বগলে বা জিহ্বার নীচে দিয়া ডাক্তারেরা পরীক্ষা করেন—উত্তাপ কত। ছাগাদি বলিদানের সময় বা অন্য সময় যখন রক্ত বাহির হইতে দেখা যায় সে রক্ত গরম থাকে, ক্ষণেক বাহিরে থাকিলেই তাহা শীতল হইয়া জমিয়া যায়। জীবদেহে রক্তের এই উত্তাপই প্রাণের মূল কারণ। ইহা ঐ অগ্নির পরিচয়।

অনেকক্ষণ আহার না পাইলে আমাদের কষ্ট হয়। লোকে বলে "ক্ষুধানল" বা "জঠরানল" জ্বলিতেছে। এ কথা বস্তুতঃ একভাবে সত্য। অগ্নিতে কাষ্ঠাদি সামগ্রী পতিত হইলে যেরূপ জ্বলিয়া যায়, ক্ষুধার সময় আহার করিলেও প্রায় সেই রূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। দেহের অন্তরস্থ অগ্নিতে আহারীয় সামগ্রী পরিপাক হইয়া যেখান-কার যে উপকরণ প্রয়োজন সেখানেই সেই উপ-করণে পরিণত হয়। উহার কতক অংশ রক্ত, কতক মাংস কতক অন্যান্য নানারূপ ধারণ করিয়া শরীরে ব্যাপ্ত হয়; অবশিষ্ট অনাবশ্যক অংশ মল ও মূত্রাদি রূপে বহির্গত হয়।

আমরা যে শরীর চালনা করিয়া থাকি তাহাও এই অগ্নির কার্য্য। ইহারই বলে মাংস-পেশী সকল স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, ইহারই ফলে দেহের ক্ষতি পূরণ ও পুষ্টিসাধন হইতেছে। ইহার সাহায্য না হইলে আমরা মানসিক চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারি না। এই অগ্নিতেই শোণিত উত্তপ্ত, ইহারই তেজে রক্ত শিরাসমূহে প্রবাহিত হইতেছে। এই অগ্নিই জীবের জীবন।

নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া না হইলে আমরা এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকি না। এই শ্বাস প্রশ্বাসই জীবনাগ্নির কারণ। তোমরা জান বায়ুতে অক্সিজেন নামে এক বাষ্প আছে। এই অক্সিজেন বাষ্প দাহনে প্রধান সহায়। বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু নিশ্বাস পথে ভিতরে যায়। তাহার অক্সিজেন সেখানে গিয়া শরীরের রক্তের সহিত মিলিয়া যায়। ঐ রক্তের মধ্যে অক্সিজেন প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নি জ্বালায়। সেই অগ্নিতে দূষিত পদার্থ সমূহ দগ্ধ হইয়া প্রশ্বাস বায়ুর সহিত বাহিরে আসে।

এবং শোণীত বিশুদ্ধ ও পুষ্ট হইয়া প্রবল বেগে শিরাপথে ধাবমান হয়। এইরূপে সমস্ত শরীরের ক্ষতি পূরণ করিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আসিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত সাক্ষাৎ করে ও অগ্নিতে শুদ্ধ হয়। এইরূপে প্রতি নিশ্বাসে আমাদের দেহে অগ্নির উৎপত্তি হইতেছে। ও তাহারই দাহন ক্রিয়ার প্রসাদে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। এই অগ্নির উত্তাপে আমাদের সমুদায় শরীর, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সদা সর্ব্বক্ষণ দগ্ধ হইতেছে, তাই আমরা বাঁচিয়া আছি।



চরণ ও ভাট।



রাজস্থান হিন্দু জাতির গৌরব স্থল। বীরত্ব তেজস্বিতা, স্বদেশ-প্রেম ও আত্মবিসর্জ্জনের এমন দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাজপুত বালক হাসিতে হাসিতে স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জণ করিয়াছে, রাজপুত বালিকা অম্লান বদনে স্বদেশের জন্য জীবন আহুতি দিয়াছে। রাজপুত পুরুষ স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য সকল কষ্ট বুক পাতিয়া লইয়াছে, রাজপুত রমণী স্বদেশের জন্য অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সকলই চলিয়া গিয়াছে, আছে কেবল স্মৃতি! চরণ ও ভাট যদি না থাকিত আমরা রাজপুত গৌরবের চিহ্নও আজ খুঁজিয়া পাইতাম না। সেই স্মৃতি রক্ষার জন্য চরণ ও ভাট আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই অপূর্ব্ব জাতির উৎপত্তি, কার্য্যকলাপ এবং অধিকার অতি আশ্চর্য্য। রাজপুত গৌরব অস্তমিত হইয়াছে কিন্তু এই জাতির ক্ষমতা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বিবাহে শ্রাদ্ধে রাজপুত রাজাগণ ইহাদের ভয়ে জড়সড়। আজও রাজপুত রাজ-দরবারে তাহারা সম স্বরে রাজা ও রাজবংশের গুণ কীর্ত্তণ করিয়া থাকে। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। মহাদেব তাঁহার সিংহ ও ষাঁড় রক্ষার জন্য ভাট সৃষ্টি করেন। কিন্তু সিংহ ষাঁড়কে বধ করিতে যায়, ভাট কোনরূপেই তাহা নিবারণ করিতে পারে না। মহাদেব ইহাতে ত্যক্ত হইয়া ভাটের ন্যায় ভক্ত, কিন্তু তাহা অপেক্ষা সাহসিক চরণের সৃষ্টি করিলেন। যেদিন হইতে চরণের হস্তে রক্ষার ভার অর্পিত হইল সেদিন হইতে সিংহ আর ষাঁড় বধ করিতে পারিল না। কেহ কেহ এই গল্পের নৈতিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সিংহ পাশব বলের চিহ্ন, ষাঁড় ন্যায়। দুর্ব্বল ভাট ন্যায়কে পাশব বলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিল না দেখিয়া পরমেশ্বর তেজস্বী চরণের সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, ন্যায় আর পাশব বল দ্বারা বিনষ্ট হয় না। গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। চরণ ও ভাট নানা কার্য্য, নানা ব্যবসা করে। তন্মধ্যে রাজপৌরহিত্য এবং রাজবংশাবলী লেখা প্রধান কার্য্য। এক সময় তাহার রাজমন্ত্রির কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছে। দুঃখে বিপদে রাজপুত রাজ সান্ত্বনার জন্য তাহাদের শরণাগত হইয়াছেন। ইহারা বংশের বিবরণ রক্ষক, বিবাহের ঘটক। নীচকে উচ্চ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ইহাদের

আছে। চরণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণীকে কাবিলী বলে, তাহারা ব্যবসা বানিজ্য করে। দ্বিতীয় শ্রেণীকে মরু বলে, তাহারা কবি। ইহাদের আবার ১২০টী শাখা, অনেকে রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ-বংশজাত। হিন্দু স্থানে ভাট দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চরণ শুধু রাজপুতনা ও পশ্চিম মালবে। দেশের ও সমাজের অবস্থা হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। রাজপুত যখন গঙ্গা-তট ছাড়িয়া রাজস্থানে আসিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিল না, ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য এক সম্প্রদায় লোকের আবশ্যক; চরণ সেই কার্য্য সম্পাদন করিত, সেই পুজা ব্রত নিয়ম শিক্ষা দিত, কেহ বা রাজবংশাবলী লিখিত। এখনও রাজপুত রাজা-গণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চরণকে অধিক সম্মান করেন। চরণের রক্তপাত ভয়ানক পাপ, এই কুসংস্কার দ্বারা চরণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। যখন দেশ-ময় অরাজকতা এবং চারিদিক চোর দস্যুর ভয় ছিল, তখন চরণ পথিক ও ব্যাবসায়ীর রক্ষক স্বরূপ ছিল। রাজপুত দস্যু পথিককে আক্রমণ করিলে চরণ তরবারি লইয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিত; যদি তাহারা কথা না শুনিত তবে ইহারা আপনার দেহে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিত, যদি তাহাতেও নিবৃত্ত না হইত তবে বালিকা অথবা বৃদ্ধা রমণী বধ করিয়া অভিসম্পাত করিত। বালিকা এবং রমণীগণও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে তত একটা ভয় করিত না। রাজপুত রাজারা ইহাদিগকে বিশেষ সম্মান করেন। যখন ইহারা ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয় তখন অন্যের অপেক্ষা ইহাদিগের নিকট হইতে কম মাসুল আদায় করা হয়। বিবাহে শ্রাদ্ধে ইহাদিগকে দান দক্ষিণা বিলক্ষণ করা হয়। বিবাহে শ্রাদ্ধে তাহারা কিরূপ অত্যাচার করে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বাগলির রাজ-কুমার ভিম সিংহের সঙ্গে বাসুঁয়ারার রাণীর কোন আত্মীয়ের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু চরণ গণ এত দান দক্ষিণা চাহিয়াছিল যে ভীম সিংহ বিবাহ করিতে পারিলেন না; এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আজ দুই বৎসর হইল কোন রাজপুত রাজা চরণের ভয়ে গভীর রাত্রে, বিনা সমারোহে চুপি চুপি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। চরণদের আত্মবিসর্জ্জনের নাম "চণ্ডি"! পাঁচ বৎসরের বালিকা হইতে অশতি বর্ষিয়া বৃদ্ধা পর্য্যন্ত যখন আবশ্যক তখনই অনায়াসে জীবন বিস-র্জ্জন করিতে শিক্ষা পায়। সৎকার্য্যের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জণ পুণ্য, কিন্তু কুসংস্কারের জন্য আত্মবিসর্জ্জণ পাপ এবং আত্মহত্যা; ভাট আত্মবিসর্জ্জণ করে না। বংশাবলী লেখক বলিয়া তাহাদের ক্ষমতাও অসীম। যাহাদের প্রতি দয়া হয় তাহাদের গুণ কীর্ত্তণ করে। যাহাদের প্রতি রাগ হয় তাহাদিগকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেএবং গালি দেয়। ইহাদিগের প্রতিহিংসা লইবার একটী প্রধান উপায় এই ছিল যে, যাহার প্রতি রাগ হইত তাহার মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া জুতা বাঁধিয়া কুৎসা গাইয়া গাইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরিত। তাহারা রাজ.ক্ষমতার অতীত ছিল। ১৮১২ খৃঃ অব্দে হোলকার রাজ্যের এক জন প্রধান বণিক সেবতরাম শেঠকে ভাটের কোপে পড়িয়া বড়ই লাঞ্ছণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। শেষে তাঁহার আত্মীয়গণ ভাটকে টাকা দিয়া বিপদ মুক্ত হন। আজ কাল আর সে দিন নাই। শিক্ষার আলোকে কুসংস্কারকে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। চরণদের ঢিলা চাপকান, ঢিলা পায় জামা বড় পাগড়ী, দেখিতে ঠিক কাবুলিদের মত। স্ত্রীলোক দের পোষাক ও অন্য রাজপুতদের পোশাকের ন্যায় নহে। তাহারা পৃথক গ্রামে বাস করে পথিক দেখিলেই মধুর স্বরে গান করিয়া গৃহে

আহ্বান করে। উদয়পুর রাজ্যে মুরলা নামে একটী গ্রাম আছে, সেখানে সহস্র সহস্র চরণ বাস করে, সেই গ্রামে মহারাণা গেলে চরণ রমণীরা আসিয়া রাজাকে কয়েদ করে, যে পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগকে "গোট" অর্থাৎ ভোজ না দেন সে পর্য্যন্ত তাহারা ছাড়ে না। ইহাদের এইরূপ আধিপত্যের একটী কারণ আছে। মহারাণা হামির কুষ্ঠরোগ আরোগ্যের জন্য সমুদ্রতটে হিঙ্গ লাজের মন্দির তীর্থে যাত্রা করেন, কচ্ছ ভূজের প্রান্তে একটা চরণ শিবিরের নিকট ঘোড়া হইতে নামিতে ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন একটী যুবতী আপনার খাদ্য সামগ্রী দূরে ফেলিয়া রাজার ঘোড়া ধরিতে আসিয়াছে, রাজা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যে খাদ্য সামগ্রী বালিকা প্রস্তুত করিতেছেন তাঁহার সঙ্গীয় লোকগণ তাহা পাইলে কত সুখী হইবে। যুবতী রাজার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই খাদ্য সামগ্রী দিতে স্বীকার করিলেন। মহারাণা বলিলেন এত অল্প সামগ্রীতে তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না। যুবতী বলিলেন, ভগবানের ইচ্ছা হইলে হইবে। এই বলিয়া সেই খাদ্য সামগ্রী তাহাদের সম্মুখে রাখিলেন। আহার করিয়া সকলেরই ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল। রমণী বালুকা রাশীর মধ্যে একটী গর্ত্ত করিলেন, নির্ম্মল জল উত্থিত হইল সেই জল দ্বারা সকলের তৃষ্ণা নিবারিত হইল। মহারাণা আরোগ্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চরণদিগকেও সঙ্গে নিয়া আসিলেন। মুরলা গ্রাম খানি তাহাদিগকে দান করিলেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিলেন। চরণ যুবতীর আতিথ্যের স্মৃতি স্বরূপ চরণ রমণীগণ রাজাকে কারাবদ্ধ করিবার অধিকার পাইল।

প্রত্যেক অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য ঘটনার সঙ্গে এক একটা অলৌকিক ঘটনা মিশ্রিত থাকে। আমরা কল্পনার ভাগ ছাড়িয়া দিলে সকল বিষয় হইতেই শিক্ষা লাভ করিতে পারি। একটী দুর্ব্বল জাতি কিরূপে সবল রাজপুত রাজাদের উপর অধিকার স্থাপন করিল? ধর্ম্মের বলে; ধর্ম্মের এমনি একটি মোহিনী শক্তি আছে, সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, যাহার হাতে ধর্ম্মের ভার সেই সকলকে শাসন করে। পাশব বল ধর্ম্ম বলের নিকট চিরদিন মস্তক অবনত করে। দ্বিতীয় কথা, ইহারা বংশাবলী লেখক, সকলেরই ইচ্ছা আপনার নাম আপনার বংশের কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকুক। এই দুই কারণে রাজপুত রাজাদের উপর ইহাদের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল।

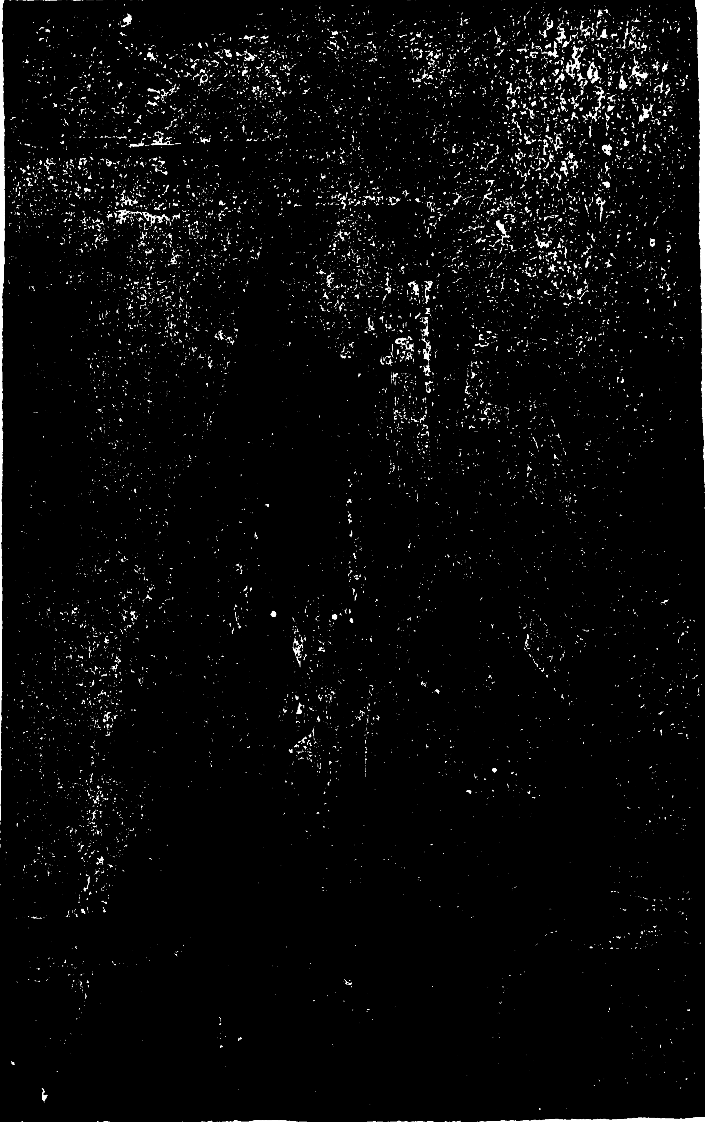


হিমালয় ভ্রমণ।

(বালিকার লিখিত)

সখার পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিয়াছ, ভারতবর্ষের উত্তরে যে হিমালয় পর্ব্বত তাহাও দেখিয়াছ। অনেকেই জান এই হিমালয় পর্ব্বতে দার্জ্জিলিং বলিয়া একটি অতি স্বাস্থ্যকর জায়গা আছে। অনেকেই স্বাস্থ্য ভাল করিবার জন্য দার্জ্জিলিং যান। আমরাও গত মে মাসের প্রথমে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলাম। সেখানে ৮ মাস কাল ছিলাম। এই ৮ মাস কাল অবস্থিতি কালে আমরা সেখানকার অনেক জায়গা দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে ফেলুট বলিয়া যে উচ্চ

শৃঙ্গে গিয়াছিলাম সে বিষয়ে আজ আমি তোমাদিগকে কিছু বলিব। আমি যে এ বিষয়টি ভাল করিয়া বর্ণনা করিতে পারিব তাহা বোধ হয় না, তবুও যাহা পারি লিখিতে চেষ্টা করিব। আশা করি তোমরা ইহা পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবে।



দার্জ্জিলিংএর ছবি।

আমরা দার্জ্জিলিংএর অনেক জায়গা দেখিয়াছি যেমন রঙ্গিত বা রঞ্জিত, সিঞ্চল যুমরক ইত্যাদি। একদিন সকালে আমরা এবং আরও দু একটি ভদ্র লোক থাইতে বসিয়াছি, তখন একজন বলিলেন "আম্মাদের ফেলুটে 'মাউন্ট এভারেষ্ট' দেখিতে গেলে হয় না?" আমরাও ভাবিলাম "গেলে ত বেশ হয়।"

কিন্তু আমার মত বালিকার ভাগ্যে যে যাওয়া হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে যাইবার ইচ্ছা জানাইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল। কেহ কেহ বলিলেন "আপনারা এই সময় (নবেম্বর মাসের শেষে) যাইবেন না, গেলে শীতে জমিয়া যাইবেন" ইত্যাদি আরও অনেক নিরুৎসাহ জনক কথা বলিলেন। কেহ বলিলেন "সেখানে বড় চোর ডাকাতের ভয়, আপনারা যাইবেন না, আপনাদের মারিয়া ফেলিতে পারে।" আবার অনেকে খুব উৎসাহও দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "যদিও এখন সেখানে বরফ পড়িতেছে, কিন্তু এই সময়েই 'মাউন্ট এভারেষ্ট' দেখিবার উপযুক্ত সময়।" সখার পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের দার্জ্জিলিং যাওয়া হয় নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে কেন সেই বন্ধুটী এই সময়কে 'উপযুক্ত সময়' বলিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএ এই তুমি দেখিলে আকাশ খুব পরিষ্কার, কাঞ্চনজঙ্ঘা ধপ্ ধপ্ করিতেছে, তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া রূপার মত চক্ চক্ করিতেছে, কিন্তু ৫।১০ মিনিট পরেই দেখ মেঘ আসিয়া সব ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ অনেকে বেশ পরিষ্কার দিন দেখিয়া খুব সাজ সরঞ্জাম করিয়া সিঞ্চলে 'এভারেষ্ট' দেখিতে যান, কিন্তু সেখানে গিয়া হয়ত দেখেন যে মেঘ আসিয়া সব ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কেহ কেহ ৬।৭ বার সিঞ্চলে 'এভারেষ্ট' দেখিতে গিয়া একবার হয়তএকটু দেখিতে পাইয়াই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। এই প্রকার অনেকেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। একবার আমাদের কয়েকটি বন্ধু সন্দকফু (এখানেও অনেক লোক এভারেষ্ট দেখিতে যান; এ জায়গাটি ফেলুট যাইবার পথে ও দার্জ্জিলিং হইতে ৩৫ মাইল) গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা কিছুই দেখিতে পান নাই, আর লাভের মধ্যে খুব ভিজিয়াছিলেন। আমাদের যে সময়ে ফেলুট যাওয়া স্থির হয় সে সময় যদিও খুব শীত পড়িয়াছিল, কিন্তু আকাশ প্রায়ই পরিষ্কার থাকিত। এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, কেন সেই বন্ধুটি বলিয়াছিলেন "এই সময়ই এভারেষ্ট দেখিবার উপযুক্ত সময়।" আমরা এত নিরুৎসাহ জনক কথা শুনিয়াও কিছুতেই ক্ষান্ত হইলাম না। আস্তে আস্তে যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। তখনও জানিতাম না যে মা আমাকেও লইয়া যাইবেন। একদিন মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাইব কি না। আমি ত আহ্লাদে আট খানা হইয়া বলিলাম "আমি যাইব।" এত হঠাৎ আমার যাওয়া স্থির হওয়াতে আমার কি আহ্লাদ হইয়াছিল পাঠক পাঠিকাগণ, তোমরা বুঝিতে পার।

ফেলুট দার্জ্জিলিং হইতে ৪৮ মাইল ও ৫০০ ফিট উচ্চ। সেখানে যাইতে ৪ দিন লাগে। সেজন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পথের স্থানে স্থানে ডাক বাঙ্গলা করিয়া দিয়াছেন। সেই সকল ডাক বাঙ্গলাতে থাকিতে হইলে পূর্ব্বেই টাকা দিয়া পাস লইতে হয়। আমরাও পাস লইলাম। ফেলুট অনেক উচ্চে ও এভারেষ্টের নিকটে বলিয়া সেখানে অত্যন্ত শীত। প্রচণ্ড শীতের কথা শুনিয়া সঙ্গে যত পারি গরম কাপড় লইলাম। প্রত্যেক যাত্রী এক সপ্তাহের আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে লইলেন, কারণ সেখানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া দূরে থাকুক, একটি খুদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ক্রমে যাইবার দিন স্থির হইল। ৩টী ইংরেজ, একটি এদেশীয়া মহিলা ও দুইটি ভদ্র লোক আমাদের সহযাত্রী হইলেন। আমাদের দলটি বেশ বড় ছিল। নয় জন যাত্রী (তাহার মধ্যে আমার ১১ বৎসর বয়স্ক একটী ভাইও একজন) তাহা ছাড়া ছয়টি ঘোড়া, ২৫ জন সহিস, কুলি ও ডাণ্ডিওয়ালা

ছিল। আমরা ২৩ শে নভেম্বর সকালে ৯ টার সময় শুভযাত্রা করিলাম। এই বৃহৎ দলটী দেখিয়া পাহাড়ীরা তাহাদের ঘর ছাড়িয়া আমাদিগকে দেখিবার জন্য রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। পথের দৃশ্য অতি চমৎকার। আমাদের মধ্যে কেহ হাঁটিয়া কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া গল্প করিতে করিতে বিকালে সাড়ে তিনটার সময় সুখিয়াপুকরী (প্রথম বিশ্রাম করিবার স্থান) পৌছিলাম। পথে কিছু মাত্র কষ্ট হয় নাই। দিন খুব পরিষ্কার ছিল আর রাস্তাও খুব ভাল ছিল।

ক্রমশঃ



বিলাতের গল্প।

কলেজ জীবন।

মনে কর সেই জনের ক্রিকেট খেলার দিন থেকে ৫।৬ বছর চলে গেছে; এখন তার লম্বা দোহারা চেহারা, ঢলঢলে মুখ, ও নাকের নীচে গোঁফের রেখা দেখে তাকে আর সেই ছেলেবেলার মত জনবাবা বোলে ডাকৃতে আমাদের যেন লজ্জা হচ্ছে। আমাদের সেই দশ বছরের স্কুলের ছোকরা এখন আঠার বছরের যুবকে দাঁড়িয়েছেন, আর 'বাবা' অর্থাৎ 'মাষ্টার' জন ছেড়ে 'মিষ্টার' অর্থাৎ জন বাবু নাম পেয়েছেন। এস, পাঠকপাঠিকা, আমরা সেই পরিচিত জন বাবুর হাত ধোরে তাঁর সঙ্গে বিলাতের কলেজ জীবনটা এবারে দেখিব।

স্কুলের পড়া শেষ হ'লে জন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়; তার পিতার ইচ্ছা যে সে অক্সফোর্ডে যায়, কেননা কেম্ব্রিজের চেয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় সকল বিষয়েই অধিক গোঁড়া; সেজন্য সেকেলে লোকদের বড় পছন্দসই। কিন্তু জন বাবু আমাদের আজকালকার ছেলে, উন্নতিশীল বিশ্ববিদ্যালয়টীর প্রতিই তাঁর অধিক টান, কাজেই তিনি পিতাকে নিজের ইচ্ছা জানালেন, পিতাও পুত্রের মনোগত ভাব জেনে তাতে আর কোন বাধা দিলেন না।

এখানে বিলাতের পিতামাতা ও সন্তান সম্বন্ধে গোটা দুই কথা না বোলে থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের মত ইংরেজ বাপমায়েরা অত্যন্ত শিশুকালে ছেলেমেয়েদেরকে খুব তাঁবে রাখেন, তারা কি রকম লোকের কাছে পড়ে, কেমন সঙ্গীর সঙ্গে খেলে, এসব বিষয়ে খুব নজর করেন। কিন্তু ছেলেদের যেই একটু বয়স বেশী হয় ও তারা ভাল মন্দ বিবেচনা কর্‌তে শেখে, অমনি তাঁরা ক্রমে আপনাদের প্রভুত্ব কমাইয়া আনেন ও তাদেরকে নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিতে দেন। ঐরূপ করাতে পিতামাতার প্রতি সন্তানদের ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়ে, কেননা তারা জানে, তাঁরা কখন অযথা শাসন করেন না, আর বাপমায়েরাও পুত্রকন্যা-দেরকে বন্ধুর চোখে দেখেন।

তোমরা হয়ত আমার এই কথা শুনে হেসে ব'ল্‌বে—সে কি রকম! মা বাপ গুরুলোক; ছেলে-মেয়েরা তাঁদের একান্ত অধীন তাঁদের মধ্যে আবার বন্ধুভাব হবে কেমন করে? কিন্তু বাস্তবিক, ইংরেজ পরিবারে পিতামাতা সন্তান সন্ততি এমন কি গুরুশিষ্যের মধ্যেও এই স্নেহময় সৌহার্দ্দ যে কি মনোহর, তা চোখে না দেখিলে সম্পূর্ণরূপে বোঝা ভার। বয়সকালে বিলাতের বালক বালিকারা যে স্বাধীনতা পায়, তারা সে স্বাধীনতার কখনও অপ-

ব্যবহার করে না—ইহাই তাদের মধ্যে ঐ বন্ধুতা ও বিশ্বাসের কারণ। বোধ হয় তোমরা শুনে বা দেখে থাক্‌বে যে, আমাদের দেশে কোন পিতা উপযুক্ত পুত্রের কাছে পরামর্শ চাহিলে বা তাকে একলা চলিতে দিলে, অল্প দিনের মধ্যে সে বাপের ঘাড়ে চোড়ে বসে। বিলাতে কিন্তু সে রকম হবার যো নাই। সেখানে সন্তানেরা যত স্বাধীনতা পায়, তত আত্মনির্ভর শেখে ও পিতামাতার প্রতি বিশ্বাস বাড়ে। সে দেশে ভালমন্দ সব কাজে পুত্রেরা যেমন পিতামাতার উপদেশ লন, তাঁরা তেমনি সন্তানদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ইহাতে উভয়েরই স্নেহ বাড়িয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের জন বাবু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়াছেন। শিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষা করা, উপাধি, ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ করা, আর ছাত্রদের নিয়মে রাখা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কলেজের লোক ছাড়া এখানে একদল অধ্যাপক আছেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ঘরে নানা বিষয়ে 'লেক্‌চার' (উপদেশ) দিয়া থাকেন। সকল কলেজের ছাত্রেরাই উহাতে যোগ দিতে পারে। কেম্ব্রিজে বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্র, ল্যাটিন, গ্রীক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রধান। অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষার জন্য কেম্ব্রিজ জগদ্বিখ্যাত। এই সকল বিষয়ে যে সব ছাত্রেরা উত্তমরূপে জ্ঞান লাভ করে, তারা জলপানী ও পুরস্কার পায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উত্তম পুস্তকশালা, যাদুঘর, উদ্ভিদের বাগান ইত্যাদি অনেক গুলি সাধারণ স্থান আছে। কলেজে যাঁরা ছাত্রদিগকে নিয়মে রাখেন তাঁদেরকে 'প্রক্‌টার' বলে। এঁরা কলেজের দারোগার মত, সকলের উপর চৌকী দেন, আর কোন ছাত্র কোন রকম অন্যায় করিলে তাকে শাস্তি দিয়া থাকেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা হয়, তাদের মধ্যে কোন একটিতে ভাল ক'রে উত্তীর্ণ হলে উপাধি লওয়া যায়। উপাধি গ্রহণের পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে 'প্রিভিয়স' অর্থাৎ পূর্ব্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এই এক্‌জামিনকে সচরাচর লিট্‌ল গো অর্থাৎ 'অল্প যাওয়া' বলে। এখানে দুই রকমের উপাধি গ্রহণ করা যায়,—সামান্য উপাধি ও মান্যের সহিত উপাধি। মান্যের সঙ্গে ডিগ্রি লইবার জন্য পরীক্ষা সামান্য ডিগ্রির পরীক্ষা অপেক্ষা অনেক কঠিন। ইংলণ্ডের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কেম্ব্রিজে মানের উপাধির জন্য যে সকল পরীক্ষা হয়, তাদের 'ট্রাইপস্‌' বলে। কোন প্রকার উপাধির জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বি, এ, ডিগ্রী দেওয়া হয়। বোধ হয় তোমরা জাননা, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্‌ এ উপাধির জন্য আর কোন পরীক্ষা দিতে হয় না; যাঁরা বি এ উপাধি লন তাঁরা ইচ্ছা করিলেই তিন বৎসর পরে বিনা পরীক্ষায় এম্‌ এ পদ পাইতে পারেন।

কেম্ব্রিজে সবশুদ্ধ সতরটা কলেজ আছে। ঐ গুলি ভিন্ন ভিন্ন দানশীল লোকের টাকাতে স্থাপিত হয়েছে। ফি কলেজের এক একটী অধ্যক্ষ আছেন, তাঁকে সবাই 'মাষ্টার' বলে। ইনি আর ফেলো নামে কতকগুলি উপাধিওয়ালা লোক কলেজের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। কলেজের অধ্যক্ষ এই ফেলোদের দ্বারা মনোনীত হয়ে থাকেন। ফেলোরা কলেজের স্থাপকদের দত্ত টাকা হতে বাৎসরিক বৃত্তি পান। ইঁহাদের সংখ্যা সকল কলেজে সমান নয়, কোন-টীতে কেবল সাত আটজন, আর কোনটীতে কুড়ি পঁচিশজনও দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি ফেলো ও ছাত্রদের শিক্ষাদির পর্য্যবেক্ষণ (দেখা শুনা) করেন তাঁহাকে 'টিউটর' (শিক্ষক) বলে। এই টিউটরের

কাছে ছাত্রেরা অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করতে ও জানতে পারে, ইনি কলেজের সকলের উপদেশক ও পরিপালকের মত। যে কেলো ছাত্রদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে খোঁজখবর করেন তাঁকে ডীন (পুরুত) বলে। ইংলণ্ডের প্রায় সব কলেজেই এক একটী গির্জ্জা আছে; সেখানে রোজ উপাসনার সময় সকল ছাত্রেরা উপস্থিত থাকে কি না তার খবর রাখা ঐ পুরুত মহাশয়ের কাজ। ফি কলেজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রফেসর (অধ্যাপক) নিযুক্ত আছেন, তাঁরা ছাত্রদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কলেজের ফেলোরাই ঐ অধ্যাপকের কাজ করেন। প্রতি কলেজের সকলের চেয়ে ভাল ছেলেদিগকে ছাত্রবৃত্তি (স্কলারশিপ) দেওয়া হয়, এই ছাত্রবৃত্তি গুলি মাসে ত্রিশ ৩০৲ টাকা হতে প্রায় দুশ ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

বিলাতের বোর্ডিং স্কুলের মত সব কলেজেই বোর্ডিং ও লজিং (খাওয়া ও বাসা) ব্যবস্থা আছে। সে জন্য ছাত্রেরা কলেজের ভিতরে বা নগরের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট বাসায় থাকিতে বাধ্য হয়। রোজ সকালে বা সন্ধ্যার সময় দিনে একবার কোরে সব ছাত্রদেরই গির্জ্জায় যাবার নিয়ম আছে; আজ কাল কিন্তু অনেক কলেজে ঐ নিয়ম ঢিলা হয়ে এসেছে। বিশেষ কারণ থাকলে, অর্থাৎ ছাত্রেরা খৃষ্টান না হলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোন কোন যুবককে ঐ বিষয়ে নিষ্কৃতি দিয়ে থাকেন। প্রত্যক কলেজে রোজ বেলা ৯ টা থেকে ১২ টা পর্য্যন্ত ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় কলেজের হলের (বড় ঘর) এক দিকে ছাত্রেরা ও অন্যদিকে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বোসে আহার করেন। ভোজনের আরম্ভে ও শেষে এক জন বৃত্তিধারী ছাত্র 'গ্রেস' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসাদ পাঠ করিয়া থাকে। স্কুলের ন্যায় কলেজের সব ছাত্রেরাও বিকালবেলা বাড়ীর বাহিরে গিয়া ব্যায়াম ও নানা প্রকার বলকর ক্রীড়া করে। ইহারা অতি আগ্রহের সঙ্গে দাঁড়বহা, ব্যাট ও গোলা খেলা ইত্যাদিতে রত হয়।

প্রতি কলেজেই তর্ককরা, দাঁড়বহা ও ক্রিকেট খেলা প্রভৃতির নানা প্রকার সমাজ আছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের মিশিবার জন্য একটী মিলন সোসাইটী আছে। উহা ক্লবের মত, ঐখানে সংবাদপত্র পুস্তকাদি পড়িতে পাওয়া যায়। ছাত্রেরা ঐখানে ফি সপ্তাহে সভা ক'রে সে দেশের রাজনীতি, সমাজ ও অন্যান্য দরকারী বিষয়ে তর্কবিতর্ক করে। ঐ সব তর্কে যুবকদের আস্থা ও আগ্রহ দেখিলে ঐ সভাকে একটী ছোট পার্লিয়ামেণ্ট বলিয়া মনে হয়। (বিলাতের ও আমাদের ভারতবর্ষেরও শাসন সম্বন্ধে যে সভায় আইনাদি জারি হয়, তাকে পার্লিয়ামেণ্ট সভা বলে)। ঐ মিলন সমাজ ছাড়া কেম্ব্রিজে সাহিত্য, গান প্রভৃতি উপকারী বিষয়ে জ্ঞানচর্চ্চার জন্য আরও অনেক সমাজ আছে।

বি, এ উপাধি নিতে হলে প্রায় তিন বছর কোন একটী কলেজের ছাত্র থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কেহ কেহ কোন কলেজে না গিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়। ঐরূপ বাহিরের ছাত্রেরা অনেক অল্প খরচে লেখা পড়া করিতে পারে বটে, কিন্তু তারা কলেজ জীবনের সুখে একেবারে বঞ্চিত থাকে। ঐ সব কলেজের পোড়োরা কোন সাধারণ স্থানে যাইবার সময়, অধ্যাপকের লেকচার শুনিবার সময়, গির্জ্জায় যাইবার সময়, কলেজের হলে আহার করিবার ও উপাধি লইবার সময় গাউন ও চেপ্টা টুপি পরে।

বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা পোড়ে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে ঐখানে ডিগ্রী লওয়া

বড় অল্প ব্যয়ের কর্ম্ম নয়। উহাতে পড়িতে হলে মাসে তিন শ টাকা ক'রে খরচ পড়ে; কেহ কেহ উহার চেয়েও বেশী টাকা ব্যয় করে, আবার দু একজন উহার কমেও চালায়। বড় মানুষের ছেলেরাই এখানে অধিক যায়, সেজন্য তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশে চলিতে হলে কিছু বেশী খরচ পড়ে। যাহা হোক অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিলে অনেকগুলি বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রতি কলেজের ৮০।৯০ জন ছাত্র এক বাড়ীতে বাস করে, এক সঙ্গে আহার করে, এক লেকচার শুনে—এই রকম মিশামিশি করাতে সকলের মধ্যে একটা প্রাণের টান জন্মায়। সব ছাত্রেরা পরস্পরের সাহায্য করে ও বিপদ বিভ্রাটের সময় দেখে শুনে। ফি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রকার সমাজ থাকায় ছাত্রেরা একত্র মিলিবার অনেক সুবিধা ও অবসর পায়; তা ছাড়া সকলে এক সঙ্গে ব্যায়াম ও খেলা ক'রে থাকে। আর সকলেই যুবক ও প্রায় এক প্রকার অবস্থার লোক ব'লে উহাদের মধ্যে সহজেই বন্ধুতা জন্মায়, এবং অনেক সময় সেই আলাপ চিরজীবন স্থায়ী হয়। ছাত্রেরা যেন ঐখানে সাংসারিক জীবনের প্রথম পরিচয় পায় ও মানুষ ও মানুষের স্বভাব আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে।

পাঠক পাঠিকা! এখন তোমরা দেখ, আমরা যে আঠার বছরের জন বাবুর হাত ধ'রে কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম, বাইশ তেইশ বছরে সেই যুবক জন ডিগ্রী পাইয়া ও কিরূপ শিক্ষা লাভকরিয়া গৃহে ফিরিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে সে অতি উত্তমরূপে শিক্ষিত হয়েছে, তাছাড়া নিজের যত্নে নানা প্রকার পুস্তক প'ড়ে সে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, আর সকল বিষয়েই সে এরকম অভিজ্ঞ হয়েছে যে, চাই কি সময়ে একদিন হয়ত সে আমাদের ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হ'য়েও আসিতে পারে।



আদর্শ পুরুষ—বুথ।

দীন দুঃখী পতিত ও ঘৃণিত নরনারীদিগের জন্য যাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হয় তাঁহারাই প্রকৃত মহৎ। এ প্রকার লোক সচরাচর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। নিঃসহায় নিরাশ্রয় জনকে আশ্রয় দান করা, দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করা, ঘৃণিত জনকে স্নেহের চক্ষে দেখাই প্রকৃত মহত্ব। আজ যাঁহার জীবনের কথা তোমাদিগকে সংক্ষেপে বলিব, তিনি একজন এই শ্রেণীর মহৎ লোক।

জেনারেল বুথ একজন অসাধারণ লোক। ১৮২৯ সনের ১০ই এপ্রেল ইংলণ্ডের অন্তর্গত নটিংহাম নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে বুথ সাধারণ রকম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য জীবনের বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না, তবে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, তিনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় ধর্ম্ম-ভীরু এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। বুথ খৃষ্ট ধর্ম্মের যে সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, দেখিলেন তাহাতে যেন ধর্ম্মের একটা জীবন্ত ভাব নাই, এই সম্প্রদায়ের প্রার্থনা উপাসনা প্রভৃতিতে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। এই জন্যই তিনি তের

চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময়ে নিজ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া মেথডিষ্ট নামক খৃষ্টধর্ম্মের যে এক সম্প্রদায় আছে তাহাতে প্রবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই বুথের মনে ধর্ম্মভাব খুব প্রবল ছিল, বয়সের সঙ্গে সেই ভাব ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি দেখিলেন, মানুষ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। ধর্ম্মের বাহিরের সমস্ত আড়ম্বর বজায় আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের বড় অভাব। আরও দেখিলেন অসংখ্য নর নারী ধর্ম্ম-বিশ্বাস হীন হইয়া অধর্ম্মের



পথে চলিতেছে, কেহ ইহাদিগের রক্ষার উপায় করিতেছে না, কেহ এই হতভাগ্য নরনারীদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার চিন্তাও করিতেছে না। বরং লোকে ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। বুথ এই সমস্ত দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। লোকের মনে ধর্ম্ম ভাব কমিয়া যাইতেছে, একদিকে ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন, অন্যদিকে, যে সকল অসংখ্য দুঃখী অনাথ লোক ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার অভাবে এবং চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটিতে দিন দিন অধর্ম্মে ডুবিতেছে, তাহাদিগের কথা চিন্তা করিয়া অধিকতর ব্যথিত হইলেন। এই সকল নরনারীদিগের জন্য মহাত্মা বুথের হৃদয়

অতিশয় ব্যথিত হইল। তিনি ইহাদিগের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময় তিনি সংকটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন। ঈশ্বর কৃপায় এই ব্যাধিতে তাঁহার মহৎ জীবনের অকালে অবসান হয় নাই। মহাত্মা বুথ ব্যাধিমুক্ত হইয়া আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। দুঃখীজনের জন্য তাঁর প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময় হইতে প্রতিদিন বৈকালে ধর্ম্ম ও নীতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং রাত্রিকালে গরীব দুঃখী অসহায় নিরাশ্রয়দিগকে লইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। মেথডিষ্টগণ তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারক নিযুক্ত না করাতে বুথ ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে মেথডিষ্টগণ তাঁহাকে দলে থাকিতে দিলেন না। বুথ বাধ্য হইয়া মেথডিষ্ট সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক মেথডিষ্ট দল পরিত্যাগ করিয়া আসিল। তিনি ইহাদিগের ধর্ম্ম যাজক হইলেন। মেথডিষ্টগণ অল্পদিন পরেই পুনরায় বুথকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন ও তাঁহাদের ধর্ম্ম যাজকের পদে নিযুক্ত করিলেন। মহাত্মা বুথ অদম্য উৎসাহের সহিত সমস্ত ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম-উপদেশ ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। শত শত দীন দুঃখী তাঁহার উপদেশে এবং তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে মহাত্মা বুথ বিবাহ করেন। বিবাহে বুথের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের কোন বিঘ্নই হয় নাই; বরং আরও উৎসাহের সহিত তিনি কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন। মহাত্মা বুথ স্ত্রীর পরামর্শেই মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজে দেশময় ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহাত্মা বুথ বাল্যকাল হইতেই দরিদ্র—অর্থ সঙ্গতি কিছুই ছিল না। এই সময় তাঁহার চারিটি সন্তান জন্মিয়াছে। কি উপায়ে ইহাদিগকে মানুষ করিবেন, কি উপায়ে সংসার চলিবে সে চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে উঠিল না।

(ক্রমশঃ)



আগামী বারের সখাতে ইংলণ্ডের একখানি রাজপরিবারের বিলাতি (ওলিওগ্রাফ) রঙ্গিন চিত্র থাকিবে। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া আমরা এই চিত্রখানি সংগ্রহ করিয়াছি। ছবিখানি অতিশয় সুন্দর হইয়াছে, সখার গ্রাহকগণ ছবিখানি বাঁধাইয়া ঘরে রাখিলে, ঘরের বিশেষ শোভা হইবে।





এপ্রেল, ১৮৯২।



বিবিধ।

আল্‌কাতরা জিনিষটা অতি কদর্য্য না? যেমন বিশ্রী দেখিতে তেমনি দুর্গন্ধ,—যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। আল্‌কাতরা হইতে অনেক অতি আবশ্যক পদার্থ পাওয়া যায়। আল্‌কাতরা রিটর্টে উত্তপ্ত করিলে বেনজন নামক এক প্রকার তেলের ন্যায় পদার্থ পাওয়া যায়। ইহা অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে, এবং ইহা হইতে কৃত্রিম গ্যাস প্রস্তুত করা যায়। আল্‌কাতরা হইতে কারবলিক অয়েল হয়। প্যারাফিন নামক একটী পদার্থ পাওয়া যায় তাহা দ্বারা বাতি প্রস্তুত হয়। প্যারাফিনের বাতি তোমরা দেখিয়া থাকিবে। আবার সাকেরিন নামক একটী অতি মিষ্ট দ্রব্য ইহা হইতে পাওয়া যায়, ইহা চিনি অপেক্ষাও মিষ্ট। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে চিনি অপকারী, এই জন্য ডাক্তারেরা চিনির পরিবর্ত্তে সাকেরিন ব্যবস্থা করেন, রোগের পক্ষেও ইহা উপকারী। ইহা ভিন্ন আল্‌কাতরা হইতে আরও নানা প্রকার অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায়। সুতরাং বিশ্রী জিনিষ দেখিলেই ঘৃণা করিও না—বাহিরে কুরূপ হইলেও ভিতরে গুণ থাকিতে পারে।

*
* *

সাপের পাখাও নাই—উড়িতেও পারে না, ইহাই আমরা জানি। কিন্তু ড্রাগন নামক সর্প জাতীয় এক প্রকার জীব ছিল যাহারা পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িতে পারিত। আগামী বারে এই ড্রাগনের ছবি এবং ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

*
* *

প্রাণিতত্ত্বে স্তন্যপায়ী; এবং পক্ষী বা সরিসৃপ জাতিদিগের মধ্যে এক প্রধান বিভিন্নতা এই দেখা যায় যে, স্তন্যপায়ীদিগের জীবন্ত শাবক জন্মে, কিন্তু পক্ষী বা সরিসৃপদিগের তাহা জন্মে না; তাহারা ডিম প্রসব করে। কিন্তু কিছুদিন হইল অষ্ট্রেলিয়া দেশে একপ্রকার জীব পাওয়া গিয়াছে, ইহারা স্তন্যপায়ী বটে, কিন্তু ইহারা শাবকের পরিবর্ত্তে ডিম প্রসব করে। পরে ইহারও বিস্তৃত বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

* *
*

পৃথিবীতে ৩০৬৪টী ভাষা আছে, এবং ১০০০ একহাজারেরও বেশী ধর্ম্ম আছে। পুরুষ ও স্ত্রী-লোকের সংখ্যা গড়ে প্রায় একই। গড়ে মানুষ ৩৩ বৎসর বাঁচে। একহাজার লোকের মধ্যে একজন মাত্র একশত বৎসর বাঁচে, প্রত্যেক এক-শতজন লোকের মধ্যে ছয়জন পঁয়ষট্টী বৎসর বাঁচে, প্রত্যেক ছয়শত জনের মধ্যে একজন আশি বৎসর বাঁচে। পৃথিবীতে কম বেশী ১০০০,০০০,০০০, লোক আছে; ইহার মধ্যে ৩৩,০৩৩,০৩৩ জন প্রতি বৎসর মরে, ৯১,৮২৪ জন প্রতি দিন মরে, ৩৭৩০ জন প্রতি ঘণ্টায় মরে, এবং ৬২১ জন প্রতি মিনিটে মরে। দিন অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক লোক মরে এবং জন্মে।

*
* *

হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস বি, এ (কেম্ব্রিজ) বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাতে লণ্ডন ইউনিভারসিটী, রেন ও গার্ণীর সিভিল সারভিস ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌ প্রভৃতি স্থানে বিশেষ দক্ষতা এবং প্রশংসার সহিত অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া আজ অনধিক এক বৎসর কাল এদেশে আসিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি এই কলিকাতা সহরে নূতন ধরণে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে এখান হইতে বালকেরা ছয় বৎসরে এণ্ট্রান্স পাস হইতে পারিবে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যাহা নয় বৎসরে শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানে তাহা ছয় বৎসরে সম্পন্ন হয়; তিনটী বৎসর লাভ বড় সাধারণ নহে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস নিজে বিদ্যালয়ের সমস্ত তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়াছেন এবং কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উপযুক্ত শিক্ষক লইয়া নূতন ধরণে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় স্থানান্তরে বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাইবে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি কামনা করি।

*
* *

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে এই সংখ্যার সখায় আমরা যে ওলিওগ্রাফ ছবি দিব লিখিয়াছিলাম, ঘটনাবশতঃ তাহা দিতে পারিলাম না। যে ছবি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে সখার সমস্ত গ্রাহকের কুলাইবে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া এবার স্থগিত রাখিতে হইল। ছবি যতগুলি কম পড়িয়াছে, পূনরায় বিলাত হইতে তাহা আমাদিগকে আনাইতে হইবে, আশা করি গ্রাহকগণ এই বিলম্বের জন্য বিরক্ত হইবেন না।

*
* *

অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড নগরে টুহুমা চিকিৎসালয় ডাক্তার হাণ্ট ষ্ট্রীক্‌নিয়া অর্থাৎ কুচিলার সার শরীর মধ্যে পিচ্‌কারীর দ্বারা প্রবেশ করাইয়া সর্প-বিষে মৃতপ্রায় রোগীকে বাঁচাইয়াছেন, ষ্ট্রীক্‌নিয়া অর্থাৎ কুচিলাসারও একটী ভয়ানক বিষ; কিন্তু ডাক্তার হাণ্ট দুইটী মৃতপ্রায় রোগীকে ইহাদ্বারা বাঁচাইয়াছেন।

*
* *

অদ্ভুত চিত্রকর—ডুকণে।



ফরাসীদেশে লাইল নগরীতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী একজন দরিদ্র চর্ম্মকারের ক্ষুদ্র গৃহে একটী শিশুর জন্ম হয়। পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে এ সংবাদে চর্ম্মকারের আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু অচিরেই সে আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল! চর্ম্মকার আগ্রহে, সূতিকাগৃহে

যাইয়া দেখিল একটী হস্ত-শূন্য বিকৃত-পদ সন্তান জন্মিয়াছে!

পিতা বিষণ্ণ হইল বটে কিন্তু মার প্রাণ ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিত জানে না,—মা সেই কদাকার বিকৃত দেহ শিশুকে স্নেহভরে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন! শিশু বাড়িতে লাগিল। বয়সের সঙ্গে পিতামাতার মনে নানা চিন্তা, নানা দুর্ভাবনা উঠিতে লাগিল। এ হতভাগ্য শিশুর উপায় কি হইবে? তাহারা অতি দরিদ্র ছিল, কেমন করিয়া এ শিশুকে বাঁচাইবে, এই চিন্তায় দিন দিন তাহারা বিষণ্ণ হইতে লাগিল। এ শিশু যে কেবল হস্ত-শূন্য ছিল তাহা নহে, ইহার পা দুখানিরও গঠন বিকৃত ছিল; এবং এক একখানি পায়ে চারিটী মাত্র অঙ্গুলি ছিল।

সিজার দুকর্ণে এই সম্বল লইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছিলেন। কে মনে করিয়াছিল হস্ত-শূন্য বিকৃত-পদ একটী অসহায় শিশু অধ্যবসায়, যত্ন ও চেষ্টার বলে জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে? কে বুঝিয়াছিল যে যাহাকে তুলিকা ধরিবার জন্য বিধাতা হস্ত দেন নাই, সেই হস্ত-শূন্য শিশুর চিত্রিত চিত্রপটে জগতের লোক বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবে? কে মনে করিয়াছিল এই হস্ত-শূন্য শিশু তুলিকায় কালের পটে নিজ নাম অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া যাইবে?

সন্তান যতই কেন কদাকার কুৎসিত হউক না, পিতামাতার নিকট সে সদাই সুন্দর। আবার পাঁচটী ছেলের মধ্যে একটী ছেলে যদি রোগা বা বিকৃত বা অন্য কোন অংশে হীন হয়, তবে পিতামাতার সেই ছেলেটীর প্রতি স্নেহ আদর ও যত্ন বেশী হয়। দুকর্ণে হস্ত-হীন, বিকৃত-পদ ছিলেন বলিয়া পিতামাতা তাহাকে খুব বেশী যত্ন আদর ও স্নেহ করিতেন। পিতামাতার স্নেহ ও যত্নে দুকর্ণে দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন, তাঁহার ভবিষ্যতের চিন্তাও পিতামাতার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অনেক দরিদ্র লোক এ প্রকার সন্তান জন্মিলে হয় তাহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাইয়া তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, নতুবা দেশ বিদেশে দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু দুকর্ণের পিতা দরিদ্র হইলেও অতিশয় সাধু ছিলেন; সন্তানকে ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া বা তাহাকে দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা তিনি অতিশয় হীন কার্য্য মনে করিলেন। কিন্তু কি উপায়ে ইহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে সে চিন্তাও বড় বেশী হইয়া উঠিল।

দুকর্ণের জীবন অদ্ভুত ঘটনা পরিপূর্ণ। সৃষ্টিকর্ত্তা দুকর্ণকে হস্ত-শূন্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক অদ্ভুত শক্তি তাহাকে দিয়াছিলেন। দুকর্ণে ক্রমে বড় হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাহার এক আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে দুকর্ণের সমবয়সীরা হাতের দ্বারা যে কাজ করে, সে তাহার সেই বিকৃত গঠিত পায়ের দ্বারা অনায়াসে সেই সমস্ত কাজ করিতে পারে। সে তাহার সেই পায়ের দ্বারা বল ছুড়িয়া খেলার সাথীদের সহিত খেলা করে, কিছু কাটিবার আবশ্যক হইলে ছুরী দিয়া অনায়াসে তাহা কাটে, খড়ি লইয়া ঘরের মেজেতে কত কি আঁকে, কাঁচি লইয়া কাগজে ছবি কাটে, এক কথায় ছেলেরা হাতের দ্বারা যাহা কিছু করিয়া থাকে, সে পায়ের দ্বারা সে সমস্তই করিতে পারে। একদিন দেখা গেল দুকর্ণে একখানা কাগজে বড় বড় করিয়া কতকগুলি অক্ষর লিখিয়া রাখিয়াছে। সেই দিন হইতে দুকর্ণের যশ এবং উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল। ডুমোঁসেল নামক একজন গুরুমহাশয় এই হস্ত-হীন বিকৃত-পদ বালকের এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া ইহাকে বিনাব্যয়ে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ইহার পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন, দুকর্ণের

পিতা স্বীকৃত হইল, ডুমোঁসেল তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এক বৎসর মধ্যেই ডুকর্ণে সমস্ত ছাত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লিখিতে সমর্থ হইল। কিন্তু এইখানেই ইহার অসাধারণ শক্তির শেষ হয় নাই। ডুমোঁসেল দেখিলেন ডুকর্ণের হস্তলিপি-পুস্তক পত্রে পত্রে নানা প্রকার ছবি ও চিত্রে পরিপূর্ণ, এই সমস্ত ছবি ও চিত্র বালকের হাতের চিত্রের ন্যায় নহে শিক্ষিত লোকের হাতের চিত্রের ন্যায় বাস্তবিকই অতিশয় সুন্দর সুন্দর চিত্র। ডুমোঁসেল ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন; এবং লাইল নগরীর শিল্প বিদ্যালয়ের সেই সময়ের অধ্যাপক ওয়াটোকে ঐ সকল চিত্র দেখিলেন। ডুকর্ণের উন্নতির পথ আরও পরিষ্কৃত হইল; ওয়াটো ডুকর্ণকে শিল্প বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা বিনাব্যয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভর্ত্তি করিয়া লইলেন।

বিদ্যালয়ে ডুকর্ণের লুক্কায়িত শক্তি দিন দিন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রতি বৎসরই তিনি চিত্রবিদ্যায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। অবশেষে বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী মেডাল পাইলেন; এই মেডাল অতি সম্মানের জিনিষ ছিল এবং সহজে ইহা কাহারও ভাগ্যে ঘটিত না।

এই সময়ে দিমেলি নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ডুকর্ণেকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। তিনি ডুকর্ণেকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে সে আরও উন্নতি করিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। একদিন ডুকর্ণে লাইলের মিউজিয়মে একখানি বিখ্যাত চিত্র সংশোধন করিতেছিলেন, এমন সময় ডিউক অব্ এন্‌জোলেম সেখানে উপস্থিত হন। ডিউক এই হস্ত-হীন অদ্ভুত চিত্রকরকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হন, তিনি আরও দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে ডুকর্ণে একটি অতিশয় কঠিন চিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। ডিউক ডুকর্ণের এই অসাধারণ ক্ষমতার পুরস্কার করিলেন, রাজকোষ হইতে তাহাকে বারশত ফ্রাঙ্ক বৎসর পেনসন মঞ্জুর করিলেন। এই অর্থসাহায্য পাইয়া ডুকর্ণে রয়েল একাডেমিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে প্রবেশ করিয়া ছয় মাসের পরেই ডুকর্ণে তৃতীয় মেডাল পুরস্কার পান, পরবৎসর দ্বিতীয় মেডাল লাভ করেন এবং তার পর বৎসর চিত্র বিদ্যা সম্বন্ধে রোমনগরের বিখ্যাত পুরস্কার লাভের জন্য পরীক্ষায় উপস্থিত হন।

এই সময়ে ডিউক অব এন্‌জোলেম-প্রদত্ত বৃত্তি হঠাৎ বন্ধ হয়, ডুকর্ণে ইহাতে একটু কষ্টে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হন নাই। বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি লুভরের প্রত্যেক চিত্রপ্রদর্শনীতেই পুরস্কার ও মেডাল পাইতে লাগিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মেডাল, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেডাল লাভ করেন। অবশেষে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টের একখানি চিত্র চিত্রিত করিয়া এক স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। এবং ইহাতেই তিনি অদ্বিতীয় চিত্রকর বলিয়া পরিচিত হইলেন।

ডুকর্ণের জীবনী শেষ হইয়া আসিল। লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর কোন দিনই বড় সদ্ভাব নাই। ডুকর্ণে চিত্র-বিদ্যায় অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি চিরদিনই দরিদ্র ছিলেন। অকস্মাৎ একদিন তাঁহার এই অসাধারণ শক্তি সহসা লুপ্ত হইল—তাঁহার চিত্রতুলিকা পদস্খলিত হইল, তাঁহার একমাত্র সম্বল পা দুখানি পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া গেল! এই অবস্থায় ডুকর্ণে অধিক দিন জীবিত

ছিলেন না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল ডুকর্ণের অদ্ভুত জীবনী শেষ হইয়া গেল।

ডুকর্ণের জীবনী আমাদিগের নিকট স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়। বেশী দিন হয় নাই, আজ ছত্রিশ বৎসর মাত্র ডুকর্ণের মৃত্যু হইয়াছে, এখনও লাইল নগরে ডুকর্ণের স্মৃতি উজ্জ্বল রহিয়াছে। আমরা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া কিছুই করিতে পারি না, আর হস্ত-হীন বিকৃত-পদ অসহায় ডুকর্ণে কি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কালের পটে নিজ নাম অক্ষয় তুলিকায় লিখিয়া গিয়াছেন—কখনও লোকে তাহা বিস্মৃত হইবে না!



বড় ভালবাসি।

১

বড় ভালবাসি আমি সোণামুখী ঊষা,
মুখখানি হাসিভরা
ফুল মালা গলে পরা,
আঁচলে আঁচলে দোলে মুকুতার ভূষা,
বড় ভাল বাসি আমি সোণামুখী ঊষা।

২

বড় ভালবাসি আমি পাপিয়ার গান
কোথায় লুকিয়ে রয়,
"চোক গেল" শুধু কয়,
মধুর মধুর স্বরে ভুলায় পরাণ!
বড় ভাল বাসি আমি পাপিয়ার গান।

৩

বড় ভালবাসি আমি সুনীল সন্ধ্যায়,
ফুল ফোটে, তারা ভাসে,
জোনাকী মৃদুল হাসে,
আদরে সে ডাকে "তোরা ঘুমাবি তো আয়।"
বড় ভালবাসি আমি সুনীল সন্ধ্যায়।

৪

বড় ভালবাসি আমি বসন্ত-বাতাস,
অমৃত ঢালিয়া গায়
দিগন্তে চলিয়া যায়,
কেমন আনন্দ আহা কেমন উল্লাস!
বড় ভালবাসি আমি বসন্ত-বাতাস।

৫

বড় ভালবাসি আমি বরিষার জল,
"ঝম্ ঝম্ টুপ্ টুপ্"
ধারা পড়ে কত রূপ,
দেখিলে জানালা দিয়ে, পুলকে বিভল!
বড় ভালবাসি আমি বরিষার জল।

৬

বড় ভালবাসি আমি শরত-চাঁদিমা
নিরমল জ্যোছনার
তুলনা মিলে না আর,
ছড়ায় জগৎ ভরি কত মধুরিমা!
বড় ভালবাসি আমি শরত-চাঁদিমা।

৭

বড় ভালবাসি আমি বিশাল জলধি,
সীমাশূন্য রেখাশূন্য,
জলে জলে সবি পূর্ণ,
চেয়ে চেয়ে চেয়ে চেয়ে পাই না অবধি,
বড় ভালবাসি আমি বিশাল জলধি।

৮

বড় ভাল বাসি আমি উন্নত ভূধর,
কে যেন বিরাট বীর
করে আছে উঁচু শির,
কটি-তলে মেঘ চলে মরি কি সুন্দর!
বড় ভালবাসি আমি উন্নত ভূধর।

৯

স্বভাবের শোভা আমি বড় ভালবাসি,
শ্যামল শস্যের ঘটা,
বনের নীরব ছটা,
যা' দেখি, পোরেনা সাধ পরাণ-পিপাসী!
স্বভাবের শোভা আমি বড় ভালবাসি।

১০

আরো ভালবাসি আমি ছোট ভাই বোন,
লেখে পড়ে এক মনে,
মা' বাপের কথা শোনে,
"সখা" গুলি পড়ে কত করিয়া যতন,
বড় ভালবাসি আমি ছোট ভাই বোন।

১১

আর এ সুন্দর বিশ্ব গড়েছে যে জন,
জীবনের সাধ আশা,
মা' বাপের ভালবাসা,
দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রীতি যাঁর বিতরণ;
যে দেবতা দয়াসিন্ধু
জীবনে মরণে বন্ধু,
যাঁর মত কেহ নাই "আপনার জন"
সব চেয়ে ভাল বাসি তাঁর শ্রীচরণ।



অদ্ভুত সৃষ্টি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সকল ঘটনা অনবরত আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘটিতেছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে গেলে আমাদের মনকে সেইরূপ ভাবে প্রস্তুত করা চাই। মনে কর তুমি রাস্তা দিয়া বেড়াইতেছ, দূরে অশ্বের পদ শব্দ শুনিতে পাইলে, শব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল কিছু পরেই একটি বিবি ঘোড়ায় চড়িয়া বেগে তোমার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন ও তৎসময়েই মনোহর গন্ধ তোমার নাসিকায় প্রবেশ করিল ও এক খণ্ড মৃত্তিকা তোমার গায়ে আসিয়া লাগিল। এক্ষণ ভাবিয়া দেখ তোমার কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কি জ্ঞান লাভ হইল। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিলে, চক্ষু দ্বারা অশ্বারোহী বিবিকে দেখিলে, নাসিকা দ্বারা বিবির গায়ে যে সুগন্ধি দ্রব্য মাখা ছিল তাহার ঘ্রাণ পাইলে এবং অশ্বের পদাঘাৎ দ্বারা যে মৃত্তিকা খণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিলে। অশ্ব, বিবি, শব্দ, গন্ধ, ইত্যাদি যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অর্থাৎ যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাকেই পদার্থ বলা যায়। এই সকল পদার্থকে আমাদের জ্ঞানের কারণ বলা যায়। পূর্ব্বে যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে ঘোড়া দৌড়িয়াছে বলিয়া তুমি শব্দ শুনিয়াছ; যতক্ষণ বিবি তোমার চক্ষুর সম্মুখে না আসিয়াছিলেন ততক্ষণ বিবির প্রতিরূপ তোমার চক্ষে প্রবেশ করে নাই সুতরাং বিবি তোমার চক্ষের সম্মুখে আসাতেই তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলে।

কোন একটি ঘটনা ঘটিল তাহা জানিতে পারাকেই ঐ ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা

কহে। মনে কর তুমি পড়িতেছ এমন সময় পাশের বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড শব্দ হইল ও একজন লোক কাতর স্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। লোকটি কেন চেঁচাইতেছে? কারণ সে ছাত চাপা পড়িয়া আহত হইয়াছে; ছাতটি তাহার উপর পড়িল কেন? বাড়ীতে আগুণ লাগিয়া কড়ী বরগা পুড়িয়া গিয়াছিল; কেমন করিয়া আগুণ লাগিল, কে আগুণ দিল, কেন সে ব্যক্তি আগুণ দিল, ক্রমে এই প্রকার বহু প্রশ্ন উত্থিত হয়।

ইহার দ্বারা দেখা যায় যে একটি ঘটনার কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঐ কারণের কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে ইচ্ছা হয়, এই প্রকারে অনেক দূর অনুসন্ধান করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনার মূল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক ঘটনার মূল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা অদ্যাপী মনুষ্যের হয় নাই কারণ মনুষ্যে জ্ঞান অতি অল্পদূর মাত্র গিয়াছে। যে সকল ঘটনার কারণ যতদূর অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহা তত অধিকতর বুঝা গিয়াছে বলিতে হইবে।

কোন দ্রব্য নিয়ত যে কার্য্য সংঘটন করে বা নিয়ত যে ফল উৎপন্ন করে তাহাকে তাহার গুণ বা শক্তি কহে। যথা ফুলের সুগন্ধ তাহার গুণ কারণ ফুল নাসিকার নিকট নিলেই তদ্রূপ প্রীতিকর জ্ঞানের উদয় হইবে। বাতাসে একটু তুলা ছাড়িয়া দিলেই তাহা উড়াইয়া নিয়া যাইবে। সুতরাং বাতাসের তুলা উড়াইবার শক্তি আছে বলা যায়।

আমরা যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই তাহা সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—১ প্রাকৃতিক বা ভৌতিক ২ শিল্পজাত অর্থাৎ মনুষ্য গঠিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মনুষ্য গঠিত দ্রব্য সকল প্রাকৃতিক দ্রব্যের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। মনুষ্য মৃত্তিকা, কিম্বা লৌহ কিম্বা বৃক্ষ সৃষ্টি করিতে পারে না, বৃক্ষ মৃত্তিকা, লৌহ, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দ্রব্য কিন্তু মনুষ্য ঐ দ্রব্য দ্বারা কলস দা কুড়ালী টেবিল চেয়ার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু কুম্ভকার মৃত্তিকার গুণ না জানিলে দা.. গড়াইতে পারিত না। সুতরাং মনুষ্যের প্রয়োজন সাধনোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত জন্য প্রাকৃতিক পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে জানা আবশ্যক। মনুষ্য অধ্যবসায় সহকারে বহুকাল অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি প্রাকৃতিক দ্রব্যের গুণ ও শক্তির বিষয় অবগত হইয়া ঐ সকল দ্রব্য স্বীয় বিবিধ ব্যবহারে প্রয়োগ করিতেছে। লৌহের দ্বারা সূক্ষ্ম ছুঁচ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়ী প্রস্তুত হইতেছে; মৃত্তিকা দ্বারা হাঁড়ী কলসী প্রস্তুত হইতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি প্রধান ভৌতিক পদার্থ আছে যাহার সম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। আমি ইচ্ছা করিলে খানিকটা জল একটা লোহার পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহা জ্বাল দিয়া বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা রেলের গাড়ী চালাইতে পারি, কিন্তু আমি শত সহস্রবার ইচ্ছা করিলেও সূর্য্যাস্তর সময় হইলে তাহাকে এক মুহূর্ত্তের... জন্যও ধরিয়া রাখিতে পারি না। চন্দ্র নক্ষত্রের গতি রোধ বা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। একদিন বেশ পরিষ্কার রহিল পর দিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইল, আমার ইচ্ছায় ইহার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। গ্রীষ্ম পড়িয়াছে আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও এইক্ষণ শীতের আবির্ভাব করাইতে পারি না।

প্রাচীনকাল হইতে যাঁহারা প্রাকৃতিক ঘটনা সকল পর্য্যালোচনা করিতেছেন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে কতকগুলি ঘটনা নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা অনুসারে ঘটিয়া থাকে। এবং আর কতক গুলির মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ আছে যে একটি ঘটিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি ঘটিয়া

থাকে। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হয় এবং পশ্চিমে অস্তে যায়, নির্দ্দিষ্ট কাল ব্যবধানে যথা ক্রমে চন্দ্রমার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। জল ঢালিয়া দিলেই নীচের দিকে যায়, আগুণে হাত দিলেই পোড়ে, বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, এই বৃক্ষে আবার বীজ জন্মে, ঐ বীজ হইতে পুনরায় সেই বৃক্ষ জন্মে। এই সকল দেখিয়া লোকে স্থির করিয়াছে যে, কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা অনুসারে প্রাকৃতিক ঘটনা সকল ঘটিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের কারণ নির্দ্দিষ্ট না হইতে পারিত তাহা দৈবাৎ হইয়াছে বলা হইত, কিন্তু এক্ষণ আর কেহ দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। আমরা দৈব ঘটনার কথা যাহা বলি তদ্দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ হইয়াছি।

যখন আমরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই যে, একটি কারণ হইতে একটি কার্য্য নিয়ত উৎপন্ন হয়—যেমন আগুণে হাত দিলেই পোড়ে। অথবা যখন দেখি যে একটি ঘটনা পর্য্যায় ক্রমে ঘটিতেছে, যেমন প্রত্যহই প্রাতে আমার বাটীর পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য উদয় হইতেছে, তখন আমরা ঐ শৃঙ্খলাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া অভিহিত করি।

সকল ঘটনাই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলামতে ঘটিয়া থাকে; দৈবাৎ কিছুই ঘটে না। আমাদের প্রয়োজন সাধন অর্থাৎ আমাদের জীবন, মরণ, সুখ, স্বচ্ছন্দ সকলই এই শৃঙ্খলার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদের উপরে আকাশ, চতুষ্পার্শ্বে বায়ু, পদ তলে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ও বিস্তীর্ণ জল রাশি, এবং স্থাবর জঙ্গম প্রাণী সকলেরই কিছু কিছু বিবরণ ক্রমে আমরা বিবৃত করিব।

(ক্রমশঃ)



কিষণজীর উইল।

সে আজ প্রায় দশ বার বৎসরের কথা। আমরা একবার পূজার ছুটীতে পশ্চিমে বেড়াইতে যাই। অযোধ্যায় আমাদের জন্য একটী বাড়ী পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ সাত আট জন যাই, আমিই তাহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলাম, কাজেই আমার উল্লাস সকলের অপেক্ষা বেশী। জিনিষ পত্র "লগেজ" প্রভৃতি বাঁধা হইল, আমরা মেল গাড়িতে হাওড়া ছাড়িলাম। মেল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল; বার বার নিষেধ সত্বেও আমি গাড়ীর জানালার কাছে বসিয়া রহিলাম; কিন্তু তখন বয়স অল্প, তিন চারিটী ষ্টেসন যাইতে না যাইতে আমার দেখার সাধ মিটিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। পর দিন যখন চক্ষু মেলিলাম, তখন দেখি গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে, এখন আর বাঙ্গালার সে সমতল শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র নাই—গাড়ী এখন পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া চলিয়াছে। এই নূতন দৃশ্য আমার চক্ষে বড়ই ভাল লাগিল, আমি সাধ মিটাইয়া চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। পথে আমাদের আর কোন স্থানে নামিবার কথা ছিল না; কাজেই একেবারে মোগলসরাই গিয়া আমরা নামিলাম। গঙ্গা পার হইয়া আমরা কাশী গিয়া তিন চারি দিন ছিলাম,

তার পর অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গাড়ীতে অযোধ্যা যাত্রা করিলাম। যথা সময়ে আমরা অযোধ্যাঘাট ষ্টেশনে পৌছিলাম। অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে অযোধ্যা নগরী কিছু দূর, অযোধ্যাঘাট ষ্টেশন হইতে অপেক্ষাকৃত নিকট, সুতরাং অযোধ্যা যাত্রীরা প্রায় সকলেই অযোধ্যাঘাট ষ্টেশনে নামিয়া অযোধ্যা যাইয়া থাকেন, আমরাও তাহাই করিয়া ছিলাম।

২

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের জন্য একটী বাড়ী নির্দ্দিষ্ট ছিল, ষ্টেশনে লোকও ছিল, ষ্টেশনে পৌছিয়াই জিনিষ পত্র লইয়া আমরা সেই বাড়ী উদ্দেশে চলিলাম। যাত্রাগানে অযোধ্যার অনেক কীর্ত্তি, অনেক কথা, সকলেই শুনিয়াছ—আমরাও শুনিয়াছিলাম; অযোধ্যায় পৌছিয়া আমার সেই সমস্ত মনে উঠিতে লাগিল। বয়স অল্প ছিল বলিয়াই হউক, বা যে কারণেই হউক একটী জিনিষ দেখিবার জন্য কৌতূহলটা আমার কিছু বেশী হইয়াছিল। কৌতুহল অল্পকাল মধ্যেই মিটিল—কিছু দূর গিয়াই হনুমানজীর দর্শন পাইলাম। দেখিয়াইত প্রথমে আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল, কিন্তু শুনিলাম ইহাঁরা বড় কাহাকেও কিছু বলে না, কাজেই ভয়টা শেষে বড় আর ছিল না। দেখিতে দেখিতে আমরা সেই নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটি দ্বিতল, খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়। বাড়ীটীর চারিদিকে বেশ একটী বাগান, নানা প্রকার ফল ফুল তাহাতে জন্মিয়া থাকে। স্থানটীও খুব নির্জ্জন, সরযূতীর হইতে একটু দূরে। সরযূ-তীরে যে সমস্ত বাড়ী পাওয়া যায়, সে গুলিতে তীর্থ যাত্রীদের জন্য প্রায়ই বড় ভিঁড় থাকে, এবং অনেক সময় বড় অপরিষ্কার থাকে। এই জন্য আমাদের বাড়ী একটু ফাঁকা যায়গায় লওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক বাড়ীটী আমার কাছে ভালই বোধ হইল।

৩

আমরা বেশ আছি, সকালে ও বিকালে রোজই বেড়াইতে যাই; লছমন নামে এক হিন্দুস্থানী বালক আমার ভৃত্য এবং খেলারও সাথী, সে সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সে আমার অপেক্ষা দু এক বৎসরের বড়, এবং বড় প্রভুভক্ত। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই অযোধ্যায় যাহা যাহা দেখিবার আছে, আমরা দেখিয়া ফেলিলাম। দশরথের বাড়ী, রামচন্দ্রের বাড়ী, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির জন্মস্থান, তাঁহাদের রাজ দরবার, এমন কি সীতাদেবীর রান্নাঘর, তিনি যে শীল নোড়ায় বাঁট্‌না বাঁটিতেন তাহা পর্য্যন্ত দেখিলাম। অন্যান্য তীর্থস্থান অপেক্ষা অযোধ্যা কিছু নির্জ্জন ও নিরিবিলি, কারণ অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানে তত তীর্থ যাত্রীর ভিড় হয় না। তবে এখানেও একটী স্থানে খুব ভিড়, খুব ধুমধাম। রামচন্দ্রের অনুচর হনুমানজীর বাড়ীতে সন্ধ্যার পর খুব ধুমধাম ও সমারোহ হইয়া থাকে। হনুমানগড় একটী ছোট পাহাড়ের উপর স্থাপিত। এই গড়ের মধ্যে হনুমানের এক মন্দির আছে; মন্দির মধ্যে হনুমানজীর এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। প্রতি দিন সন্ধ্যার পর এই মন্দিরে হনুমানজীর আরতী হয় এবং হনুমানজীকে ভোগ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে খুব কীর্ত্তনও হইয়া থাকে। আমরা একদিন সন্ধ্যার সময় হনুমানজীর মন্দিরে গিয়াছিলাম, ভোগের আয়োজন দেখিয়া সত্য সত্যই আমার ভয় হইয়াছিল। সে কথা যাক। রোজই সকালে ও বিকালে বেড়াই, আর দিনের বেলা বাড়ীতে থাকি। দেখিবার স্থানগুলি একবারের স্থানে পাঁচবার দেখা হইল, ক্রমে পুরাতন হইয়া

আসিল, সুতরাং বালকের চঞ্চল মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু জানিতাম আমার ইচ্ছা অনুসারে বাড়ী ফেরা হইবে না, কাজেই আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না। দিন যেমন যায়, তেমনই যাইতে লাগিল।

৪

একদিন বাড়ীর সম্মুখের বারাণ্ডায় আমরা এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছি, অনুচর লছমন আমার সঙ্গে, বাড়ীতে তখন আর কেহ নাই। এমনি সময় রোজই বাড়ীর সকলে সরযূতে স্নান করিতে যাইতেন ; বাড়ীতে থাকিতাম মাত্র আমি ও আমার অনুচর এবং বাড়ীর ভিতরে দু একজন ভৃত্যও থাকিত। আমরা এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছি এমন সময় দেখি মেজের একখানা পাথরে খুব অস্পষ্ট এবং ছোট ছোট অক্ষরে 'হি' এবং 'মু' এই দুইটী অক্ষর লেখা রহিয়াছে; মেজেটী সমস্তই পাথরের ছিল। লছমন হিন্দুস্থানীর ছেলে হইলেও সে একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিল, এমন কি সে একটু একটু বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতেও শিখিয়াছিল। কোথাও কিছু নাই, একখানা পাথরে দুটী অক্ষর কোথা হইতে আসিল ? আমার একটু কৌতূহল জন্মিল, আমি অনুচর লছমনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে ঐ লেখা দেখিয়াছে কি না, সে বলিল অনেক দিন সে উহা দেখিয়াছে। আমি বলিলাম, "বল'ত এ লেখার অর্থ কি" ? সে আমার প্রশ্ন শুনিয়া একটু চিন্তাও করিল না, বলিল "কেন, হিন্দু ও মুসলমান" আমি বলিলাম কিসে বুঝিলে হিন্দু ও মুসলমান, সে বলিল কেন "আগে হিন্দু রাজা ছিল, তারপর মুসলমান রাজা হয়, তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে।" যাহা হউক অনুচরের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার উত্তরটা আমার মনমত হইল না।

(আগামী বারে শেষ হইবে)



টেলিফোন।



অসীম শক্তিমান জগতপতির এই সৃষ্টিতে কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যহই সংসাধিত হইতেছে তাহা আমরা--সামান্য মানুষ দেখিয়াও দেখিতে পাই না, শুনিয়াও শুনিতে পাই না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌরজগৎ গ্রহাদির কথা দূরে থাক্, একখণ্ড সামান্য লৌহে বা একখণ্ড তাম্রে কি অদ্ভুত শক্তিই লুক্কায়িত রহিয়াছে ! ভগবান কত দয়া করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান উপার্জ্জনের শক্তি দিয়াছেন ; দিনে দিনে আমরা যতই জ্ঞান লাভ করিতে পারিব, তেমনি কতই হৃদয়-মুগ্ধ-কর, ব্যাপার দেখিতে পাইব !

আমরা আজ কাল পথের পার্শ্বে খুঁটির উপর দিয়া যে সকল তার গিয়াছে দেখিতে পাই তাহার কতকগুলি টেলিগ্রাফের তার, কতকগুলি টেলিফোনের তার। অনেকেই জানেন টেলিগ্রাফের তার দিয়া দূরে সংবাদ পাঠান যায় ; আর টেলিফোনের তার দিয়া দূরে একজন আর একজনের সহিত কথা কহিতে পারে। টেলিগ্রাফের সংবাদ

কথা কহিয়া পাঠান হয় না; একস্থান হইতে কতক-গুলি সঙ্কেত করিলে দূরে সেই সঙ্কেত বুঝিয়া সংবাদ স্থির করিয়া লয়। টেলিগ্রাফ শব্দের অর্থ দূরে লিখন, আর 'টেলিফোন' শব্দের অর্থ 'দূরে কথা কহা'। আমরা এখানে টেলিফোনের কথাই বলিব।

এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপার কেবল কয়েকখণ্ড লৌহ এবং কতকটা তাম্রের সাহায্যে মাত্র সাধিত হইয়া থাকে। চুম্বক প্রস্তরের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহার প্রধান গুণ লৌহকে আকর্ষণ করা; তদ্ভিন্ন তাহার আরও অনেক গুণ আছে। বাস্তবিক যে কোন কোন প্রস্তরের এইরূপ গুণ আছে, তাহা সেই প্রস্তর মধ্যস্থ লৌহ বিন্দুরই গুণ; পাথরে লোহা মিশ্রিত থাকে। পাথর গুঁড়াইয়া, গালাইয়া লোহা বাহির করে। আবার লোহা হইতে ইস্পাত হয়। যে কোন ইস্পাতে উক্ত চুম্বক শক্তি বিশিষ্ট লোহা বা ইস্পাত ঘসিলে সহজ ইস্পাত বা লোহাও সেইরূপে চুম্বক শক্তি প্রাপ্ত হয়। একরূপ খেলানার মাছ বিক্রয় হয় তাহা জলে ভাসাইয়া চুম্বক কাটি ধরিলে মাছগুলি কাটির দিকে ছুটিয়া আসে, এই চুম্বক কাটিটী ইস্পাতখণ্ড। ইহা দ্বারা একটা চাবি বা অন্য লৌহ দ্রব্যকে ঘসিলে তাহারও আকর্ষণ শক্তি জন্মায়। তবে ঘসিবার বিশেষ প্রকরণ আছে।

এই চুম্বক খণ্ডের আর এক গুণ এই যে ইহার অল্প নিকটে একখণ্ড সহজ লৌহ ঘুরাইলে বা নাড়িলে এক প্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে ইলেক্‌ট্রিসিটি বা তাড়িত শক্তি বলে। এই তাড়িত শক্তি অপরাপর উপায়েও জন্মায়। এখন তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন বাত বা অন্য কোন রোগে ডাক্তরে একটা বাক্সে একটা হাতল ঘুরাইয়া রোগীকে সেই বাক্সের দুইটা তারের দড়ি ধরিতে দেন বা রোগীর গাত্রে দিয়া থাকেন। ইহাও দেখিয়া থাকিবেন যে এই বাক্সের ভিতর ঘোড়ার পায়ের 'নালের' আকারের একখণ্ড ইস্পাত আছে। এই ইস্পাতখণ্ড চুম্বক শক্তি বিশিষ্ট; হাতল ঘুরাইলে এক জোড়া কাটিমের মত একটা দ্রব্য ঘুরিতে থাকে, তাহা আর কিছুই নহে, দুইখণ্ড (বস্তুতঃ এক খণ্ডকে বাঁকাইয়া দুই মুখ বিশিষ্ট করা হইয়াছে) লোহা মাত্র। এই লৌহখণ্ড এক অঙ্গুলি মোটা; তাহার উপর তামার তার জড়ান থাকায় তিন চার অঙ্গুলি মোটা দেখায়। এই লৌহখণ্ড উপ-রোক্ত চুম্বকের নিকট ঘোরে বলিয়া তাড়িৎ জন্মায় এবং তাহা তার দিয়া রোগীর শরীরে প্রবেশ করতঃ রক্ত সঞ্চালনের সাহায্য করায় রোগ মুক্তির সুবিধা হয়। আমরা যে ইলেকট্রিক লাইট বা বৈদ্যুতিক আলোক দেখিতে পাই তাহাও কেবল মাত্র এইরূপ চুম্বক বা লোহার নিকট লোহা ঘুরিবার কল মাত্র।

টেলিফোনে কথা কহিবার জন্য একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহা একটি কৌটার ন্যায়। এই কৌটার ভিতর এক অঙ্গুলি মোটা এক খণ্ড চুম্বক আছে তাহার গায়ে অনেকটা তামার সরু তার জড়ান থাকে। তার জড়াইবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য। তাড়িৎ যত ঘুরিবার পথ পায় তাহার শক্তি তত বৃদ্ধি হয়। কৌটাস্থিত এই চুম্বকের এক মুখের নিকট একখণ্ড অতি পাতলা লোহার পাত থাকে এবং কৌটার মুখে কথা কহিবার ছিদ্র থাকে। ছিদ্র দিয়া কথা কহিলে কথার বাতাসে উক্ত লোহার পাত কাঁপিতে থাকে। চুম্বকের নিকটে লোহা নড়িতে থাকে বলিয়া তাড়িৎ শক্তি প্রথমে চুম্বকের গায়ের তার তৎপরে তাহার দুই মুখে সংলগ্ন বাহিরের তার দিয়া বহু ক্রোশ দূরে যায়; গিয়া সেইরূপ আর একটা

যন্ত্রের প্রথমতঃ চুম্বকে প্রবেশ করে পরে তন্নিকটস্থ লোহার পাতকে কাঁপাইয়া, প্রথম শব্দের অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে।

আমরা কথা কহিলে যে শব্দ শুনিতে পাই, তাহার কারণ,—কথা কহিলে বায়ুতে কতকগুলি আঘাত লাগে। আঘাত লাগিয়া, যেমন জলে ঢিল ফেলিলে জলে 'হিল্লোল' জন্মায়, সেইরূপ বাতাসেও একরূপ হিল্লোল বা কম্পন জন্মায়; বায়ু কাঁপিতে কাঁপিতে কর্ণে প্রবেশ করিয়া কর্ণের মধ্যস্থ পাতলা পটহে যে প্রকার আঘাত করে সে সেইরূপ শব্দ শুনিতে পায়। উপরোক্ত টেলিফোন যন্ত্রের পাতলা লোহার পাতে কথা বলিবার জন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঘাত লাগিয়া পাতখানি কাঁপিতে থাকে, বায়ুর স্রোত কথা কহিবার এই কম্পন মানুষের কর্ণে লইয়া যায়, কিন্তু এখানে চুম্বক থাকাতে সেই মুহূর্ত্তে তাড়িৎ শক্তি জন্মায়, এবং বায়ুর স্রোতের ন্যায় তাড়িতের স্রোত এই কম্পনগুলি বায়ু অপেক্ষা আরও অনেক বেশী দূরে লইয়া যাইতে পারে। সেখানে গিয়া অপর কৌটার লোহার পাতে কথা কহিবার সময় পূর্ব্ব কৌটায় যে কম্পন উপস্থিত করিয়াছিল, ঠিক সেই কম্পন উপস্থিত করে, তখন বায়ু তাহা মানুষের কর্ণের ভিতর লইয়া যায়। সুতরাং কথা কহিলে, নিকটে মানুষের কর্ণে যে কম্পন প্রবেশ করিয়া যে কথা শুনা যাইত, দূরেও ঠিক সেই কম্পন হওয়ায় ঠিক সেই সকল কথাই লোকে শুনিতে পায়। অনেক ক্রোশ দূরে এরূপ কথা বার্ত্তা চলিতে পারে; তবে টেলিগ্রাফে যেমন এখান হইতে পৃথিবীর সকল স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, টেলিফোনে ততদূরে কথা কহা যায় না, কালে অবশ্য তাহারও উপায় বাহির হইবে। কলিকাতায় যে টলিফোনের তার আছে তাহা ২০।২৫ মাইল দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যাহা হউক ঘরে বসিয়া এত দূরের লোকের সঙ্গেও যে কথা বার্ত্তা কহিতে পারা যায়, তাহাও বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতার কথা সন্দেহ নাই।

দূরে কহারও সহিত কথা কহার আবশ্যক হইলে প্রথমতঃ এখানে একটা চাবি টিপিলে সেখানে একটা ঘণ্টা বাজিতে থাকে, সুতরাং তাহারা বুঝিতে পারে যে কেহ ডাকিতেছে, তখন সে ব্যক্তি চাবি টিপিলে এখানেও ঘণ্টা বাজিতে থাকে, তখন এ ব্যক্তি সে আসিয়াছে জানিয়া ঘণ্টা ছাড়িয়া কথা কহিতে আরম্ভ করে। এই ঘণ্টা কিরূপে এতদূরে বাজিতে থাকে তাহা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সামান্য একখণ্ড লোহা ও তামার তারে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধিত হইতে পারে তাহা ইলেক্‌ট্রিক আলোক দেখিয়া বুঝিলে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বলা বাহুল্য যে টেলিফোনের কথা অতি সংক্ষেপেই বলা হইল। ইহার আনুসঙ্গিক অনেক কথা, ইহার আকার পরিমাণ প্রকার বিভাগ ইত্যাদি, বিস্তর বাহুল্য হেতু বলা হইল না।



মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে কি হয়?

একদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আমার ছেলেদের পাঠ বলিয়া দিতেছি, এমন সময় হরিবাবুদের বাটীতে একটা গোলযোগ শুনিয়া, কারণ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদের বাটীতে গেলাম। গিয়া শুনিলাম

যতীনের বড় অসুখ; মারা যাইবার মধ্যে, ভাবিলাম হঠাৎ কি অসুখ হইল? কল্যও সন্ধ্যা বেলা আমাদের নরেনের সঙ্গে তাহাকে খেলা করিতে দেখিয়াছি, শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্যাম! যতীনের কি হইয়াছে? শ্যাম বলিল, গিয়া দেখুন না, তাহার পেট ফেঁপে উঠিয়াছে, যেরূপ ফেঁপেছে আর কিছুকাল প্রস্রাব না হইলে মারা যাইবে। আমি বলিলাম সে কি? যতীনের এমন অবস্থা! দ্রুতপদে তাহার নিকট গেলাম, দেখিলাম যতীন বড়ই কষ্ট পাইতেছে, তাহার কষ্ট দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম, শুনিলাম ডাক্তার গোবিন্দ বাবুকে আনিবার জন্য লোক গিয়াছে, গোবিন্দ বাবু অল্প-দিন হইল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পাশ করিয়া-ছেন, কিন্তু তিনি চিকিৎসার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, গোবিন্দ বাবু আসিলেন। রোগীর অবস্থাদি দেখিয়া বলিলেন ক্যাথিটার (শলা) পাশ করিতে হইবে। এখনই করিতে হইবে, বলিয়া শলা বাহির করিলেন, ডাক্তারী আয়োজন ও অস্ত্র শস্ত্র দেখিলে রোগীর প্রাণ উড়িয়া যায়, রোগীর কেন, সে আয়োজন দেখিলে, আমাদেরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। গোবিন্দ বাবু রোগীর হস্ত পদ ধারণ করিবার জন্য দুটী লোককে বলিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল। তিনি প্রস্রাব দ্বারে শলা প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু শলা আর পাশ হয় না, যতীন যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তাহার অস্থিরতা বশতঃই হউক বা ডাক্তার বাবুর কর্ম্মপটুতা বশতঃই হউক, একবারে অনেকটা রক্ত পাত হইল, যতীনের যে কষ্ট তৎকালে দেখিয়াছি, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। পুনঃ পুন চেষ্টায় এক বার শলা হঠাৎ পাশ হইল, রোগী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কি বিপদ! যতীন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, ছেলে গুলা বড়ই অসাবধান, বাহ্যের বেগ হইলে পাইখানায় যাইবে না, প্রস্রাবের বেগ হইলে প্রস্রাব করিবে না, ইহাতে যে কত অনিষ্ট হইতে পারে তাহা বুঝিবে না, মহামুস্কিল আর কি!

হ্যাঁরে যতীন! তোর প্রস্রাব বন্ধ কেন হোলোরে!

আজ্ঞে তা আমি জানি না, তবে কাল বৈকালে ও বাড়ীর নরেনের সঙ্গে যখন খেলা করি, তখন বড় প্রস্রাব পেয়ে ছিল, কিন্তু খেলা ফেলিয়া প্রস্রাব কর্ত্তে যাই নাই, বাটী আসিয়া রাত্রিতে আহারান্তেও কেমন আলস্য হওয়ায় শুইয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)



ঠগের কাহিনী।*

প্রচলিত ভাষায় যে প্রতারণা করে তাহাকে ঠগ বলে। ঠগ নামে যে একটী জাতি অথবা সম্প্রদায় আছে, সখার পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে বোধ হয় তাহা অনেকেই জান। পূর্ব্বে ইহাদের সম্বন্ধে কিছু সখায় লেখা হইয়াছে। এক সময়ে ইহাদের ভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া অসম্ভব ছিল। কোন

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সখায় ঠগদিগের সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু নূতন কথা আছে সেই জন্য পুনরায় ঠগকাহিনী মুদ্রিত হইল। সম্পাদক।

সময় ঠগের হাতে প্রাণ যায় কেহ জানিত না। মোহিনী-মায়ায় ভুলাইয়া মায়া কান্না কাঁদিয়া মানুষের প্রাণ হরণ করিত। যদিও এখন ইংরেজ শাসনে এই জাতি একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের ইতিহাস অতি বিচিত্র। ধর্ম্মের নামে মানুষ কি ভীষণ কার্য্য করিতে পারে; কুসংস্কার মানুষকে কিরূপ হৃদয় হীন করিতে পারে; কঠোরতার মধ্যেও মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা কিরূপ প্রকাশিত হয় ঠগের কাহিনী পড়িলে দেখিতে পাইবে। কত দিন হইল এই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে ফিনট নামক একজন ফরাসী ভ্রমণকারী প্রথম তাহাদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আগ্রা ও দিল্লীর পথে এক প্রকার ভয়ানক ডাকাত আছে। তাহারা দুই উপায়ে মানুষকে বধ করে। পেছন দিক হইতে হটাৎ এক প্রকার দড়ী গলায় বাঁধিয়া শ্বাসবদ্ধ করিয়া প্রাণ হরণ করে। অন্য উপায় এই—একটী সুন্দরী রমণীকে রাস্তার পাশে বসাইয়া দেয়, আলু থালু কেশ, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সকরুন রোদন করিতে থাকে। পথিক তাহার কষ্টে দয়াদ্র হইয়া তখন সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, সে এই নিরাশ্রয়া রমণীকে তাহার ঘোড়ার উপর পেছনদিকে বসাইয়া লয়, তখন পাপিষ্ঠারা তাহার গলায় দড়ী লাগায়। পুরুষগুলি জঙ্গলে লুক্কায়িত থাকে, সেই সময় বাহির হইয়া প্রাণ বধ করে। হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়া ঠগ জাতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সকলেই কালী ভক্ত। তাহারা যাহা কিছু করে কালীর আদেশানুসারে করে; কালীর সন্তুষ্টির জন্য যেরূপ হীন কাজই করুক না কেন, তাহাতে তাহাদের কোনরূপ অনুতাপ অথবা আত্মগ্লানি বোধ হয় না। প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অলৌকিক ঘটনা মিশ্রিত থাকে। চরণ ও ভাটের জন্ম সম্বন্ধে যেমন দৈব ঘটনার উল্লেখ আছে, ঠগদের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। চরণ ও ভাট মহাদেবের সৃষ্টি, ঠগ কালীর সৃষ্টি, দানব রক্তবীজ পৃথিবী জনশূন্য করিয়া ফেলিতেছিল, কালী তাহাকে সংহার করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু এই দানব-বধ ভীষণ ব্যাপার। দানব এত বড় যে সমূদ্রে তাহার কটিদেশের অধিক ডুবে না। কালী তাহাকে বার বার আঘাত করিলেন কিন্তু প্রতি রক্ত বিন্দু হইতে এক একটি রক্তবীজের জন্ম হইতে লাগিল। কালী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন আপনার শরীরের ঘর্ম্ম হইতে দুইজন মানুষের সৃষ্টি করিয়া, প্রত্যেককে একখানা রুমাল দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে এই দানবকে বধ কর, কিন্তু যেন একবিন্দু রক্তও ভূমিতে না পড়িতে পারে। তাহারা দৈব বলে কৃতকার্য্য হইল। যখন রুমাল দুখানা ফিরাইয়া দিতে গেল, কালী তখন বলিলেন ইহাদ্বারা তাহারা এবং তাহাদের বংশধরগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এবং একথাও বলিয়া দিলেন যে বধ করিয়া মৃত দেহ রাখিয়া যায়; তিনি তাহা রাখিবার বন্দোবস্ত করিবেন, কিন্তু তাহারা দেহ কি হইয়াছে দেখিতে যেন চেষ্টা না করে। কালীর ঘর্ম্ম নির্ম্মিত পুরুষগণ রুমাল অথবা গুপ্ত বাণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে নাই, কিন্তু উহাদের বংশধরগণ ইহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছে। বংশধরগণ মৃতদেহ সম্বন্ধে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই, একজন পেছন দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল তাই কালী আর মৃত দেহ স্থানান্তরিত করেন নাই। তবে চিতা খননের জন্য আপনার একটী দাঁত দিলেন। দাঁত শেষে কি হইল বলিতে পারি না। কিন্তু কোদালি অথবা কালীর সম্মান তাহারা সর্ব্বদাই করে। কোদালী প্রস্তুতের পূর্ব্বে পুরোহিত শুভদিন স্থির করে। দলপতি কর্ম্মকারের বাড়ী যাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া

তাহার সম্মুখে কোদালী প্রস্তুত করিতে বলে, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কাজ করিতে পারে না। সোম, মঙ্গল, বুধ অথবা শুক্রবারে তাহাতে ধুপ দেওয়া হইত। কোন জীবন্ত বস্তুর ছায়া পড়িলে অপবিত্র হইয়া যাইত, সুতরাং দ্বার বন্ধ করিয়া ধুপ দিতে হইত।

(ক্রমশঃ)

পারিতোষিক।



উপরে যে চিত্রটী দেওয়া গেল, সে সম্বন্ধে সখার গ্রাহকদিগের মধ্যে যাহার রচনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে একটী পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। ষোল বৎসরের অধিক যাহাদের বয়স তাহাদের প্রবন্ধ গ্রহণ করা যাইবে না। বয়স সম্বন্ধে এবং প্রবন্ধ যে বালকেরই নিজ লিখিত সে সম্বন্ধে পিতা বা অন্য অভিভাবক অথবা শিক্ষকের স্বাক্ষরিত পত্রের আবশ্যক। রচনা আগামী মে মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

সখার অনেক গ্রাহক মৃগনাভী বীজের জন্য আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন, আমরা শীঘ্রই উক্ত বীজ তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিব।



মে, ১৮৯২।



বিবিধ।

কিছুকাল হইতে সূর্য্য মধ্যে কতকগুলি দাগ দেখা যাইতেছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদগণ এই সকল দাগ দেখিতেছেন। বিলাতের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ স্যার রবার্ট বল বলেন যে, এই সকল দাগ ক্রমেই বেশী হইতেছে, এবং সূর্য্য মধ্যে একটা খুব বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সূর্য্যের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিলে আমাদেরও ভয় আছে।

*
* *

জর্জ্জিয়া নামক স্থানে প্রাতঃকালে ছয়টার সময় বন হইতে একটী বৃক্ষ কাটিয়া আনা হয়। সন্ধ্যা ছয়টার সময় ঐ বৃক্ষ একটী কাগজের কারখানায় কাগজে পরিণত হয়; এবং তারপর দিন প্রাতঃকালে ছয়টার সময় সেই কাগজ সংবাদপত্র রূপে বিতরিত হয়। অধ্যবসায় এবং কার্য্য তৎপরতা দেখ!

*
* *

কোন কোন পক্ষীর গতি অতি আশ্চর্য্য। ইটালীতে সোয়ালো পক্ষী লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল; দুটী সোয়ালো পক্ষীকে তাহাদের শাবকদিগের নিকট হইতে উঠাইয়া পেভিয়া হইতে ৪৪ মাইল দূরে মিলান নগরে লইয়া যাওয়া হয়। মিলানে ইহাদের দুটীকে পুনরায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়; দেখা গেল যে পাখী দুটী ঠিক ত্রিশ মিনিটে পুনরায় পেভিয়াতে তাহাদের শাবকদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঘণ্টায় ৮৮ মাইল গতি বড় সাধারণ কথা নহে। আমাদের দেশে রেল গাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতি ঘণ্টায় ৪০ মাইল মাত্র।

*
* *

সংবাদ পত্র পড়া বিলাতের লোকের দৈনিক আহারের ন্যায় একটী অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য। বিলাতের লোকে প্রতিদিন যেমন বাজারে খাদ্য জিনিষ ক্রয় করে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একখানি সংবাদ পত্রও ক্রয় করে। টাইম্‌স্ নামক পত্রিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পত্রিকা; কিন্তু ডেইলি টেলিগ্রাফ্ ও ষ্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হয়। ডেইলি টেলিগ্রাফ রোজ ২৪১০০০ বিক্রয় হয়, ষ্ট্যান্‌ডার্ডও প্রায় ঐরূপ। আমাদের এ দেশে সাত দিন অন্তর এক এক খানি সংবাদ পত্র বাহির হয়, তাহার গ্রাহক সংখ্যা দুই তিন হাজার; সর্ব্বাপেক্ষা বেশী যেখানা তাহার গ্রাহক চৌদ্দ পোনের

হাজার মাত্র। ইহার কারণ প্রধানতঃ শিক্ষার অভাব, দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের লোকের পড়া শুনার প্রবৃত্তির অভাব।

*
* *

যদি তোমার বয়স পোনের বৎসর হইয়া থাকে, তবে তোমার শরীরের ভিতরের অবস্থা কি বলিয়া দিতেছি। তোমার শরীরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬০ খানি অস্থি আছে, ৫০০ শত মাংসপেশী আছে। তোমার শরীরের সমস্ত রক্তের পরিমাণ প্রায় সাড়ে বার সের; তোমার হৃদপিণ্ড পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এবং তাহার পরিধি তিন ইঞ্চি। প্রতি মিনিট ৭০ বার হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হয়; প্রতি ঘণ্টায় ৪২০০, প্রতিদিনে ১০০৮০০ এবং প্রতি বৎসরে ৩৬৭২২২০০ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে। প্রতিস্পন্দনে পাঁচ তোলার কিছু অধিক রক্ত হৃদপিণ্ড হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়; এবং প্রতিদিনে ১৮৯ মণ রক্ত হৃদপিণ্ড দ্বারা চলাচল করে। তোমার ফুসফুসের ভিতর এক গ্যালন বায়ু ধরে এবং তুমি ২৪০০০ গ্যালন বায়ু প্রতিদিন নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাক। তোমার মস্তিষ্কের ওজন দেড় সের, তুমি যখন পূর্ণ বয়স্ক হইবে, তখন মস্তিষ্ক আর এক পোয়া আন্দাজ বেশী ভারি হইবে। তোমার শরীরে স্নায়ুর সংখ্যা ১০,০০০,০০০ এরও অধিক। তোমার চর্ম্মে তিনটী পরদা আছে, এবং চর্ম্মের স্থূলতা এক ইঞ্চির চারি ভাগের একভাগ হইতে এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত। তোমার শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের করিয়া বায়ুর চাপ পড়িতেছে। চর্ম্মের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চিতে ৩৫০০ গুলি ঘর্ম্ম নিঃসরণের সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে।

*
* *

মাইক্রোফোন শ্রবণ-যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষীণ শব্দ—যাহা কাণেও শুনিতে পাওয়া যায় না—তাহাও অতি পরিষ্কার রূপে শুনিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি এই যন্ত্রের সাহায্যে এক জনের জীবন রক্ষা হইয়াছে। সেণ্টপিটার্সবর্গে একটী স্ত্রীলোক স্নায়বীয় পীড়ায় এ ভুগিতেছিলেন একদিন হঠাৎ মূর্চ্ছায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। যে ডাক্তার এই রোগীকে দেখিতেছিলেন তিনি বলিলেন যে, হৃদপিণ্ডের পক্ষাঘাৎ হইয়া রোগিনীর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঘটনা বশতঃ আর একজন ডাক্তার এই রোগিনীকে সেই সময় দেখেন এবং রোগিনীর ইতিপূর্ব্বে হিষ্টিরিয়া ও পক্ষাঘাতের ন্যায় হইয়াছিল এই কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ হয় যে রোগিনীর মৃত্যু হয় নাই। তিনি নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া অবশেষে হৃদপিণ্ডে মাইক্রোফোন লাগাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, রোগিনীর মৃত্যু হয় নাই—হৃদপিণ্ড তখনও কার্য্য করিতেছে। তখন নানা উপায়ে রোগিনীকে বাঁচান হইয়াছিল।



মল মূত্রাদ্রির বেগ ধারণ করিলে কি হয়।

(গত সংখ্যার ৬২ পৃষ্ঠার পর)

রাত্রি দুটার সময় জাগিয়া দেখি প্রস্রাব বন্ধ হওয়ায় পেট টন্‌টন্ করিতেছে; তাড়াতাড়ি প্রস্রাব করিতে গেলাম, প্রস্রাব হইল না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলাম কিছুতেই কিছু হইল না। ভয়ানক যাতনা হইল, প্রস্রাব বন্ধ করিলে যে এমন

হয় তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। মা রাত্রিতে শয়ন কালে রোজই প্রস্রাব করিয়া শয়ন করিতে বলিতেন, অনেক সময় তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত করি নাই, অদ্য তাঁহার কথা অবহেলা করার যে অপরাধ ...ছিল তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইলাম ...র বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, সেদি... ...মাদের পাড়ায় এইরূপ আর একটী ঘটনা হইয়াছি...। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবার বেলা প্রায় ১২॥টার সময় রোগী দেখিয়া বাটী আসিয়া দাঁড়াইয়াছি এমন সময় দেখি, হেমেন্দ্র বাবুর চাকর গদা অতি ব্যস্ত ভাবে আসিয়া উপস্থিত। আমি তাহাকে এরূপ অসময় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "মহাশয়! একবার শীঘ্র আসুন আমাদের বাবুর মেঝ ছেলেটীর ভয়ানক ব্যারাম আপনি শীঘ্র আসুন।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আমিও ব্যস্ত হইয়া হেমেন্দ্র বাবুর বাটী গেলাম, বিষম ব্যাপার দেখিলাম, ছেলেটীর কন্‌ভল্‌সন্ (হস্ত পদাদির আক্ষেপ) হইতেছে কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, দেখিলাম উদর অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে। তখনই মনে হইল সিরিঞ্জ (পিচ্‌কারী) ব্যবহার না করিলে বালকটী রক্ষা পাইবে না। পিচকারী আনিবার জন্য বাটীতে লোক পাঠাইলাম, এদিকে অপরাপর আয়োজন করিতে লাগিলাম। পিচকারী প্রয়োগ করা হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল বেগে বায়ু ও মল নিঃসৃত হইয়া আমার নাকে ও মুখে ছুটিয়া লাগিল, আমি "রাম" "রাম" বলিয়া দূরে পলায়ন করিলাম। বালক অসীম যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িল, আত্মীয় স্বজনের উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইল। এইরূপে বালকেরা ইচ্ছা করিয়া অনেক সময় কষ্টে পড়ে। কোন প্রকার শারীরিক বেগ্ রোধ করা উচিত নহে, বালকেরা তাহা বুঝে না, পিতা মাতাও এবিষয়ে বালকদিগকে সাবধান করেন না। অনেক সময় দেখা যায় বালকেরা আড়া আড়ী করিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকে তাহাতে কঠিন শির রোগ নেত্র রোগ এবং কর্ণ রোগ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। বালকেরাও অনেক সময় অজ্ঞতা বশতঃ উপস্থিত মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করে। বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও ভদ্রতার অনুরোধে, এই রূপ ... করিয়া অশেষ ক্লেশ পাই... ...। যে সকল বেগ রোধ করিলে শরীরের অনিষ্ট হইতে পারে, বালকবালিকাগণের হিতের জন্য নিম্নে তাহার কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল। সেইগুলি স্মরণ রাখিয়া চলিলে, আমাদের যতীন, ও হেমেন্দ্র বাবুর মেঝ ছেলের ন্যায় কাহাকেও তদ্রূপ উৎকট যাতনা ভোগ করিতে হইবে না।

বায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা, অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উচ্ছাস, এবং নিদ্রার বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে যেরূপ মারাত্মক ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহা উপরে দেখাইয়াছি, অপরগুলির বেগ রোধেও তদ্রূপ কঠিন পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, তজ্জন্যই বালকবালিকাদিগকে সাবধান করিতেছি যে, তাহারা যেন উপস্থিত মল মূত্রাদির বেগ কখনও ধারণ না করে।

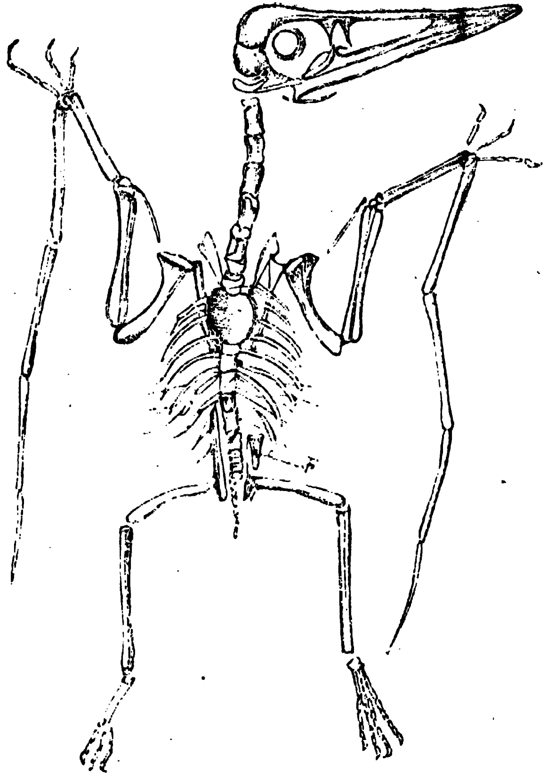


উড্ডীয়মান ড্রাগন।

স্তন্যপায়ী জীব এবং পক্ষীজাতীর মধ্যে একটী প্রধান বিভিন্নতা দাঁত। মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র বিড়াল ইন্দুর পর্য্যন্ত যে সকল জীব শিশুকালে স্তন পান করিয়া বাঁচে, তাহাদের সকলেরই দাঁত দেখিতে পাইবে। আবার যাহাদের পক্ষ আছে, তাহাদের কখনও দাঁত দেখিতে পাইবে না। পক্ষ এবং দাঁত এ দুটী জিনিষ এক জীবে দেখা যায় না।

কিন্তু নীচে যে একটী জীবের চিত্র দেওয়া গেল, তাহাতে আমরা এই দুটী জিনিষই দেখিতে পাই। আমরা ইহাকে পক্ষী জাতীর মধ্যে ধরিব অথবা স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে ধরিব বুঝিতে পারি না।

যাহাই হউক এই অদ্ভু জীব [illegible] হইবে তাহার একটা সিদ্ধান্ত ন[illegible]লেও তাহাতে

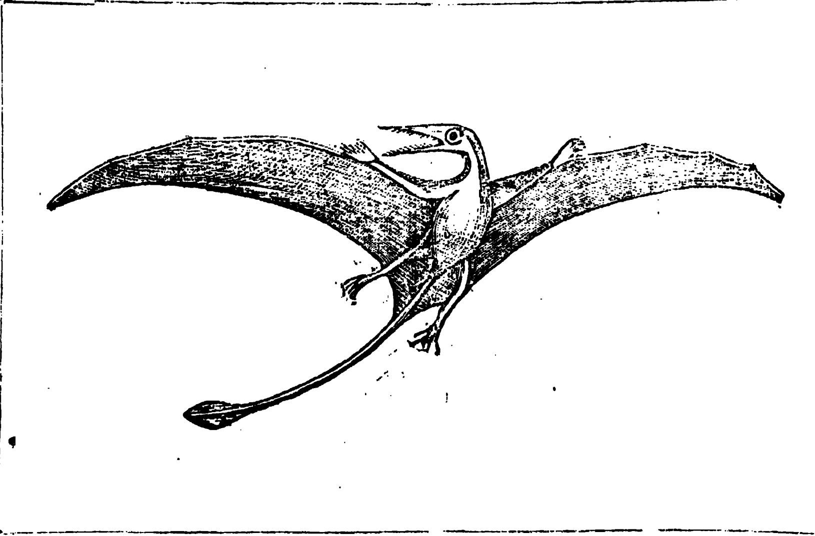


আমাদের একটা বিশেষ কিছু লোকসান দেখিতেছি না; কারণ এ জীবটী এখন আর এ পৃথিবীতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

অতি পূর্ব্বকালে—এমন কি মানুষেরও জন্মের পূর্ব্বে পিরোড্যাক্‌টাইল পৃথিবীতে বিরাজ করিত। প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে উড্ডীয়মান ড্রাগনের যে সমস্ত অদ্ভুত এবং ভয়াবহ গল্প প্রচলিত ছিল পিরোড্যাক্‌টাইলই সেই উড্ডীয়মান ড্রাগন। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল ইহারা মানুষ ধরিয়া পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া থাকে। প্রাচীনেরা বা মধ্যযুগের লোকেরা এই অদ্ভুত জীবকে কখনও দেখেন নাই, তাঁহারা ইহার সম্বন্ধে কতগুলি আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত গল্পই জানিতেন। কিন্তু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কুভের প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই অদ্ভুত জীব সত্য সত্যই এক সময়ে জগতে সশরীরে বিচরণ করিত।

উড়িবার শক্তি আছে। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত সরিসৃপ জাতীয় জীবগণ কখনও উড়িতে পারে না। যাহাই হউক কুভেরের পরীক্ষায় ইহা সরিসৃপ জাতীয় বলিয়াই স্থির হইল এবং তিনি ইহাকে পিরোড্যাক্‌টাইল নাম দিলেন।

এই পিরোড্যাক্‌টাইল কোন জাতীয় জীব তাহা লইয়া প্রাণীতত্ত্ববিদদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক এবং মত ভেদ হইয়াছিল। পক্ষ বিশিষ্ট এবং উড়িতে পারে দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে পক্ষী জাতীয় মনে করিয়াছিলেন। অপর পৃষ্ঠায় যে কঙ্কালের চিত্র দেওয়া গিয়াছে, তাহা একটী ক্ষুদ্র পিরোড্যাক্‌টাইলের কঙ্কাল। চিত্রে দেখিতে



ব্যাভেরিয়া দেশে চূর্ণপ্রস্তর স্তরে একটী জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলীনি নামক এক ব্যক্তি ইহাকে কোন প্রকার জল জন্তুর কঙ্কাল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত কুভেরের নিকট এই কঙ্কালটী আনা হয়। কুভের পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে এ জীবটী স্তন্যপায়ী নহে এবং পক্ষীজাতীয়ও নহে; কঙ্কালটী সরিসৃপ জাতীয়ের কঙ্কালের ন্যায়, অথচ কিন্তু ইহার

পাইবে যে উহার গলা অপেক্ষাকৃত খাট এবং গলার হাড়ের সন্ধি গুলিও অল্প; পক্ষীজাতীর সহিত প্রথমতঃ ইহার এই এক প্রধান বিভিন্নতা। ইহার মস্তকের গঠন অনেকটা পক্ষীজাতীর ন্যায় বটে, কিন্তু ইহাতেও কতগুলি বিভিন্নতা দেখা যায়। পিরোড্যাক্‌টাইলের যে তীক্ষ্ণ দন্তরাজি আছে, (২য় চিত্র দেখ) তাহাতেই প্রমাণ হয় যে রা পক্ষীজাতীয় নহে। কিন্তু পিরোড্যাক্‌টাইল

যে পক্ষীজাতীয় নহে তাহার প্রধান প্রমাণ ইহাদিগের পক্ষের গঠনে দেখা যায়। প্রথম চিত্রে দেখা যাইতেছে যে পিরোড্যাক্‌টাইলের হাতে তিনটী নখর বিশিষ্ট অঙ্গুলি আছে, এবং আর একটী অতিশয় লম্বা নখর শূন্য অঙ্গুলী আছে; এবং এই লম্বা অঙ্গুলীটি দ্বারাই ইহার পক্ষ দৃঢ় বদ্ধ থাকে (২য় চিত্রে পক্ষ দেখ)। এই লম্বা অঙ্গুলীটি [illegible] মানুষের হাতের কড়ে আঙ্গুলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এবং (১ম চিত্রে) কব্জার কাছে যে আর একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলী দেখা যাইতেছে তাহাকে বুড়ো আঙ্গুল ধরা যাইতে পারে। কিন্তু পক্ষী জাতীয় জীবদের পক্ষের গঠন ইহার অনুরূপ নহে। ইহাদিগের পক্ষমধ্যে আঙ্গুলের ন্যায় যে সমস্ত অস্থি আছে তাহার একটীও পিরোড্যাক্‌টাইলের মত লম্বা নহে এবং যে অঙ্গুলিটী সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা সেটী মানুষের হাতের তর্জ্জনী। সুতরাং এই খানেই ইহাদের প্রধান বিভিন্নতা। মানুষের হাতের যেটী কড়ে আঙ্গুল, পিরোড্যাক্‌টাইলের সেইটী খুব লম্বা, কিন্তু মানুষের হাতের যেটী তর্জ্জনী, পক্ষী জাতীর সেইটী লম্বা। পাখার গঠনের এই বিভিন্নতাই প্রাণীতত্ত্ববিদদিগের নিকট খুব একটী প্রধান প্রমাণ যে, পিরোড্যাক্‌টাইল পক্ষীজাতীয় নহে।

পিরোড্যাক্‌টাইল পক্ষীজাতীয় নহে ইহা প্রমাণ করিয়া পণ্ডিত কুভের দেখাইয়াছেন যে ইহা স্তন্যপায়ী জীব শ্রেণীর মধ্যেও নহে। প্রধান প্রমাণ এই দেখাইয়াছেন যে স্তন্যপায়ী জীবদিগের মস্তকের সহিত মেরুদণ্ড দুইটী অস্থি সন্ধি দ্বারা সংযুক্ত, কিন্তু পিরোড্যাক্‌টাইলের দুইটীর স্থলে একটী দ্বারা সংযুক্ত। আরও দেখাইয়াছেন যে স্তন্যপায়ী দিগের চোয়াল দুই খণ্ড অস্থি দ্বারা গঠিত কিন্তু পক্ষী এবং সরিসৃপের ন্যায় পিরোড্যাক্‌টাইলের চোয়াল কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অস্থি দ্বারা গঠিত। সুতরাং ইহারা স্তন্যপায়ী জীবও নহে; এই জন্য কুভের পিরোড্যাটাইলকে সরিসৃপ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

পিরোড্যাক্‌টাইলের শরীরে বা পাখাতে লোম ছিল না। প্রস্তর স্তরে পাখার যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে ইহার পাখা অনেকটা বাদুড়ের পাখার ন্যায় ছিল। প্রথম চিত্রে কঙ্কালে দেখা যায় যে ইহার লাঙ্গুল খুব ছোট ছিল। কিন্তু প্রস্তর স্তরে আর একটী পিরোড্যাক্‌টাইলের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহার বেশ লম্বা লাঙ্গুল দেখা যায় (২য় চিত্র দেখ)। এই লাঙ্গুলও সম্পূর্ণ লোমশূন্য এবং ইহার অগ্রভাগে খানিকটা ত্বক বিস্তৃত আছে, উড়িবার সময় ইহা দ্বারা হালের ন্যায় গতি ঠিক করিবার সুবিধা হইত।

পিরোড্যাক্‌টাইলের সাধারণতঃ চিল প্রভৃতির ন্যায় আকৃতি ছিল, কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডে মৃত্তিকাস্তর মধ্যে এক জাতীয় পিরোড্যাক্‌টাইলের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, ইহার মস্তকের অস্থি প্রায় তিন হাত লম্বা, এবং ইহার পক্ষ যখন বিস্তারিত হইত তখন আট নয় হাত দীর্ঘ হইত; ভাবিয়া দেখ কি প্রকাণ্ড কাণ্ড! বৃহৎ লাঙ্গুল ও আট নয় হাত দীর্ঘ পক্ষ বিশিষ্ট তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত একটী জীব মাথার উপর বিচরণ করিতেছে! পক্ষীর ন্যায় ইহারা স্বচ্ছন্দে উড়িতে পারিত, অথচ ইহারা সরিসৃপ জাতীয়। ইহারা মাংসাশী ছিল। ক্ষুদ্র জাতীয় পিরোড্যাক্‌টাইল হয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব আহার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু বৃহৎ জাতীয়েরা কি আহার করিত জানি না। মানুষকে আক্রমণ করা বিষয়ে ইহাদের সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত ছিল হয়ত তাহা মিথ্যা নাও হইতে পারে!

ফুল।

(বালিকার রচনা)

ফুলের মতন সুন্দর এমন
দেখি নাই কোন ঠাঁই,
রূপে অতুলন ভুবন মোহন
দেখিয়া আঁখি জুড়াই।
পবন হিল্লোলে নেচে হেলে দুলে
সুসৌরভ করে দান,
মুখে লয়ে হাসি মধুকর আসি
সুখে করে মধুপান।
হেরে সেই শোভা জন মন লোভা
হয় সদা মম মনে,
গাছের উপরে রচিয়া ফুলেরে
রেখে গেল কোন জনে।
এমন কোমল এমন নির্ম্মল
এমন সুন্দর ফুল,
দেখিনি কখন ফুলের মতন
রূপে গুণে সমতুল।
কুমুদ কমল অমল কোমল
সরোবরে ফুটে আছে,
পবন আসিয়া দেয় বিলাইয়া
সৌরভ সবার কাছে।
মধুকর বলে মোদের সকলে
পেট ভরে মধু দাও,
ফুল হেসে কয় নিলেইত হয়
নেও সবে যাহা চাও।
বায়ু কাছে এসে বলে ফুলে হেসে
তোমার সুগন্ধ দেবে?
আমি বয়ে তারে নিয়ে যাব দূরে
মুগ্ধ হবে প্রাণী সবে।
ফুল বলে ভাই দেব যাহা চাই
হেসে নিয়ে যাও চলে,
তোমাদেরি তরে বিধাতা আমারে
সৃজেছেন ধরাতলে।
কুসুমের কাছে যে যাহা চেয়েছে
ফুল তারে তাই দিলে,
ফুল কি আমারে কিছু দেবেনারে
আমি গিয়ে কিছু চেলে?
আমি যাই গিয়ে ফুল কাছে চেয়ে
যে কুসুমে সৃজিয়াছে,
যাঁর রূপরাশি কণা মাত্র আসি
কুসুমেরে সাজায়েছে।



মানুষ আর কতদিন?

সূর্য্যই পৃথিবীর জীবন। সূর্য্য আছে বলিয়াই পৃথিবী আছে এবং আমরা বাঁচিয়া আছি। সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক পৃথিবীর এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুর জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। এই সূর্য্যের উত্তাপ না থাকিলে তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ এবং মনুষ্য কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিবর্গ কিছুই জন্মিত না। পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হইত এবং মানুষ ও

যে সমস্ত জীব জন্তু পৃথিবীতে এখন আমরা দেখিতে পাই তাহার একটীও হয়ত থাকিত না। আবার এই সূর্য্যের আকর্ষণ আছে বলিয়াই পৃথিবী আকাশের এই মহাশূন্যতার মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে; এবং তাহাতেই দিবা ও রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু এবং জোয়ার ভাটা প্রভৃতি আমরা দেখিতেছি। এই আকর্ষণী শক্তি যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও শিথিল হয় তাহা হইলে পৃথিবী যে এই মহাশূন্যতার মধ্যে কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না! এক খণ্ড ইষ্টক এক গাছা দড়িতে বাঁধিয়া ঘুরাইলে যেমন নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে থাকে, এবং সেই দড়ি ছিঁড়িয়া গেলে যেমন ইষ্টক খণ্ড কোথায় গিয়া পড়ে, সূর্য্যের আকর্ষণ-রজ্জু ছিঁড়িয়া গেলে আমাদের পৃথিবীরও সেই দশা হয়! যাহাহউক আমরা বলিতেছিলাম সূর্য্যের উত্তাপই পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রাণীগণের জীবন। সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবীর বায়ুরাশি উত্তপ্ত হওয়াতে বায়ুর চলাচল আছে, এবং তাহা আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া আছি। সূর্য্যের উত্তাপ না থাকিলে বায়ু বহিত না, কাজেই মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হইত। এই সূর্য্যের উত্তাপেই সমুদ্র জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিতেছে এবং সেই বাষ্পের উত্তাপ কমিয়া গেলে মেঘ হইয়া পুনরায় জল হইতেছে, এবং বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হইয়া নদ নদীর সৃষ্টি করিতেছে, তরুলতা প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবী শোভিত করিতেছে, এবং ভূমি শস্যশালিনী করিয়া প্রাণীগণের আহার দান করিতেছে। এই বাষ্পকেই অবস্থা ভেদে কখনও শিশির, কুয়াসা এবং বৃষ্টিরূপে দেখা যায়, আবার ইহাই যখন উত্তাপের হ্রাস হয় তখন নীহার, তুষার এবং শিলায় পরিণত হয়। সূর্য্যের এই উত্তাপ না থাকিলে সমুদ্র জল সমুদ্রেই থাকিয়া যাইত; বাষ্পের আকারে উঠিয়া বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠ সিক্ত করিত না, নদ নদী বহিত না, তরু শস্যাদি জন্মিত না, এবং মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীগণও বাঁচিত না। সূর্য্যের উত্তাপই বৃক্ষ প্রভৃতিতে সঞ্চিত হয় এবং তাহাদ্বারা আমরা অগ্নি জ্বালাইয়া বিবিধ আবশ্যকীয় কাজ নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। কাষ্ঠ দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহা এই সূর্য্যের উত্তাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার দেখ যে পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা কত কাজ হইতেছে, কত শত রেলগাড়ী কত শত ষ্টীমার জাহাজ, কত সহস্র কল চলিতেছে, সে পাথুরিয়া কয়লাও আর কিছুই নহে, এই সূর্য্যেরই উত্তাপ। শত শত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের উত্তাপ ইহাতে সঞ্চিত হইয়া ছিল, আজ আমরা তাহাই কাজে লাগাইতেছি। পাথুরিয়া কয়লা কি প্রকারে জন্মিয়াছে এবং কি প্রকারেই বা সূর্য্যের উত্তাপ ইহাতে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সখাতে লিখিয়াছি, পুনরায় লেখা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং দেখ আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে প্রতিপদেই কোন না কোন আকারে সূর্য্যের উত্তাপ [illegible] আবশ্যক।

সূর্য্যের সহিত আমাদের তবে কত নিকট সম্বন্ধ! সূর্য্যই পৃথিবীর চালক এবং সূর্য্য পৃথিবীর প্রাণ। সুতরাং এই সূর্য্যের যদি কোন অনিষ্ট বা বিপদ হয় তবে আমাদেরও বিপদের কথা। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা এইরূপ একটী আশঙ্কাই করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া সূর্য্য আমাদিগকে অবিশ্রান্ত উত্তাপ দিতেছে, এখন সূর্য্যের সেই উত্তাপের ভাণ্ডার ক্রমে খালি হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বলেন যে, যে পরিমাণে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে,

গণনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই পরিমাণ উত্তাপ দিতে হইলে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮০০০০০০ বৎসর মাত্র চলিতে পারে। এবং গননা করিয়া ইহাও দেখিয়াছেন যে সূর্য্যের উত্তাপ দিবার শক্তির পাঁচ ভাগের চারি ভাগ ইহারই মধ্যে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর সূর্য্য আর ৪০০০০০০ কি ৫০০০০০০ বৎসর মাত্র উত্তাপ দিতে পারিবে, তার পর ইহার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে। ইহাই যদি ঠিক হয় তবে মানুষ কত কাল বাঁচিবে তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। যে দিন সূর্য্যের উত্তাপ-ভাণ্ডার শূন্য হইবে, প্রাণীগণের জীবনও সেই দিন ফুরাইবে। সূর্য্য যেমন উত্তাপ বিতরণ করিয়া নিজ শক্তি ক্ষয় করিতেছে, তেমনি যদি কোন উপায়ে উত্তাপ জন্মিয়া শক্তি সঞ্চিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আর কোন ভয় ছিল না। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা দেখিয়াছেন যে, তাহা হইতেছে না। উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি সূর্য্যে পতিত হইয়া কিছু উত্তাপ জন্মাইতেছে বটে কিন্তু তাহা অতি সামান্য। সূর্য্যকে পণ্ডিতেরা একটী জলন্ত বাষ্পময় পদার্থ বলিয়া মনে করেন। সূর্য্যের উত্তাপ যত কমিবে, এই জলন্ত বাষ্পময় পদার্থ ক্রমে তত ঘনীভূত হইবে, শেষে যখন উত্তাপ একেবারে থাকিবে না তখন সূর্য্য একটী কঠিন পদার্থে পরিণত হইবে। এই প্রচণ্ড তেজপুঞ্জ জলন্ত পদার্থ তখন একটী কঠিন শীতল অন্ধকারময় পদার্থে পরিণত হইবে! পৃথিবীস্থ প্রাণীগণের জীবন তাহার পূর্ব্বেই শেষ হইবে। আর ৪০০০০০০ কি ৫০০০০০০ বৎসর পরে আর পৃথিবীতে প্রাণী থাকিবে না। পৃথিবীর তখন কি অবস্থা হইবে এবং কি প্রকার জীবের বাসভূমি হইবে কে বলিতে পারে।

আসামের পার্ব্বত্যজাতি।



বঙ্গের উত্তর পূর্ব্বে আসাম প্রদেশ। এই স্থান পর্ব্বতময়। নাগা, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পর্ব্বতের কথা ভূগোলে পাঠ করিয়া থাকিবে। এই সকল পর্ব্বতে ভিন্ন ভিন্ন অসভ্যজাতির বাস; তাহাদের মধ্যে আকা ও নাগা জাতিই প্রধান। এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে শীত গ্রীষ্মের-আধিক্য নাই।

নাগারা প্রতিবাসী অন্য স্থানের লোকদের সহিত বড় একটা মিশিতে চায় না। ইহারা পর্ব্বতে উচ্চ প্রদেশে ঘর বাঁধিয়া বাস করে। অসভ্যজাতি বলিলেই যেন কুৎসিত কদাকার একটা চেহারা মনে হয়। নাগারা অসভ্য হইলেও দেখিতে মন্দ নহে। স্ত্রী-লোকেরা রূপবতী; মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি।

নাগাজাতি সাহসী, রণ নিপুণ ও বড় বিবাদপ্রিয়। বিবাদের সময়ে কাহাকেও অব্যাহতি দেয় না। শত্রুর বালক, এমন কি বৃদ্ধ ও স্ত্রী-লোকও মানে না; ইহাদিগকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দোষ ক্ষমা করিতে জানে না; বিবাদ চিরকাল মনে পুষিয়া রাখে। সুবিধা পাইলেই প্রতিশোধ লয়। ইহাদের বিশ্বাস, শত্রু বধ করিতে পারিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন; ইহলোকে যশ ও পরলোকে সদ্গতি হয়।

রাত দিন ইহাদের বিবাদ, কথায় কথায় বিবাদ। ঘাড় ভাঙ্গিয়া বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিতে না পারিলে ক্রোধের শান্তি হয় না। এক একজনার বাড়ী একটী একটী দুর্গ। পাহাড়ের গায়ে অতি সঙ্কীর্ণ পথ—অতি কষ্টে একজন চলিতে

পারে—এরূপ দুর্গম গিরি পথে ইহাদের বাস। এইরূপ স্থানে বাসের কারণ ইহাদের স্বভাব চরিত্রের উপর নির্ভর করে। ইহারা কাহারও সহিত বড় মিশিতে চায় না। বড় বিবাদ-প্রিয়



ও জিঘাংসা প্রবৃত্তি বড় প্রবল, তাই দুর্গম স্থানে কেল্লার মত ঘর বাড়ী না করিয়া উপায় নাই।

ইহাদের ঘরগুলি বাঙ্গালা দেশের কুঁড়ের মত, বাঁশে ও কাঠে নির্ম্মিত। এক একটী কুটীরে দুই তিনটী কুঠরি থাকে। মধ্যের প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে অগ্নি জ্বালাইবার কুণ্ড, তাহার চারিদিকে তক্তা পাতা থাকে, ইহাই বসিবার আসন ও শুইবার খাট। পিছনের কুঠরিতে ভাত পচাইয়া মদ তৈয়ার করিবার বড় একটা গামলা পোতা। আর কিছু না হউক মদটা চাই। মদ না হইলে চলে না। অনেকে মনে করেন সভ্যতার উন্নতিতে মদ্যপানের ব্যবস্থা ও প্রচলন। সেটা ভুল, যাহাদের

মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে নাই, যাহাদের মধ্যে সভ্যজাতি পদার্পণ করে নাই, তাহাদিগকেও মদ্যপান করিতে দেখা যায়। প্রায় সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই মদ্যপানের প্রচলন দেখা যায়। তবে সে মদ, ব্রাণ্ডি, বা 'হুইস্কি' নহে।

ইহাদের পাণপাত্র গরু বা মহিষের শিঙ্গ, অথবা বাঁশের চোঁঙ্গ। চোঁঙ্গে মদ ঢালিয়া নল দিয়া টানিয়া পান করে, কেহ কেহ বাঁশ বা কাঠের চামচে করিয়া 'চা' পানের মত মদ্যপান করে।

ইহাদের কুটীর প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীরে অথবা বড় বড় বাঁশের বেড়ায় ঘেরা। প্রাচীরের বা বেড়ার বাহিরে দুই তিন হাত গভীর। সেই গর্ত্তে বাঁশের তীক্ষ্ণ গোঁজ পোতা, উপরে অল্প অল্প মাটি ও ঘাস পাতা দিয়া ঢাকা। শত্রুরা গৃহ আক্রমণ করিতে আসিলে সেই গর্ত্তে পড়িয়া যায় ও বাঁশের গোঁজে দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

নাগাদের মধ্যে আবার অনেক জাতি বিভাগ আছে। এক এক জাতির এক একটী পৃথক পল্লি। প্রত্যেক পাড়া উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা।

নাগাদের মধ্যে কোন কোন জাতি একেবারেই কাপড় পরে না। কোন কোন জাতি সামান্য মাত্র কৌপীন পরে—সে কাপড়ও নিজে বয়ন করে, সেই কৌপিনে আবার কড়ি বসাইয়া সুন্দর করে। নৃত্যগীত ও যুদ্ধের সময়ে সাজ সজ্জার একটু আড়ম্বর দেখা যায়। গাঢ় নীলবর্ণ চাদরের দুই ধারে লাল ও হরিদ্রা পাড়, সেই চাদর পিঠের উপর দিয়া বুকে বাঁধা থাকে।

পুরুষের মাথার সম্মুখদিকে ছোট ছোট ও পশ্চাদ্দিকে বড় বড় চুল; সম্মুখের ছোট চুলে সীঁথা কাটে, কেহ কেহ বা কপালের উপর ঝুলাইয়া রাখে। বড় চুলে চূড়া বাঁধে, সেই চূড়ায় পাখির পালক গুঁছিয়া দিয়া বাহার করে। কণ্ঠের ভূষণ হাড়ের মালা, কর্ণের ভূষণ লাল পশমের থোবা অথবা সবুজ পোকার পালক, কেহ কেহ কাঁসার মাকড়ীও পরে, হাতে বেতের বলয় ও বাজু, অবিবাহিতা বালিকা সমস্ত মাথা পরিষ্কার করিয়া কামায় তাহাদের চুল রাখিতে নাই। বিবাহের পর চুল রাখে। ইহাদের অস্ত্র দা ও বর্শা; ঢাল তক্তা বা বাঁশের কাঠাম, ব্যাঘ্র বা হস্তী চর্ম্মে আচ্ছাদিত। ইহারা পালকে ও লোমে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিতে ভালবাসে।

জীব মাত্রেই নাগাদের উপাদেয় খাদ্য। কুকুরেব মাংস সুখাদ্য, কোন দ্রব্যেই অরুচি নাই, কেবল দুধ দেখিলে ইহাদের বমি আসে।

বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কলাপে উদর পুরিয়া মদ্য মাংসের ব্যবস্থা করিলেই খুব ঘটা করা হইল। মৃত দেহের সহিত মদ, মুর্গী, অস্ত্র ও কাপড় পুতিয়া দেয়। শব পোতা হইলে সকলে গোরের উপর কতকগুলি পাতা বিছাইয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া দেয়। ইহাদের বিশ্বাস ভাল লোকেরা মৃত্যুর পর আকাশের নক্ষত্র হয়। অসভ্য জাতি সাধারণের ন্যায় ইহাদেরও বিশ্বাস যে নদীতে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় একটী একটী স্বতন্ত্র দেবতা অধিষ্ঠিত। আকা মিশ্মী ও নাগা জাতি দেখিতে অনেকটা একরূপ। ইহাদের মুখ গোল ও চেপ্টা নাক মোটা, চোখ ছোট, গালের হাড় উচু। গায়ের রং চীনেদের মত ঈষৎ তাম্রবর্ণ। আকাদের সহিত মিশ্মী কন্যার আদান প্রদান চলে। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর অসভ্যের নিকট তাহাই দেবতা। পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া, স্রোতস্বিনী নদী, হিংস্র বন্যপশু পূর্ণ নিবিড় জঙ্গল, এইগুলিই আকা ও নাগাদের দেবতা।

আকাদের ঘর বাড়ী নাগাদের মত। ইহারা ধনুর্ব্বান লইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। হস্তী প্র

বৃহৎ জন্তু শীকার করিতে হইলে তীরে বিষ মাখাইয়া দেয়। ইহারা পার্ব্বত্য নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তির্ব্বৎ, ভুটান, সিকিম ও নিম্ন প্রদেশে বাণিজ্য করিতে আইসে। যাইবার সময়ে তাম্র ও কাঁসার পাত্র ও বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। ইহারা সর্ব্বাঙ্গ উল্কীতে চিত্রিত করে। নাগাদের ন্যায় কণ্ঠে হাড় ও কাষ্ঠের মালা ধারণ করে। মাথায় পাখীর পালক গোঁজে ও কৌপিন পরে।

প্রত্যেক আকা গৃহস্থ বিস্তর গরু পোষে, গো-মাংস পবিত্র বলিয়া ভোজন করে, কিন্তু গো-দুগ্ধ বড় অপবিত্র। গো-দুগ্ধ স্পর্শ করে না। গো-মাংস খায়। গো-দুগ্ধ পান করে না শুনিয়া তোমরা হাসিবে। তোমরা গো-দুগ্ধ পান কর গো-মাংস স্পর্শ কর না শুনিয়া তাহারা হাসে। শূকর, কুক্কুট ও পায়রা ইহাদের প্রধান খাদ্য। নাগাদিগের নিকট কুকুর উপাদেয় খাদ্য। আকাদিগের কুকুর ভক্ষণ নিষিদ্ধ; হংসও নিষিদ্ধ। নাগাদিগের ন্যায় ইহারাও মৃত দেহ কবর দেয়।

এই সকল পার্ব্বত্য জাতি ইংরাজাধিকৃত স্থানে আসিয়া উৎপাত করিত বলিয়া মধ্যে মধ্যে ইংরাজদের সহিত ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ইংরাজদের বল বিক্রম অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছে, ও ক্রমেই সভ্য জাতির সংসর্গে আসিয়া উন্নত হইতেছে। এখন তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লমের পরিবর্ত্তে বন্দুক ও পিস্তল ব্যবহার করিতে অভিলাষী। পাখীর পালকের ও ভল্লুকের লোমের পরিবর্ত্তে নানা বর্ণের কাচ ও ধাতু নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইতে প্রয়াসী। বল্কল ও সামান্য নেংটীর পরিবর্ত্তে বিস্তৃত বস্ত্র খণ্ডে শরীর আচ্ছাদনে যত্নবান হইতেছে। ইংরাজের যত্নে ইহাদের স্কুল স্থাপিত হইতেছে।

ঠগের কাহিনী।

(৬২ পৃষ্ঠার পর)

একটী গর্ত্ত খনন করিয়া গর্ত্তস্থ জল দ্বারা কোদালী ধুইয়া চিনি, জল, দধি, সর্ব্বশেষে দ দ্বারা স্নান করায়। সিন্দূরের সাতটী ফোঁটা দিয়া আবার পিত্তল পাত্রে রাখে। নারিকেল, পান, গুগ্‌গুল, তিল, চন্দন, চিনি, তাহার সঙ্গে দেয়। বট, আম কাঠ ও গোময়ের আগুন জ্বালাইয়া নারিকেল ভিন্ন সমস্তই তাহাতে নিক্ষেপ করে। যখন আগুন জ্বলিতে থাকে তখন আগুনের ভিতর শাতবার কোদালিকে প্রদক্ষিণ করায়। নারিকেলের ছোবড়া ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে কোদাল লইয়া জিজ্ঞাসা করা হয় "কাটবি কি?" সকলে এক সঙ্গে বলে "হাঁ"। "সকলের জননী কালী মার জয়" বলিয়া কোদালের ধারহীন দিক দিয়া নারিকেল ভাঙ্গা হয়। সকলে এক সঙ্গে বলে "দেবীর জয়, ঠগদের মঙ্গল হউক।" যদি একবারে নারিকেল না ভাঙ্গে, সমস্ত বৃথা যায়। ভাঙ্গা নারিকেলের কতকাংশ আগুনে ফেলিয়া, এক খানা পরিস্কার শ্বেত নূতন বস্ত্রে কোদালি বাঁধিয়া পশ্চিম দিকে রাখা হয়। সকলে পশ্চিম মুখ হইয়া কোদালি পূজা করে। বাকি যাহা কিছু থাকে গর্ত্তে ফেলিয়া গর্ত্ত বন্ধ করা হয়। এইরূপে কোদালি পূজা শেষ হয়।

দক্ষিণ দিকে যেসকল শুভ চিহ্ন বলিয়া মনে করা হয় যদি বাম দিকে সেই সকল চিহ্ন দেখা যায় তাহা হইলে আবার পূজা করিতে হয়। এই উৎসর্গের পর তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ, পবিত্র চিত্ত এবং সতর্ক তাহাকে কোদালি রাখিতে

দেওয়া হয়, গঙ্গাজল তুলসী পাতা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করা অপেক্ষা কোদালি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাকে ইহারা অধিক পবিত্র মনে করে। দলের মধ্যে সকলেই কিছু সমান হইতে পারে না। যাহার নিকট কোদালি থাকে সে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করে। যাহারা চিতাস্থান ঠিক করে, তাহাদের স্থান দ্বিতীয়। যাহারা বহুদর্শী এবং বুদ্ধিমান তাহাদের উপরই এই সকল ভার অর্পিত হয়। ঘাতকের নাম "ভরতোত"। যে অনেক দিন কাজ করিয়াছে, যাহার খুব সাহস আছে ও হৃদয় কঠিন হইয়াছে; সেই একাজ করিতে পারে। যাহারা নূতন, তাহাদিগকে প্রথম চর, তার পর চিতা খনক, তারপর "সামিষা" অথবা হাত ধারক নিযুক্ত করা হয়। এই সকল কাজ করিয়া যখন দক্ষ হয়, এবং হৃদয় খুব কঠিন হইয়াছে বলিয়া বোধ করে, তখন ইহাদের মধ্যে যে বৃদ্ধ সে গুরু হইতে পারে। গুরু কোন এক স্থানে নিদ্রিত অবস্থায় পথিককে দেখিয়া, চেলা এবং আরও দুই একজন ঠগকে গিয়া বলে হে কালী, নর ভক্ষকিণী, দানব দলনী হে কালী মহা করালী, কলিকাতাবাসিনী যদি তোমার ইচ্ছা হয় এই দাসের হাতে পথিকের মৃত্যু হইবে তবে শুভ চিহ্ন দেখাও। যদি শুভ চিহ্ন দেখা যায় তবে গুরু একখানা রোমাল হাতে নিয়া একটি টানা বাঁধিয়া শিষ্যকে দেয়। শিষ্য বিনিত ভাবে রোমাল গ্রহণ করিয়া একজনকে সঙ্গে নিয়া, সেই স্থানে যায়। পথিক ব্যক্তিকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া শিষ্যের প্রতি সঙ্কেত করে, শিষ্য অমনি দড়ি লাগাইয়া বধ করে। সঙ্কেতগুলি বড়ই আশ্চর্য্য, কেবল তাহারাই বুঝিতে পারে, যথা "চিণচিণি, "ছকাবিলত" "ঐ হো গাড়ী চালাও"। বধ কার্য্য সমাধান করিয়া গুরু ও অন্যান্যদিগকে প্রণাম করে, শুভ চিহ্ন দেখিয়া বন্ধন খোলে, টাকা এবং যাহা কিছু তাহার নিকট থাকে তাহা গুরুকে অর্পণ করে। পাঁচসিকার গুড় কিনিয়া "তপনি" করে। তপনি এক প্রকার পূজা, নিম অশথ এবং আম গাছের নিম্নে এ পূজা হয়। যাহারা স্বহস্তে বধ করিয়াছে তাহারাই শুধু এই পূজায় যোগ দিতে পারে।

যাত্রার সময় ঠগগণ শুভ চিহ্ন গ্রহণ করে। তাহাকে "জিতনা" বা জিতৈপুর বলে। গুরু এক জন দলপতি এবং চার জন ঠগ এক কম্বলে বসে। চাউল, গম, এবং দুইটী পয়সা পিতল পাত্রে রাখিয়া গুরুকে দেওয়া হয়, এবং শুভ দিনে এক ঘটি জল পূর্ণ করিয়া দলপতি জোড় হাতে, একটী বিশেষ স্থানে যাইয়া এই প্রার্থনা করে, "হে বিশ্ব জননী মহা দেবী, আমাদের এই যাত্রা যদি তুমি মঙ্গল জনক মনে কর, তবে আমাদের এই ভিক্ষা, তোমার শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন কর"। তাহাদের মতে, পথের দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে শৃগালের গমন, উড়িবার সময় চিলের শব্দ, ব্যাঘ্রের দক্ষিণ দিক হইতে বামদিক গমন, যাত্রার সময় বাম দিকে গাধার ডাক, গর্ভবতী স্ত্রীলোক দর্শন, কলসী পূর্ণ স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ এগুলি শুভ চিহ্ন। অশুভ চিহ্ন যথা—মৃতের জন্য রোদন শ্রবণ, শুকর, মহিষ, শবের উপর বসিয়া কাকের ডাক, হাতি ও খরগোষের শব্দ, কোন ব্যক্তির মৃত দেহ দর্শন, তেলী, ছুতার, কুমার, অন্ধ, খোঁড়া, ফকির, সন্ন্যাসী, জটাধারী, অপূর্ণ কলসী, পেঁচার ডাক, সারসের ডাক, কুকুর, শৃগাল ও বাঘের ডাক প্রভৃতি। ইহাদের কালীর প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস যে কালী সহায় থাকিলে মানুষ তাহাদিগকে কিছুই করিতে পারিবে না। তাহারা, যে নৃশংস কার্য্য করে কালীর আজ্ঞায় সে সমস্ত সম্পন্ন করিয়াছি

বলিয়া মনে করে। ধর্ম্মের নামে মানুষ কি নিষ্ঠুর হইতে পারে? কিরূপ হীন ও নীচ কার্য্য করিতে পারে ঠগদিগের জীবনে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠগদিগের কার্য্যক্ষেত্র কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ ছিল না, সিন্ধু নদী হইতে কুমারিকা অন্তরিপ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তাহাদের গতায়াত ছিল। অসীম সাহসিক লোকও তাহাদিগকে দেখিলে ভয়ে কম্পিত হইত। সে সময়ে পথিকের সহিত যাহার সঙ্গে দেখা হইত তাহাকেই সন্দেহ করিত, আপনার দলের লোককে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়াছে ঠগ পথিকের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, আহার করে একত্রে, নিদ্রাযায় একত্রে, সন্দেহের কোন কারণই নাই, হঠাৎ যেই একদিন সুযোগ সুবিধা পাইল অমনি বধ করিল। এমনি নীরবে, এমনি গুপ্ত ভাবে তাহারা কার্য্যসিদ্ধি করিত যে এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন বা একখানা ছেঁড়া কাপড় বা অন্য কোন চিহ্নই কেহ দেখিতে পাইত না। উহাদের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার যো ছিল না। একবার হাতে পড়িলে কাহারও আর পলাইবার শক্তি থাকিত না, এমনিই আশ্চর্য্য। সকল স্থানেই একরূপ ব্যাপার দেখা যায়। আপন আপন কাজে সকলই এমন সুচতুর, ঠিক যেন যন্ত্রেরন্যায় নীরবে আপন কাজ করিয়া যাইত। তাহারা মানুষের প্রাণ নিয়া খেলা করিত, কিন্তু কষ্ট দিয়া মারিত না। বিশেষতঃ রমণীর প্রতি তাহাদের অনুগ্রহ ছিল। রমণী বধ করা পাপ মনে করিত। যদি কখনও রমণী বধ করিত তবে সে কেবল বাধ্য হইয়া করিত, রমণীরা বধের সাক্ষ্য দিবে ভয় করিয়া তাহাদিগকে বধ করিত। কিন্তু একাজ অন্যায়, দেবী ইহাতে অপ্রসন্ন হন এই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। ঠগদিগের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। একজন হয়ত সদাগর—কাপড়ের ব্যবসা করে, আর একজন কৃষক, হাল চষে, আর এক জন ব্রাহ্মণ চাকরী করে, প্রভুর নিতান্ত বিশ্বাসী ধন রত্ন সকলই তাহার হাতে কেহ তাহাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিত না, তাহারা অন্যান্য সদাগরের ন্যায় গ্রামে কাপড় বেচিতে যায়। চাষা বিবাহে আত্মীয়ের বাড়ী যায়, ব্রাহ্মণ এক দুই মাসের বিদায় নিয়া বাড়ী যায়। আর এক জন ক্ষত্রিয়, কোন রাজার সৈন্যের জমাদার দূর দেশে তাহার ভাই আছে, তাহাকে দেখিবার জন্য বৎসরে এক দুই মাসের বিদায় নেয়। তারপর এই ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোক গুলি মিলিয়া এইরূপে মানুষের প্রাণ হরণ করে। সুতরাং ঠগ ধরিবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ গ্রামের লোক জানিলেও ভয়ে কিছু বলিত না। জমিদারগণ বরং সাহায্য করিত। মানুষ নিরাপদে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিত না। এই সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহাও কি আবার বলিতে হইবে? সৈন্যেরা বিদায় নিয়া দেশে যাইতে, পথে প্রাণ হারাইত। ১৮২০খৃঃ অব্দে এক দল ঠগ নর্ম্মদা পার হইতেছিল এমন সময় জেনারেল এডাম তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে দেড় শত ঠগের এক দল নর্ম্মদা পার হইতে ছিল কাপ্তান স্লিমেস তাহাদিগকে শাস্তি দেন। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে তখনকার গবর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঠগি নিবারণের জন্যে কাপ্তান স্লিমেন, কাপ্তান বাউর্ডড, কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট এবং মিষ্টার স্মিথ নামক চার জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তাহাদের চেষ্টায় দলে দলে ঠগ ধরা পড়িতে লাগিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে দুইহাজার ঠগ ধরা পড়ে। তন্মধ্যে তিনশত বিরাশি জনের ফাঁসি

হয়, নয়শত নয় জন দ্বীপান্তরিত এবং শাতাত্তোর জনের আমরণ মেয়াদ ও অন্যান্যদের কয়েদ এবং কেহ কেহ গবর্ণমেন্টের পক্ষে সাক্ষী হইয়া খালাস পায়। ইহর পর যদিও প্রায় দুই হাজার ঠগ ধরা পড়ে নাই, কিন্তু তাহারা ঠগি ব্যবসা ছাড়িয়া ডাকাইতি করিত। এখন আর ঠগ নাই, ডাকাইত আছে। এখন এ দেশে ঠগি নিবারণী বিভাগ বলিয়া একটী বিভাগ আছে। ঠগদের আত্ম কাহিণী অতি বিস্ময়কর ও হৃদয় বিদারক। পাপীদের পাপ কাহিণী বলিয়া আর সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে ত্যক্ত করিতে চাই না। এই সকল ঠগ স্থলে মানুষের প্রাণ হরণ করিত। বাঙ্গলা দেশে এক প্রকার নদীঠগ বলিয়া ঠগ ছিল। তাহাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার ছিল। নবেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে তাহারা নৌকা করিয়া গঙ্গায় বিচরণ করিত। প্রত্যেক নৌকায় ১৪ জন মাঝি থাকিত, সকলেই ঠগ। নদীর তীরে গুণ টানিয়া যাইত। পথিক দিগকে ভুলাইয়া নৌকায় উঠাইত, পথিকেরা তাহাদের ভদ্রবেশ দেখিয়া তীর্থযাত্রী মনে করিত। তাহারা অমনি সঙ্কেত দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিত। স্ত্রীবধ করা তাহারাও ভয়ানক পাপ মনে করিত। মানুষ মানুষের যেমন শত্রু হিংস্র জন্তু, সেরূপ হইতে পারে না। দেখ, এক মানুষ ধর্ম্মবলে, চরিত্র বলে দেবতা হয়, অন্যের কষ্ট দেখিলে চক্ষের জল ফেলে, অন্যের জন্য আপনার স্বার্থ সুখ সকল বিসর্জ্জন করে, অন্যের উপকারের জন্য জীবন পর্য্যন্ত দান করে। আবার দেখ সেই মানুষই কতদূর হীন ও নীচ হইতে পারে, এক-ভাই আর এক ভাইকে বধ করিয়া সুখ লাভ করে। মানুষের চরিত্র, ধর্ম্ম শিক্ষা ও সংসর্গের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্ম যত উন্নত, যত পবিত্র হইবে, মানুষও তত উন্নত ও পবিত্র হইবে। সৎ শিক্ষা ও সৎ সংসর্গে মানুষ উন্নত হয়, অসৎ শিক্ষা ও অসৎ সংসর্গে মানুষ পশু অপেক্ষাও অধম হয়।



কিষণজীর উইল।

(৫৯ পৃষ্ঠার পর)

৫

ব্যাপারটা কি ইহা মিমাংসা না করিতে পারিয়া মনটা ভারি কেমন হইয়া আছে, এমন সময় দেখিলাম এক জন লোক একটী বালিকার হাত ধরিয়া আমাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলাম লোকটী ভদ্র হিন্দুস্থানীর ন্যায় বেশ, এবং দেখিয়া বোধ হইল যেন বহু দূর হইতে আসিতেছে। ভদ্র লোকের মত বেশ হইলেও লোকটীকে দেখিয়া (কেন জানি না) আমার কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। আমরা কোন কথা না বলিতেই সে বারাণ্ডায় আসিয়া উঠিল এবং আধ-বাঙ্গালা আধ-হিন্দিতে আমাকে বলিল—বাবুজী আপনারা এই বাড়ীতে আছেন ভালই হইয়াছে। এ বাড়ীটী আমার পিতা কিষণজীর, তিনি আপনাদের বাঙ্গালা মুলুকে থাকিতেন, সেই দেশে তাঁহার কারবার ছিল। আজ এক মাস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় আমি কার্য্য গতিকে মথুরায় ছিলাম। মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াই সেখানে যাই,

পিতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি শেষ হইয়া গেলে, এক দিন তাঁহার সমস্ত কাগজ পত্রাদি দেখিতে দেখিতে এক খানি কাগজ দেখিলাম লেখা রহিয়াছে ;—অযোধ্যায় আমার যে বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে আমার উইল আছে, আমার মৃত্যু হইলে আমার পুত্র হিরারাম মুলুকচাঁদ সেই উইল বাহির করিয়া সেই অনুসারে আমার সম্পত্তি ভোগ করিবে। বড়ীর বারাণ্ডায় এক খানি পাথরে বাঙ্গালা অক্ষরে আমার পুত্রের নামের প্রথম দুইটী অক্ষর "হি" এবং "মু" লেখা আছে, সেই পাথর খানি হইতে উভয় দিকে দশ খানি পাথর গনিয়া গেলে ঘরের মেঝেতে যে পাথর খানি পাওয়া যাইবে, তাহা উঠাইলে আমার উইল পাওয়া যাইবে, আমি সেই কাগজের লিখিত কথা যে দিন পড়িয়াছি সেই দিনই রওনা হইয়াছি; আমার আর কেহই নাই, এই কন্যাটী মাত্র, ইহাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। উইল লইয়া আজই আমাকে পুনরায় চলিয়া যাইতে হইবে। 'এই বলিয়া আমাদের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়াই লোকটা সেই লিখিত পাথরখানা হইতে দশখানা পাথর গণিল, এবং ঘরের মেজের একখানা পাথর উঠাইয়া তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি ছেড়া কাগজ পত্র বাহির করিয়া দেখিল, সত্য সত্যই একখানা বেশ যত্নের সহিত রক্ষিত কাগজ। উহা বাহির করিয়া আমাদিগকে বলিল, এই আমরা উইল পাইয়াছি। এই বলিয়া আবার সেই পাথর যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া আমাকে এক সেলাম করিয়া দ্রুতপদে বালিকাটীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। বালিকাটী সমস্ত সময়টা বিষণ্ণ ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন যায় তখন যেন আমার বোধ হইল নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত যাইতেছে।

৬

একটা খট্‌কা ভাঙ্গিল। "হি" ও "মু" জিনিষটা কি বুঝিলাম। কিন্তু আজকার এই ব্যাপারটার আমার মনের মধ্যে বড় কেমন একটা সন্দেহ দাঁড়াইয়া গেল। সরযূ হইতে স্নান করিয়া সকলে বাড়ী আসিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে এবিষয় সে দিন আর কিছু বলিলাম না। কারণ লছমন আর আমি পরামর্শ করিয়াছিলাম যে পাথর খানা আমরাও একবার উঠাইয়া দেখিব ব্যাপারটা কি? তার পর বাড়ীর আর সকলকে বলিব। সেদিন অমনি কাটিল, তার পরদিন সকালে আবার যখন সরযূতে স্নান করিতে গেলেন তখন নির্জ্জন পাইয়া সহচরকে ডাকিলাম এবং অনেক কষ্টে পাথর খানা উঠাইয়া দেখিলাম। ভিতরে হাত দিতে প্রথম একটু ভয় হইতে লাগিল, লছমন হিন্দুস্থানির ছেলে বাঙ্গালীর ছেলের অপেক্ষা সাহস একটু বেশী, সে হাত দিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ পত্র ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। লছমন বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। তখন আমি একবার হাত দিলাম। খুব ভিতরের দিকে হাত প্রবেশ করাইয়া দেওয়াতে কি যেন কঠিন হাতে ঠেকিল, আমি সেই বস্তুটাকে হাতে করিয়া উঠাইলাম। উঠাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমাদের চক্ষু স্থির হইল ; দেখিলাম এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা। আমার মনে কৌতুহল জন্মিল পুনরায় হাত দিলাম এবার এক ছড়া হীরার হার।

ক্রমশঃ





জুন, ১৮৯২।



বিবিধ।

কিছু দিন হইল ময়মনসিং জেলায় নাগপুরে একটী আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে। একদিন বৈকালে—বৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন ঠাণ্ডা বাতাস বহে তেমনি—খুব ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে। তারপর অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি থামিয়া গেলে ভয়ানক উষ্ণ বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়। ঐ বায়ু এত উষ্ণ ছিল যে, তৃণ শস্য ও চারা গাছগুলি একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে। শুনা যায় ঐ সময়ে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল! প্রকৃতির অদ্ভুৎ কাণ্ড!

*
* *

চীন দেশে অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ আছে শুনা যায়। স্যাংহাই নগরে একটি সেতু আছে, শুনা যায় সেতুটি লম্বায় সওয়া পাঁচ মাইল এবং তাহার তিন শত খিলান আছে। প্রত্যেক খিলানের স্তম্ভে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটি করিয়া সিংহের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে; এই মূর্ত্তি গুলি লম্বায় প্রায় বার ফিট। হুমুরে চীন চিরপ্রসিদ্ধ।

*
* *

প্রাণিতত্ত্ব-বিদেরা বলেন যে কাক যদি বৃক্ষের খুব উচ্চ শাখায় বাসা বাঁধে তবে সে বৎসর বৃষ্টি কম হইবে, কিন্তু নিম্ন শাখায় বাসা বাঁধিলে বুঝিতে হইবে যে, সে বৎসর বৃষ্টি খুব বেশী হইবে।

*
* *

পাওয়া গে[illegible] [illegible] হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭,৫৭০০০ টাকার দেশালাই এ দেশে আমদানী হয়। তার পূর্ব্ব বৎসর ৬,১০০০০ টাকার দেশালাই আসে। ভাবিয়া দেখ দেশের কত টাকা এই সামান্য দেশালাইর জন্য বিদেশে যায়। সুখের বিষয় দুটী দেশালাইর কারখানা শীঘ্রই দেশীয় লোকের দ্বারা এখানে খোলা হইতেছে। দেশের অনেক টাকা এখন দেশে থাকিয়া যাইবে এমন আশা করা যায়।

*
* *

ফ্রান্সে দুই হাত লম্বা এবং ত্রিশ সের ওজনের একটী ব্যাং পাওয়া গিয়াছে। শুভক্ষণে ব্যাংটীর জন্ম হইয়াছিল; একজন ধনী নাকি ইহাকে আট শত টাকা মূল্যে কিনিয়া রাখিয়াছেন। ব্যাং-জন্ম স্বার্থক হইয়াছে।

*
* *

সাহাবাদ জেলায় ডোমরাওঁর প্রয়াগরাম স্বর্ণকার একটী কল প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার মধ্যে মূর্ত্তি সহিত এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের গৃহ কার্য্যের

একটী সম্পূর্ণ চিত্র দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী-মূর্ত্তিগুলি এক একটি দুই ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও মূর্ত্তিগুলির চেহারা ও ভাব ভঙ্গি বেশ সুন্দর এবং স্বাভাবিক হইয়াছে। কোন রমণী অন্দরে বসিয়া সূতা কাটিতেছে, কেহ ধান ভানিতেছে, কেহ চাউল ঝাড়িতেছে, কেহ রান্না করিতেছে, এই প্রকারে সকল প্রকার গৃহ কার্য্যেরই দৃশ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটী কলদ্বারা এই সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে। কল চালাইয়া দিলেই মূর্ত্তিগুলি আপন আপন কার্য্য আরম্ভ করে। হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া মাথা ঘুরাইয়া চোখ ঘুরাইয়া মূর্ত্তিগুলি যখন আপন আপন কাজ করিতে থাকে তখন বড়ই সুন্দর দেখায়। মহারাণীকে এই আশ্চর্য্য শিল্প জিনিষটী উপহার দিবার জন্য নির্ম্মাতা প্রয়াগরাম অনুমতি চাহিয়াছিল; মহারাণী উপহার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রয়াগরাম কলটী লইয়া কলিকাতা আসিয়াছে। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে এ প্রকার শিল্প-নৈপুণ্যের কথা এখন আর শুনা যায় না। প্রয়াগরামের গুণের উপযুক্ত পুরস্কার হওয়া উচিত।



কিষণজীর উইল।

৮০ পৃষ্ঠার পর।

পরে দেখিলাম সেই গর্ত্তের মধ্যে সেই প্রকার বহু গহনা এবং টাকা ও মোহরও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। গহনা গুলি যেমন ছিল তেমনিই আবার রাখিয়া দিলাম, তাহার উপরে সেই ছেঁড়া কাগজ পত্র গুলি চাপা দিলাম, তাহার উপর পাথর খানি যেমন ছিল তেমনি বসাইয়া দিলাম। পাথর খানা চাপা দিয়া উঠিয়াছি এমন সময় দেখি সেই বালিকটী একাকী আমাদের বাড়ীর দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। কৌতুহল বশতঃ আমরাও অগ্রসর হইলাম। বালিকা নিকটে আসিয়াই অতি কাতর ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আপনারা আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।" বালিকার কাতরতা দেখিয়া আমরা মনে করিলাম বুঝি তাহার পিতার কোন বিপদ হইয়া থাকিবে। আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পিতা কোথায় এবং কি হইয়াছে, সে বলিল যে, সে লোকটা তাহার পিতা নহে, তাহার পিতা মাতা বৃন্দাবন যাইতেছিলেন, পথে দস্যুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। তাহার পিতামাতা কোথায় গিয়াছেন, তাঁহারা জীবিত আছেন কি তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহাও সে জানে না। দস্যুরা যখন আক্রমণ করে, তখন সে নিদ্রিত ছিল, গোলমালের সময় কে কোন দিকে গিয়াছে তাহা সে কিছুই জানে না। এই লোকটা তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে, এও এক জন দস্যু, বোধ হয় সেই দলের দলপতি। বালিকার কাহিনী শুনিয়া আমাদের ক্রমেই কৌতুহল আরও বাড়িয়া গেল। আমরা তাহাকে বলিলাম যে, তাহার কোন ভয় নাই, আমরা তাহাকে আমাদের বাড়ীতে রাখিব। তার পর সেই লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করায় বালিকা বলিল যে, নিকটস্থ একটা পর্ব্বত গুহা মধ্যে সে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমরা কৌতুহল বশতঃ সেই খানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু বালিকা বারম্বার আমাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিল। তাহার নিষেধ না শুনিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

৮

যাইয়া দেখি একটা গুহার মধ্যে লোকটা সত্য সত্যই মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উঠিবারও শক্তি নাই। আমাদিগকে দেখিয়া সে রাগে কাঁপিতে লাগিল, উঠিবার সামর্থ্য নাই, তবুও উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে এই লাভ হইল যে,সে আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমরা নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, একটা গুলি তাহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অজস্র রক্তপাতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বুঝিলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে। লোকটা কাতরকণ্ঠে একবার একটু জল চাহিল, আর কথা কহিতে পারিল না। আমরা তাহাকে একটু জল দিলাম, সেই জলটুকু খাইয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল—আর চক্ষু মেলিল না। বালিকার নিকট শুনিলাম যে লোকটার কোমরে একটা পিস্তল বাঁধা ছিল। বালিকাটী খুব কাঁদিতেছিল বলিয়া যেমন তাহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইয়াছে অমনি হঠাৎ সেই পিস্তল আওয়াজ হইয়া তাহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে। অসতের পরিণাম দেখিয়া আমরা বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময় সেই কাগজ খানির প্রতি আমার চক্ষু পড়িল। কাগজ খানা লোকটার মৃত দেহের পাশেই পড়িয়া ছিল। কাগজ খানা কুড়াইয়া লইয়া বাড়ী আসিলাম। বাড়ী আসিয়া দেখি সকলে বাড়ী ফিরিয়াছেন। আমাদিগকে না দেখিয়া তাঁহারা মহা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। সুতরাং বাড়ী যাইয়া প্রথমেই কিছু তিরস্কার খাইলাম। তার পর সমস্ত ব্যাপার তাঁহাদিগকে বলিলে আর তাঁহারা তিরস্কার করিলেন না। আগ্রহ ও কৌতুহলের সহিত সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন। তার পর কাগজখানা খুলিয়া দেখা গেল যে সেখানা উইল নয় বটে, কিন্তু সেই গুপ্ত গর্ত্তের মধ্যে যে সমস্ত অলঙ্কার ও ধন রত্ন আছে তাহার একটী তালিকা। শেষে বুঝা গেল যে লোকটা একটা দস্যু দলের দলপতি। সে দস্যুবৃত্তি করিয়া বহুমূল্য লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি এইখানে লুকাইয়া রাখিয়া যাইত, স্থানটা এবং বাড়ীটী নির্জ্জন ছিল, এখানে বড় কেহ আসিত না, তাই জিনিষগুলি রাখিবার তাহার বেশ সুবিধাও ছিল।

যাহা হউক বালিকাটীকে আমরা আমাদের বাড়ীতেই আশ্রয় দিলাম। তাহার পিতা মাতার অনেক অনুসন্ধান করা গেল কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কাজেই বালিকা আমাদের বাড়ীতেই রহিল। কিষণজীর উইলের সমস্ত ধন রত্ন বালিকার হইল, বালিকাই আজ কিষণ জীর উইলের উত্তরাধিকারিণী।



নীতির সঙ্কেত।

আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ এই 'সখাতে' কত নীতি বিষয়ের গল্প ও উপদেশ পড়িয়াছ ও অন্যান্য স্থানে কত শিক্ষা পাইয়াছ তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব;— মনে ভাবিয়া বল দেখি সেই শিক্ষা অনুসারে কাজ করিতে পার কি? তোমাদের মধ্যে

যাঁহার যে দোষ বা কুঅভ্যাস ছিল তাহা কি সারিয়াছে? সদুপদেশ ও নীতিশিক্ষা যাহা পাইয়াছ তাহার ফল কি জীবনে দর্শিয়াছে বুঝিতে পার?

ধীর ভাবে নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে যে, কত বিষয় ঠিক বুঝিয়াও করিতে পার নাই, কত কাজ অন্যায় জানিয়াও করিয়া ফেলিয়াছ। ইহা নিতান্ত দুঃখেরা বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এটী যে সত্য কথা তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে নাই। এখন চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক কি জন্য আমরা কৃতকার্য্য হই না। যাহা মন্দ কেন তাহা করি, এবং যাহা ভাল কি জন্য তাহা করিতে পারি না। এবং কি উপায়ে এই উভয় প্রকার দুর্ব্বলতা দূর হয়।

আজ পর্য্যন্ত জগতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে সকলেরই উদ্দেশ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা করা। যত নীতি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে সে সমুদয়ের সার মর্ম্ম, এই প্রশ্নের উত্তর করা। তোমরা ছোট বালক বালিকা, তোমরা ধর্ম্মশাস্ত্র কোথায় পাবে? তোমাদের জন্য সহজে সংক্ষেপে ছোট একটী সঙ্কেত বলিয়া দিব মনে করিয়াছি। যদি সেই সঙ্কেত অনুসারে কাজ করিতে পার নিশ্চয় বলিতে পারি তাহা হইলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ার ফল লাভ করিতে পারিবে। তাহা হইলে তোমাদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও সুন্দর হইবে এবং নানা সদ্‌গুণে ... হইয়া তোমরা গৃহ, পল্লী, বিদ্যালয় ও স... উজ্জ্বল ও সুখের আলয় করিতে পারিবে।

গোলাপ ফুল দেখিতে কেমন সুন্দর! দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয়, লইয়া নাকে, মুখে, চক্ষে, বুকে রাখিয়া আদর করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বল দেখি—গোলাপের গাছে যে কাঁটা থাকে তাহাকে কি ওরূপ আদর কর?—না। কারণ তাহা কষ্টদায়ক বস্তু, তাহাকে আদর করিয়া মুখে বুকে রাখা দূরে থাকুক, হাত দিয়া ধরিলেই কষ্ট পাইতে হয়, হাতে ফুটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেয়। এই জন্য গোলাপের ফুল তুলিবার সময়ে আমরা কত সাবধানে, কত ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হই, যেন কাঁটা না ফোঁটে।

আবার দেখ;—সাপ যখন গোল হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া তাহার মাঝখানে ফনাটী ধরিয়া বুক দোলায়, গায়ের গোল গোল দাগ গুলি ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, মসৃণ্ রৌপ্যময় দেহখানি সবুজ ঘাস বনে পড়িয়া পূর্ণিমার চাঁদখানির মত আলো করিয়া থাকে,—বল দেখি তখন কি তাহাকে দেখিয়া আনন্দ হয় না? তাহাকে আদর করিতে ইচ্ছা করে না? তাহাকে পুষিয়া দুধ ক্ষীর খাওয়াইতে ও বন্ধুদের ডাকিয়া ডাকিয়া তাহার কুণ্ডলী ও ফনার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখাইতে বাসনা হয় না?—অবশ্যই হয়। কিন্তু কে এমন নির্ব্বোধ আছে যে, সুন্দর গোলাপটীর মত ঐ সাপেরও আদর করে? পাগল ভিন্ন অন্য কেহই ঐ সর্পের শোভা দেখিয়া ভোলে না ও তাহার বিষদংশনের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে ধরিয়া বুকে রাখিতে যায় না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মনুষ্য গোলাপের কাঁটা বা সাপকে যেরূপ ভয় করে, মন্দ কর্ম্মকে দুরাচার তাহার শত ভাগের এক ভাগও ভয় করে রাখিল এমন লোক এক জনও নাই যে, হাতে কাঁটা বিঁধিলে "উহু" করিয়া না শিহরিয়া উঠে। এমন মানুষ কয় জন আছে যে সাপের কামড়কে ভয় না করে? কিন্তু লোকে মিথ্যা কথা বলিতে বা পরের নিন্দা করিতে বা অন্যের ক্ষতি করিতে কি সেইরূপ ভয়ে শিহরিয়া উঠে? সাপ দেখিলে যেরূপ ভয় হয়, প্রাণ কাঁপিতে থাকে, চীৎকার করিয়া লোককে ডাকে; কোন কুচিন্তা বা কুবাসনা

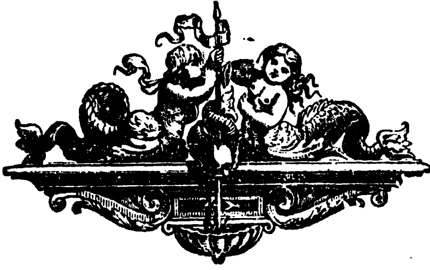
মন্দ ইচ্ছা বা কোন দুষ্টবুদ্ধি মনে হইলে কি সেইরূপ আতঙ্ক হয়, ভয়ে প্রাণ তোলপাড় হয়? মা, বাবা, ভাই, বন্ধু সকলকে কি চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বল যে "ঐ দেখ, আমার মনে একটা সাপ ফণা ধরিয়া কামড়াইতে আসিতেছে, ওটাকে মারিয়া আমাকে রক্ষা কর?"

গোলাপ ফুলটী তুলিতে গিয়া হাতে কাঁটা ফুটিলে, কাঁদিতে কাঁদিতে রক্তমাখা অঙ্গুলটী অপর হাতে ধরিয়া মার কাছে যাই ও সব কথা মাকে বলিয়া কাঁদিতে থাকি। মা ধীরে ধীরে যত্ন করিয়া রক্ত মুছাইয়া দেন ও আদর করিয়া প্রবোধ দেন, এবং নিজে ফুলটী তুলিয়া কাঁটাটী ভাঙ্গিয়া হাতে দেন। দেন না? আচ্ছা তেমনি, বল দেখি—গোপালের সুন্দর বেলোয়ারী কাঁচের দোয়াৎটী দেখিয়া তোমার লইতে ইচ্ছা হইলে, সেই কুচিন্তার কাঁটা ফুটিয়া কষ্ট পাও কি? আর কাঁদিতে কাঁদিতে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গিয়া মন খুলিয়া সব কথা সত্য সত্য বল কি?—তাহা যদি বলিতে পার তবে নিশ্চয়ই শিক্ষক মহাশয় কোলে বসাইয়া স্নেহ করিয়া, পরের দ্রব্য চুরি করা যে বড় দোষ তাহা বুঝাইয়া দিবেন ও তোমাকে নিজে পয়সা দিয়া তেমনি একটী ভাল দোয়াৎ কিনিয়া দিবেন। তুমিও আর কখন পরের কোন দ্রব্য লইতে চাহিবে না।

মানুষ স্বভাবতঃই সুন্দর বস্তু ভাল বাসে, লইতে ইচ্ছা করে। গোলাপটী দেখিলেই মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার কাঁটা ভয়ানক বস্তু। সর্পের শোভায় মন ভুলিয়া যায়; কিন্তু তাহার বিষ প্রাণ নাশ করে। মনুষ্য সুখী হইতে চায়, যে বস্তু পাইলে যে কার্য্য করিলে সুখ আনন্দ বা আরাম লাভ হইবে মনে করে, তাহাতেই লোভ জন্মে। এই লোভের সময় শান্ত ধীর ভাবে বিবেচনা করিতে হয়—ইহাতে কাঁটা ফুটে কি না, সে কার্য্যে বিষ আছে কি না। অর্থাৎ কাজটা ভাল না মন্দ। মন্দ কর্ম্ম হইলেই যদি আপনা আপনি মনে ভয় হয়, প্রাণে লাগে, কাঁটার মতন ফুটিতে থাকে—তবে কি আর কেহ সে কাজ করে? আর লোভের সময় যার মনে হিতাহিত চিন্তা, ন্যায় কি অন্যায় এ বিচার হয় না; যাহা ভাল লাগে, আপাততঃ মিষ্ট বোধ হয়, তাহাতেই প্রবৃত্ত হয় সে বালক বালিকা কদাচ ভাল হইতে পারে না। তার হাত পা কাঁটা ফুটিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, হয়ত সাপের কামড়ে তাহার প্রাণ যায় অর্থাৎ তাহার চরিত্র কখনই বিশুদ্ধ হইতে পারে না, তাহার স্বভাব ক্রমে ক্রমে উচ্ছন্ন হইয়া যায়। বিষে মানুষের যে প্রাণনাশ হয়, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছ সন্দেহ নাই। সেইরূপ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, অর্থাৎ চরিত্রের বিনাশ হয়, ইহারও শত শত উদাহরণ শত শত গল্পে ও উপদেশে পড়িয়াছ ও শুনিয়াছ। যে সব কাজ মন্দ বলিয়া জানা আছে, হাজার হাজার বৎসর অবধি মানুষ তাহাদের বিষময় ফল দেখিয়া দেখিয়া ও ভুগিয়া ভুগিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতেও আর সংশয়ের লেশ মাত্র নাই। যাহারা সন্দেহ করে, নিজ জীবনে ঐ সকল পাপের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, অবশেষে সেই বিষে দগ্ধ ও মৃতপ্রায় হয়, তবে তাহারা শিক্ষা করে ও তখন তাহাদের বিশ্বাস হয় এবং সন্দেহ দূর হয়। ফলতঃ পুণ্যের জয় ও পাপের সর্ব্বনাশ সংসারে কথায় কথায় প্রমাণ হইতেছে। অতএব বিবেচনা ও চিন্তা করিতে শিক্ষা কর। মন্দের মন্দ ফল হইবেই হইবে, এই মহাসত্যে বিশ্বাস করিতে শিখ এবং ঐ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কুচিন্তা কুকার্য্যকে কাঁটার ন্যায়

কষ্টদায়ক ও সর্পের মত ভয়ানক মনে করিতে অভ্যাস কর। তাহা হইলেই স্বভাবতঃ ঐ ভয় জন্মিবে ও প্রাণ মন্দ হইতে ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। অন্ধকার ঘরে বা বন জঙ্গলময় স্থানে বা ভাঙ্গা বাড়ীর ভিতরে যেমন পা ফেলিতে ভয় হয়, পাছে সাপের ঘাড়ে পা পড়ে, ঠিক তেমনি যে সকল বস্তু প্রলোভন-পূর্ণ, যে সব স্থানে মন্দ লোক যায় আসে, যে সমস্ত কর্ম্মে সুখের সহিত দোষ-রূপ কণ্টক মিশ্রিত, যে সকল লোকের বাহিরের সৌন্দর্য্য বা ধন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির মধ্যে কুচরিত্ররূপ বিষ লুকাইয়া আছে, সে সমুদয় হইতে প্রাণভয়ে একেবারে দূরে থাকিতে শিক্ষা কর। কদাচ মন্দের লেশমাত্রকে প্রশ্রয় দিও না, নিকটে যাইও না, ভীত হও, কাছে আসিলে চীৎকার করিয়া বন্ধুদিগের সহায়তা প্রার্থনা কর।

ভাল হইবার সঙ্কেত এই।



বাদুড়ের কথা।

একবার পশু ও পক্ষীদিগের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সারাদিন ঘোরতর লড়াই হইতে লাগিল, কে হারে কে জেতে কিছুই ঠিক নাই। কোন সময়ে পশুরা জয় লাভ করিবে কোন সময়ে বা পক্ষীরা জয়লাভ করিবে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। জয়কেতে বাদুড় যখন যে দলে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা দেখে সেই দলে গিয়া মেশে। বাদুড়ের এই প্রকার আচরণ দেখিয়া পশু ও পক্ষী উভয়েই তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

বাড়ীর রকের উপর সন্ধ্যার সময় বসিয়া প্রায়ই দলে দলে বাদুড় উড়িয়া যাইতে দেখিতে পাই, কিন্তু সে সময়ে বা দিনের বেলাও যখন বাদুড়েরা তাহাদিগের আবাস বৃক্ষে ঝুলিতে থাকে, তখন তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে লক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ উড়িয়া যাইবার সময় ইহাদিগকে এক জাতীয় পক্ষী বলিয়া বোধ হয়, এবং অনেক লোকের মনে সেই সংস্কারই আছে যে বাদুড় পক্ষী জাতীয়। বাদুড়ের যে ছবিটি দেওয়া গেল তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, বাদুড়ের শরীরটি একটি বড় ইন্দুরের ন্যায়(১ম চিত্র দেখ)। মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, সকলই ইন্দুরের ন্যায়, ডানা দুটি না থাকিলে ইন্দুর বলিয়াই ভ্রম হইত। পক্ষীদিগের ন্যায় বাদুড়েরা ডিম পাড়ে না, একেবারে ছানা প্রসব করে। ইহাদের বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে দুটি স্তন আছে। ছানাগুলি মাতৃস্তন পান করে। যদিও বাদুড় অধিক দূর যাইতে হইলে উড়িয়া যায়, তথাপি অনেক সময়ে হাঁটিয়া বেড়ায়। (দ্বিতীয় ছবিটি দেখ) একটি বাদুড় হাঁটিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইবে। দেখ কেমন চারি পায় হাঁটিতেছে। ডানা দু খানা মুড়িয়া রাখিয়া বুড়ো আঙ্গুলের দ্বারা সম্মুখের পায়ের কাজ করিতেছে। এই অবস্থায় দেখিলে ইহাকে চতুষ্পদ জাতীয় না বলিয়া আর কি বলিতে পার? এই সকল কারণে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে স্তন্য-পায়ী পশু শ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়াছেন এবং সম্মুখের দুই হাতের সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায় বলিয়া ইহাদিগকে হস্তপক্ষ (chiroptera) বলিয়া

অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেচনা করিতে গেলে স্তন্যপায়ী জীবগণের মধ্যে কেবল বাদুড়েরই উড়িয়া বেড়াইবার উপযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। কারণ উড্ডুক্ক কাটবিড়ালী কিম্বা উড্ডুক্ক লিমার ও অপোসমের ডানা নাই, বা ডানার ন্যায় কার্য্য করিবার উপযুক্ত কোন অবয়ব নাই। কেবল



১ম চিত্র।

শরীরের উভয় পার্শ্বে কিয়ংপরিমাণে চামড়া ভাঁজ করা আছে। হস্ত বা পদ বিস্তার করিলে ঐ চামড়া বিস্তৃত হইয়া বেলুনের প্যারাসুটের ন্যায় ঐ সকল পশুকে কিয়ৎকাল বায়ুর উপরিভাগে ভাসমান রাখে। কিন্তু পক্ষীগণের ও বাদুড়ের ডানার নির্ম্মাণ কৌশল স্বতন্ত্র ধরণের। বিবিদের হাতে এবং অনেক বাঙ্গালী বাবুদিগের হাতে গ্রীষ্ম কালে একরূপ পাখা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুড়িয়া রাখা যায় ও ইচ্ছা করিলে বিস্তৃত করিয়া হাওয়া খাওয়া যায়। ঐ প্রকার একখানা পাখা লইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহার একটি কাঠাম (ফ্রেম) আছে ঐ ফ্রেমের সঙ্গে কাগজ বা কাপড় লাগাইয়া দিয়াছে। ফ্রেমটি গুটাইলে কাগজগুলি ভাঁজ হইয়া একত্র হয়, আবার ফ্রেমটি বিস্তার করিলে কাগজগুলি বিস্তৃত হইয়া পাখার আকার ধারণ করে। বাদুড়ের ও পক্ষীগণের ডানায়ও প্রথমত ঐ প্রকার একটি হাড়ের খুব মজবুত ফ্রেম আছে। এই ফ্রেমটি বাদুড়েরা ইচ্ছানুসারে নীচেরদিকে নামিবার সময় বায়ুর উপর আঘাত করিতে পারে। পক্ষীগণের ঐ ফ্রেমটি পালকের দ্বারা ছাওয়া, বাদুড়ের ফ্রেমটী একটি পাতলা চামড়ার দ্বারা ছাওয়া। উভয় পদার্থই স্থিতি-স্থাপক সুতরাং বাতাসের উপর সহজে খেলিতে পারে। এই চামড়ার ডানার উপর ভর দিয়া বাদুড়েরা সন্ধ্যার সময় নিঃশব্দে উড়িতে থাকে ও মহা-শূন্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

দ্বিতীয় ছবিটিতে বাদুড়েরা বিশ্রাম করিবার সময় বা হাঁটিয়া যাইবার সময় যে প্রকারে ডানা গুটাইয়া রাখে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। লোকের সংস্কার এই যে, বাদুড় দিনের বেলায় দেখিতে পায় না, কিন্তু এটি ভ্রম সংস্কার। বাদুড়ের দুইটি তীক্ষ্ণ চক্ষু আছে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা আরও অবধারণ করিয়াছেন যে, বাদুড়ের চক্ষু কাণা করিয়া দিলেও তাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে। কুভের অবধারণ করিয়াছেন যে, বাদুড়ের ডানার স্পর্শশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, কোন প্রকার গতি রোধ করিবার সামগ্রী বাদুড়ের নিকটবর্ত্তী হইলেই, তাহারা তাহা জানিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ বাধা পরিহার করিয়া সুগম পথে চলিয়া যায়।

চামচিকা ও বাদুড়কে আমরা দুই শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহারা পৃথক নহে—একই শ্রেণীভুক্ত; এক জাতি ক্ষুদ্র ওএক জাতি বৃহৎকায়। যে গুলিকে আমরা বাদুড় বলি তাহাদিগের শরীর ১১ ইঞ্চি হইতে ১৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে, এবং ডানার এক প্রান্ত হইতেই অপর প্রান্ত দুই হাতেরও বেশী হয়।

আহার সম্বন্ধে বাদুড়েরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী আমিষ ও আর একশ্রেণী নিরামিষভোজী—একশ্রেণী ফল প্রভৃতি খায়, আর একশ্রেণী কীট পতঙ্গ খায়। আমাদিগের দেশে বাদুড়েরা কমলালেবু ভিন্ন আর সর্ব্ব প্রকার ফল খায়। বাদাম প্রভৃতি ফলের খোলাটি ভাঙ্গিয়া ভিতরের শাঁস খাইয়া যায়। যাঁহার বাটীতে বাগান আছে তিনিই বাদুড়ের অত্যাচার ভোগ করিয়া থাকেন।



২য় চিত্র।

প্রাতঃকালে বাগানে বেড়াইতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, গাছের তলায় ছোবড়া, খোলা প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে, ফলের শাঁস গুলি বাদুড়ে খাইয়া গিয়াছে

বাদুড়েরা নিভৃত বৃক্ষে পালে পালে দিনের বেলা নিদ্রা যায়। এবং যে বৃক্ষে একবার বাস করিতে আরম্ভ করে তথায় বহুদিন থাকে। বাদুড়েরা ভোরের সময় যখন আবাস বৃক্ষে ফিরিয়া আসে তখন ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই উচ্চ ও নিভৃত ডালে ঝুলিতে চাহে, এবং সেজন্য ভয়ানক যুদ্ধ ও চিৎকার করে। ফ্রানসীস ডে সাহেব বলেন, কখন কখন বাদুড়েরা রাত্রিতে তালের জটা হইতে তাড়ী পান করিয়া উন্মত্ত হয় ও তাহাতে প্রাতে যুদ্ধকালে কোলাহল আরও বৃদ্ধি হয়। দিবসে আহারের জন্য যে ফল মুখে করিয়া আনে, যুদ্ধের গোলমালে তাহা মাটিতে পড়িয়া যায়। আমাদের দেশের লোকের সংস্কার আছে যে, বাদুড়েরা খাজানা স্বরূপ বৃক্ষাধিকারীকে প্রতিদিন ঐ ফল দেয়।

বাঁদরেরা যেরূপ স্বীয় শিশুসন্তানদিগকে বক্ষে করিয়া প্রতিপালন করে, বাদুড়ও সেইরূপ বক্ষে করিয়া শাবকদিগকে প্রতিপালন করে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার যে যে অংশ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, সেই সকল প্রদেশে এক প্রকার বাদুড় জন্মে। ইহারা ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি জন্তুর এবং সময়ে সময়ে মানুষের পর্য্যন্ত রক্ত চুসিয়া পান করে। ইহারা শোণিত লোলুপ বলিয়া ইহাদিগকে ডাকিনী বাদুড় (vampire) নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বাদুড়ের সহিত ইহাদের আকৃতিগত বৈষম্য বিশেষ লক্ষিত হয় না, কেবল নাসিকার অগ্রভাগ বৃক্ষপত্রের ন্যায়। ডাকিনীরা মানুষকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের রক্ত পান করে অনেকেরই বিশ্বাস এই, কিন্তু কেহ কখন ডাকিনী বা শোণিত-লোলুপ অন্য কোন ভূতযোনী প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু ডাকিনী বাদুড়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে রূপ সন্দেহ নাই। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যাঁহারা আমেরিকা ভ্রমণে গিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ডাকিনী বাদুড়ে ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি জন্তু এবং মানুষের রক্ত পান করে এবং তাহাতে আক্রান্ত প্রাণীগণ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহাতেই তাহারা মরিয়া যায়। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে এই বাদুড়ের আক্রমণে সময় সময় পালে পালে পশু মরিয়া যায়।

আজারা কৃত প্যারাগোয়ে দেশের প্রানিবৃত্তান্তে, ডাকিনী বাদুড়ের বিষয় তিনি লিখিয়াছেন যে, "আমি এই জাতীয় বাদুড় অনেক দেখিয়াছি। ইহাদিগকে জমীতে ছাড়িয়া দিলে ইন্দুরের মত বেগে ছুটিয়া পালায়। রক্ত চুসিয়া খাইতে ইহারা বড় ভালবাসে, কুক্কুট ও হাঁস প্রভৃতির মাথা কামড়াইয়া রক্ত চুসিয়া খায়; অশ্ব, গরু, ছাগল প্রভৃতির ঘাড়ের নিকটে ও পৃষ্ঠে কামড়াইয়া রক্ত পান করে। একদা আমি এক পল্লিতে কোন কুঁড়ের মধ্যে নিদ্রিত ছিলাম; তখন ডাকিনী বাদুড় চারি বার আমার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কামড়াইয়াছিল। এক এক বারে অর্দ্ধ ঔন্স পরিমাণে রক্ত নির্গত হইয়াছিল। যখন আমাকে কামড়ায় তখন আমি কিছুই টের পাই নাই।"

ডারউইন সাহেব তাঁহার ভ্রমণ্যালে লিখিয়াছেন যে, চিলি প্রদেশের কক্বিম্বো নামক স্থানে একদিন তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার একটী ঘোড়াকে ছটফট করিতে দেখিয়া সহিস তাহার নিকটে যাইয়া দেখে এক ডাকিনী বাদুর ঘোড়ার পিঠে বসিয়াছে, সে অমনি তাহাকে ধরিয়া আনিল। ঘোড়াটী দুই দিন একটু ক্লিষ্ট ছিল, তৃতীয় দিনে কার্য্যোপযোগী হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের ম্যালাবার উপকূলে যে সকল পর্টুগ্যাল দেশীয় উপনিবেসিক আছে তাহারা, ও মান্দ্রাজবাসী কোন কোন জাতীয় লোকেরা, এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার নিলকুঠী সকলের নিকট যে বুনো কুলীরা বাস করে তাহারা বাদুড়ের মাংস খায়। কর্ণেল সাইক্স বলিয়াছেন যে, বাদুড়ের মাংস খুব মোলায়েম ও তাহাতে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নাই। বাদুড়ের তেল প্রদীপে জ্বালান যায় এবং বুনোরা তাহা দ্বারা বাত রোগের এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করে।



রামায়ণ।

গুহক চণ্ডাল।

এক দিন রামচন্দ্র অনুচরবর্গসহ মৃগয়ায় গমন করিলেন। অনেক বন জঙ্গল পর্য্যটন করিয়া অবশেষে এক হরিণ দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন; হরিণ প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল, তিনিও তাহার অনুসরণ করিয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে হরিণ মারিতে পারিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গীগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায়ও নিতান্ত কাতর হইলেন। এদিকে সন্ধ্যাও হয় হয়, একাকী গভীর বনের মধ্যে সমস্ত রাত্রি কিরূপে যাপন করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন এক অতি কদাকার পুরুষ ধনুর্ব্বাণ হস্তে সেই দিকে আসিতেছে। লোকটী আসিয়া তাঁহাকে বনমধ্যে একাকী দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং যখন জানিতে পারিল যে তিনিই অযোধ্যার মহারাজাধিরাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র, তখন সে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য অতিশয়

আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই ব্যক্তিই নিষাদ-রাজ গুহক। ইহার রাজধানীর নাম শৃঙ্গবেরপুর। যে বনে রামচন্দ্র মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন সে বন তাহারই অধিকারভুক্ত। রামচন্দ্র গুহকের আগ্রহ, সমাদর এবং ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন, নিষাদপতিও যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। রামচন্দ্র রাজপুত্র হইয়াও সামান্য ব্যাধের আতিথ্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না,—সূর্য্যবংশের ন্যায় অতি উচ্চ বংশে জন্মিয়াও নীচ চণ্ডালের বন্ধুত্বে বিমুখ হইলেন না। রামচন্দ্রের চরিত্রের উদারতা এইখানে। স্নেহ ভক্তি এবং ভালবাসায় কি হইতে পারে এই ঘটনাটীতে আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। গুহক নীচ চণ্ডাল হইয়াও ভক্তি ও ভালবাসার গুণে রাজ্যেশ্বর রাজাকে বশীভূত করিল। পুরাণে রামচন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার বলা হইয়াছে। বাস্তবিক মানুষই হউন আর দেবতাই হউন, অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসায় বশীভূত হইতেই হইবে। ভক্তি ও ভালবাসায় ঘোর শত্রু পরাজিত হয়, বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত বশীভূত হয়। এই অতি সার কথাটুকু সর্ব্বদা মনে রাখিও;—অকৃত্রিম ও [illegible]ক ভালবাসায় শত্রু বন্ধু হয়, [illegible]তো বশীভূত [illegible]। গুহক রামচন্দ্রকে গৃহে আনিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিলেন। যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মুগ্ধ হইলেন; তিনি যেমন উদারচেতা ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন তেমনই তাঁহার উপযুক্ত সঙ্গী মিলিল। গুহক নীচ জাতীয় চণ্ডাল হইলেও তাহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ ছিল। মহৎ অন্তঃকরণের সহিত মহৎ অন্তঃকরণের যোগ হইলে যে কি আনন্দ হয়, তাহা আমরা কি বুঝিব? সেই সংযোগ স্বর্গের সুখ মর্ত্ত্যে আনায়ন করে। তখন পাপ, তাপ, দুঃখ, হিংসা, নীচতা দূরে পলায়ন করে।

উভয়ে যত আলাপ হইতে লাগিল ততই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে মহা সুখে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। উভয়ে চির মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সঙ্গীগণ আসিয়া জুটিল। রামচন্দ্র অনেক মিষ্টালাপের পর "বন্ধুর" নিকট বিদায় লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুদিন পরে, যে রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজা হইবেন, ঘটনাচক্রে তাঁহাকে পত্নী সীতাদেবী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসী হইতে হইল। রামচন্দ্র স্ত্রী ও ভ্রাতার সহিত বনযাত্রা করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্র স্নেহবশে কিছুদূরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। দিবা অবসানে তাঁহারা শৃঙ্গবেরপুরের সন্নিধানে গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন। বৃক্ষতলে শয্যা করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এদিকে গুহক লোকমুখে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন, শুনিবা মাত্র মিত্র দর্শন জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি উন্মত্ত-প্রায় হইলেন। জ্ঞাতি বন্ধু মন্ত্রীদিগকে সত্বর প্রস্তুত হইতে বলিলেন এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই প্রাণের সখা রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন, দূর হইতে রামচন্দ্র গুহককে দেখিতে পাইয়া 'বন্ধু বন্ধু' বলিয়া তাঁহার দিকে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। আনন্দে উভয়ের হৃদয় পুলকিত হইল, উভয়ের নয়ন যুগল হইতে অবিরল প্রেম-অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল; কি স্বর্গীয় দৃশ্য! রূপ-যৌবন সম্পন্ন সর্ব্ব-গুণাকর মহোচ্চ বংশীয় রামচন্দ্র অকৃত্রিম প্রেম-

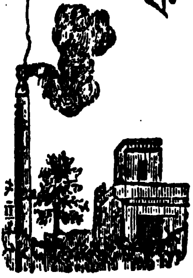
বশে কদাকার মূর্খ চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিলেন। আহা! সরল মিত্রতা কি সুখময় পদার্থ!

তারপর রামচন্দ্র গুহককে, পার্শ্বে বসাইয়া নানারূপ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্র এই দৃশ্য দেখিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন; তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—আহা! দেবগণ যাঁহার আলিঙ্গন লাভ করিতে পারেন নাই, এই নীচ জাতীয় চণ্ডাল অনায়াসে তাহা লাভ করিল। আহা ইহার সখ্যভাব কি মনোহর, কি সরল, কি অকৃত্রিম; প্রভু যে ইহার বশীভূত হইবেন আশ্চর্য্য কি! বুঝিলাম জাতি, গুণ, কুল, শীল, ধন কিছুতেই প্রভুকে পাওয়া যায় না, কেবল অকৃত্রিম ভক্তিতেই তাঁহার চরণ লাভ হয়। এদিকে রামচন্দ্র গুহককে পার্শ্বে বসাইয়া অতি সুমধুর বচনে কহিতে লাগিলেন—মিত্র! আজ আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে এত দিন পরে তোমার দেখা পাইলাম। তোমার জননী ও অন্যান্য পরিবারবর্গত কুশলে আছেন? গুহক কহিলেন বন্ধু! তোমার আগমনে সকলই মঙ্গল, এক্ষণ তোমার নিজ মঙ্গল বল। তুমি কি জন্য আমার বাড়ীতে না গিয়া এই বৃক্ষতলে রহিয়াছ। কি জন্যই বা আমাকে সংবাদ দেও নাই। তোমার এই ব্যবহারে প্রথম এখানে আসিতে ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু তোমার কি আকর্ষনী শক্তি, কোন মতেই না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীরামচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন ভাই, আমার এ ব্যবহারের কারণ আছে, আমি চৌদ্দবৎসব বনে থাকিব, লোকালয়ে যাইব না। এজন্যই তোমার গৃহে না গিয়া এখানে আছি। গুহক অবাক্ হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন, গত পরশ্ব দিবস পিতা আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিমাতা কৈকেয়ীকে পূর্ব্বে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। বিমাতা ঐ দিবসেই দুইটা বর চাহিলেন। একবরে তাঁহার পুত্র ভরতের রাজ্য প্রাপ্তি ও অন্যবরে আমার চৌদ্দবৎসর বনবাস প্রার্থনা করিলেন। পিতৃসত্য পালন জন্য তাই আমি স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে যাইতেছি। গুহক শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তিনি কৈকেয়ী ও দশরথকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। হায়! বন্ধু কৈকেয়ীর নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলে, আহা কেন এ নিদারুণ কথা শুনিলাম, ইহার পূর্ব্বেই বধির হইলে ভাল হইত, আহা! এমন দয়ালু রাজা এমন কঠিন হইলেন কেন? তিনি বন্ধুকে বনে দিয়া কোন্ প্রাণে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। পরে রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন হায় হায়, তোমার ঐ মুখ দেখিয়াই সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তোমার এ দশা ত দেখি নাই। রাজপুত্র হইয়া মলিন ছিন্ন বসন পরিয়া আছ। কৈকেয়ী কি কঠিন। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পুনর্ব্বার অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে সযত্নে ধূলা হইতে উঠাইয়া প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ



ঋণ শোধ।



কলিকাতায় কয়েক দিন ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। এই অসহ্য গরমের মধ্যেও পেটের দায়ে সমস্ত দিবস খাটিয়া শেষ বেলায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছি, এবং মুখ হাত ধুইয়া দরজার কাছে বসিয়া একটা বন্ধুর সঙ্গে আমার ব্যবসায়ের কি প্রকারে উন্নতি করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছি। সমস্ত দিন ভয়ানক রৌদ্র গিয়াছে বেলা-শেষে ফুরফুরে একটু হাওয়া দিয়াছে। সেই হাওয়া স্পর্শে শরীর ও প্রাণ শীতল হইতেছিল। আমি আফিষ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি আমার পুত্র দালিয়া আমার পিছনে পিছনেই লাগিয়া আছে। দালিয়া পাঁচ বৎসর পার হইয়া ছয় বৎসরে পড়িয়াছে। ছেলে পিলে সাধারণতঃ বাপকে ভয় করে, মার কাছে থাকিতেই ভাল বাসে। দালিয়ার স্বভাব ঠিক তাহার বিপরীত। আমি বাড়ী থাকিতে কখনও সে তার মার কাছে ঘেঁসিত না। আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে একাগ্রচিত্তে পরামর্শ করিতেছিলাম। আর দালিয়া আমাদের কাছেই রাস্তার ফুট-পাতের উপর খেলিতেছিল। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দ এবং সেইসঙ্গে সঙ্গে একত্র কতকগুলি লোকের "গেল গেল" চীৎকার শব্দ আমার কাণে গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া রাস্তার দিকে চাহিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিলাম একটা খুব বড় ঘোড়া তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে। আমার অন্যমনস্কাবস্থায় দালিয়া খেলিতে খেলিতে রাস্তার উপরে গিয়াছিল। ঘোড়া দেখিয়া এবং একত্র অত মানুষের চীৎকার শুনিয়া যেমন দৌড়াইয়া আসিতেছিল, ভয়ে রাস্তার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। এখনই সেই ঘোড়ার পায়ের তলে পড়িবে তাহার প্রাণ যায় যায়।

সে ছবি দেখিয়া আমার হাত পা লাগিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। আমার প্রাণাধিক দালিয়া বুঝি আর রক্ষা পায় না। নিমেষের মধ্যে একটী লোক কোথা হইতে দৌড়াইয়া গিয়া দালিয়াকে কোলে তুলিয়া লইয়া আসিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই অসম সাহসিক কার্য্যটি তাহার করিতে হইয়াছিল যে দালিয়াকে কোলে নিয়া দৌড় দিতে না দিতে ঘোড়াটী একরকম তাহার গায়ের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের আঘাতে তাহার এক খানি পায়ে ভয়ানক লাগিল। নিমেষের মধ্যে এই কাজটী হইয়া গেল। আমার মনে হইতে লাগিল যেন পরমেশ্বর স্বর্গ হইতে আমার দালিয়ার প্রাণ রক্ষার্থ সেই লোকটীকে ফেলিয়া দিলেন।

আমি দৌড়াইয়া গিয়া সেই লোকটীর কোল হইতে দালিয়াকে নিলাম এবং আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়া তাহাকে বলিলাম,—"ভাই, তুমি কে? কি দিয়া তোমার এ ঋণ শোধ দিব। এস আমার বাড়ী এস, আমার ও আমার স্ত্রীর আতিথ্য ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। বল, কি করিলে আমি তোমার এ ঋণের সহস্রাংশের একাংশও শোধ করিতে পারি?"

লোকটী আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আমি কত ডাকিলাম, কত অনুনয় বিনয় করিলাম, কোন মতেই ফিরাইতে পারিলাম না। "আমি কোন প্রত্যুপকারের আশা রাখি না"—শুধু এই কথা বলিয়া কোথায়

চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে লোক পাঠাইয়াও তাহার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে একটি স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দালিয়াকে তাহার মার কোলে দিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিলাম এবং আমরা উভয়ে আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সর্ব্বজীবের রক্ষাকর্ত্তা সেই করুণাময় পরমেশ্বরকে অন্তরের অন্তর হইতে বারংবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। দালিয়ার প্রাণরক্ষকের জন্য যে আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না, ইহাতে মনে বড়ই কষ্ট রহিয়া গেল। সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল এ লোকটী কে? দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ। কোন দিন কোথায়ও দেখিয়াছি এরূপ বোধ হইল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত অনেক খুঁজিলাম, কোথাও আর তাহার দেখা পাইলাম না।

যে ব্যবসায়ের উন্নতির পরামর্শে বসিয়া আমার প্রাণাধিক দালিয়াকে হারাইতেছিলাম, সে ব্যবসাটী কি তাহা এখনও বলা হয় নাই। উহা আর কিছুই নহে, সামান্য ছবি (photograph) তোলার ব্যবসা। ছেলে বেলা হইতেই ফটোগ্রাফ তোলার উপর আমার বড় ঝোঁক ছিল। যাঁহারা একটু ঐ কাজ জানিতেন ছেলে বেলা হইতেই তাঁহাদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া উহা একটু শিখিয়াও ছিলাম বাহিরে একটী আফিষ খুলিয়া ছিলাম, তাহাতে দুই পয়সা যাহা পাইতাম তাহাতে পরিবার প্রতিপালন হইত। তাহা ছাড়া ঘরেও সর্ব্বদা কাজ করিতাম। আমার বাড়ীতে ফটোগ্রাফ তোলার সাজ সরঞ্জাম সবই ছিল। অনেক সময় কলিকাতার বাহিরে কোন কোন জমিদারের বাড়ীতে আমি কাজ পাইতাম, এবং তাহাতে বেশ দুই পয়সা হইতও। ছবি তোলার জন্য একটী জমিদারের বাড়ীতে আমার সর্ব্বদাই যাইতে হইত। সেই বাড়ীর একটী কর্ম্মচারী বাবুর ছবি তোলাতে খুব সক্ ছিল। আমি যখনই তথায় যাইতাম, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া একটু আধটু শিখিয়াও ছিলেন। আমার সঙ্গে তাহার বেশ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল।

একবার সেই জমিদার বাবু সপরিবারে তীর্থ যাত্রায় যান। সঙ্গে বহু লোক নিয়া যান। বাড়ীর সমস্ত ভার সেই কর্ম্মচারী বাবুটীর উপরই রাখিয়া যান। বাড়ীতে ২।১ জন চাকর বাকর ভিন্ন আর কেহই বড় ছিল না। এক দিন সকালে বসিয়া আমি কাজ করিতেছি এমন সময় সেই বাবুটী আসিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে বিহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। জমিদার বাড়ীর সমস্ত অবস্থা আমাকে জানাইয়া তিনি বলিলেন "মহাশয়, বড় একলাটী পড়িয়াছি। কিছু ভাল লাগে না। আপনিত বলিয়াছিলেন যে আপনার বেশী কেমেরা (ছবি তোলার যন্ত্র) আছে; আমাকে একটা কেমেরা, কয়েকখানা প্লেট ভরিয়া দিন। আমি কয়েকটী দৃশ্য (Scenery) তুলিব ইচ্ছা করিয়াছি। দৃশ্য গুলি শুধু তুলিয়া আমি আনিব। তাহার পরে আর সব আপনি করিবেন। ছবি সচরাচর কাঁচের প্লেটের উপর তোলা হয়, আমি একটী কেমেরার মধ্যে খান পাঁচ ছয় প্লেট ভরিয়া বাবুটীকে দিলাম। তিনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন এবং আমাকে এক দিন তাঁহাদের ওখানে যাইতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। যে কেমেরাটী তাহাকে দিয়াছিলাম, তাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছবি তোলা হইত। এমন কি নিমেষের মধ্যে দৃশ্য তাহাতে সুন্দর রূপে তোলা যাইত।

দুই তিন দিন পরে সকালে খবরের কাগজ পড়িতেছি। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, এক

স্থানে লেখা রহিয়াছে—"দিন দুইপ্রহরে ডাকাতি।" ঘটনাটী সমস্ত পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সেই জমিদার বাড়িতে এক দিন দুই প্রহরের সময় ডাকাইত পড়িয়াছিল এবং সেই কর্ম্মচারী বাবুটী বাধা দেওয়াতে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া চলিয়া গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই সেই ডাকাইতগণের অনুসন্ধান করিতে পারিতেছে না। আমি সেই দিনই ঐ জমিদার বাড়ীতে রওনা হইলাম। কর্ম্মচারী বাবুটীর অবস্থা মনে হইয়া, মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। বাবুটীর সহিত আমার একটু বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। তথায় গিয়া দেখিলাম, পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেই হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমার কেমারাটী দেখিলাম ঐ বাড়ীর এক বারান্দায় একটী বাগানের সুন্দর দৃশ্যের সম্মুখে সাজান রহিয়াছে। উহা কেহ আর নাড়ে চাড়ে নাই। অমি গিয়া ঐ কেমারা চাওয়াতে পুলিশ সমস্ত খবর আমার নিকট হইতে নিল এবং ঐ খুনি মোকদ্দমায় আমাকে একটী সাক্ষী মানিল। জানিতে পারিলাম জমিদার বাবুর বাড়ীর কোন জিনিষ পত্র চুরি হয় নাই। সবই আছে,—কেবল ঐ বাবুটীকে হত্যা করিয়া দস্যুগণ পলায়ন করিয়াছে। ঘটনাটী কিছুই ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না। সবই বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। যথা সময়ে তদন্ত হইয়া সমস্ত মিটিয়া গেল। স্থির হইল যখন সেই জমিদার বড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল, কর্ম্মচারী ববুটী হয়ত কোন রূপ অসুবিধায় ফেলিয়া তাহাদের কাহাকেও ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাণের ভয়ে তাহারা বাবুটীকে মারিয়া পলায়ন করিয়াছে। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন লোককে ঐ বাড়ীর বাগানের দেওয়াল টপকাইয়া পলাইতে নিকটস্থ কোন কোন লোক দেখিয়াছিল। তাহাতেই ইহা সাব্যস্ত হইল যে, ডাকাইত পড়িয়া মারিয়া গিয়াছে, নতুবা বাবুটীর মৃত্যু একটী ঘোর অন্ধকার জালে আবৃত থাকিত।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আমি এক দিন আমার ছবি তৈয়ারি করিবার অন্ধকার ঘরটীতে বসিয়া কতকগুলি ছবি তোলা প্লেটে আরোক ইত্যাদি দিয়া ছবি ফুটাইতে (develop) করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। এক এক করিয়া অনেকগুলি প্লেটে ছবি বাহির করিয়াছিলাম। অবশেষে হঠাৎ সেই বাবুটী যে কেমেরাটী নিয়াছিলেন তাহাতে কোন ছবি তিনি তুলিয়াছেন কি না দেখিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইল। কেমেরাটী বাড়ী ফিরাইয়া আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম, উহা আর কোন কাজে ব্যবহার করি নাই। আজ উহার মধ্যের প্লেটগুলি বাহির করিয়া দেখিলাম যে, একখানি প্লেটে শুধু ছবি তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ প্লেট খানি আরোক মিশ্রিত জলে ফেলিয়া তাহাতে কোন ছবি ফোটে কিনা দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখিতে পাইলাম যে, উহার উপর একটী দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে। তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, কেমারাটী বারেন্দায় যেখানে সাজান ছিল, তাহার সম্মুখের বাগানের ছবিটী উহাতে নেওয়া হইয়াছে। আস্তে আস্তে কয়েকটী মানুষের চেহারা উহাতে দেখা দিল। তখন আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই বাবুটীর মৃত্যুর সঙ্গে এই ছবির বিশেষ সম্বন্ধ আছে বেশ বুঝিতে পারিলাম। বাগানের দৃশ্যের মধ্যে তিনটী মানুষের ছবি যে দেখা দিল, তাহার এক জনের হস্তে বন্দুক রহিয়াছে দেখা গেল। তখন আর আমার কোন সন্দেহ রহিল ন। আমি স্পষ্ট

বুঝিতে পারিলাম যে, দস্যুগণ বাগানের দেয়াল টপকিয়া যখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিল, তখন সেই বাবুটী ঐ বাগানের দৃশ্যটী তুলিতে ছিলেন। তিনি ঐ দস্যুগণকে লক্ষ করেন নাই, কিন্তু ঐ পাষণ্ডগণ মনে করিাছিল যে, তিনি উহাদিগকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার জন্য চুপি চুপি উহাদের ছবি তুলিয়া নিতেছেন; সুতরাং প্রাণের ভয়ে বাবুটীকে গুলি করিয়া পলায়ন করে। সমস্ত ঘটনাটী এখন আমার কাছে পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল।

অতিশয় উৎসুক হইয়া ঐ লোক গুলির ছবি ভাল রূপ ফুটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যে লোকটীর হাতে বন্দুক ছিল তাহাকে যেন আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ সমস্ত স্মরণ পথে আসিল। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কি সর্ব্বনাশ! এত আমার দালিয়ার প্রাণ রক্ষক। কি ভয়ানক! আমার দালিয়ার প্রাণ রক্ষক নরহন্তা পাষণ্ড? আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি এখন কি করি? নির্দ্দোষী সুহৃদকে যে হত্যা করিয়াছে তাহাকে কি করিয়া ছাড়িয়া দিব। ছবি তুলিয়া পুলিশের হাতে দিলেই সে ধরা পড়িবে। পাপীর শাস্তি হইবে। কিন্তু ঘোর পামর হইলেও সে আমার দালিয়াকে বাঁচাইয়াছিল। আমার এমন উপকারকের অনিষ্টই বা কি করিয়া করি? আমি মহাসমস্যায় পড়িলাম।

এদিকে দালিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সেই ঘরের দরজার দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে—"বাবা, দরজা খোল। তোমার কাছে একটী লোক এসেছে।" আমার সে দিকে কাণ নাই। আমার সমস্ত মন তখন সেই ছবিতে নিবিষ্ট ছিল। হৃদয়ের মধ্যে তখন ঘোর সমস্যার তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল। দালিয়া আমার আদরের পাত্র। কিন্তু তাহার ডাক আমার কাছে এখন অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগিতেছিল। দালিয়া এতক্ষণ আমার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া ক্রোধসূচক স্বরে বলিল—"বাবা, বে'র হবে কিনা বল? আমাকে যে বাঁচাইয়াছিল সেই লোকটী তোমার কাছে এসেছে।" তখন আমি সব বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম যে, সেই পাষণ্ড গুলি করিবার পূর্ব্বেই তাহাদের ছবি তোলা হইয়া গিয়াছিল এই আশঙ্কা করিয়াই আমার কাছে আসিয়াছে। আমি, যে কেমেরা নিয়া আসিয়াছি, তাহা সে জানিতে পারিয়াছিল। সুতরাং আমার স্মরণাগত হইবার জন্যই আজ আসিয়াছে। তখন আমার মনের মধ্যে কে যেন বলিল,—"নরাধম, তুই শাস্তি দেওয়ার কে? পাপীর শাস্তি পরমেশ্বর দিবেন।„ তুই তোর উপকারকের প্রত্যুপকার এই বেলা কেন করিস না?

তখন আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল আমি কি? কত পাপে হৃদয় মলিন হইয়া আছে, ঘোর নরকের কীট আমি—পাপীর দণ্ড দিতে আমি কে? পাপীর দণ্ড পরমেশ্বর দিবেন, আমি আমার ঋণ শোধ দিনা কেন? সেই ছবিযুক্ত কাঁচের প্লেটখানি হাতে করিয়া দ্রুতপদে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইলাম। দেখিলাম যে, আমার বসিবার ঘরে সেই পাষণ্ড বসিয়া আছে। যে মূর্ত্তিতে এক দিন স্বর্গের ছবি দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা আমার বিষময় বোধ হইতে লাগিল। হাতের প্লেটখানি সজোড়ে আছাড় মারিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম, এবং সেই পাষণ্ড যেমন করযোড়ে আমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছিল, আমি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বলিলাম—"বাপু, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন কথাই হইতে পারে না ঐ দেখ তোমার পাপের নিশান চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। আমা হইতে তোমার কোন ভয় আর নাই। তোমার ঋণ আজ আমার শোধ হইল। তোমার বিচার পরমেশ্বর করিবেন। মনে রাখিও তাহার হাত কেহই এড়াইতে পারে না।

লোকটী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল। দালিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে ফেলফেল করিয়া চাহিয়া আমার কথা শুনিতেছিল। তাহাকে কোলে নিয়া মুখ চুম্বন করিতে করিতে আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। এতদিনে আমাদের ঋণ শোধ হইয়াছে শুনিয়া আমার স্ত্রী পরম আহ্লাদিত হইলেন।

অনেক দিন পরে একবার পাগলা হাঁসপাতাল দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম সে লোকটী সেখানে রহিয়াছে। এখন সে ঘোর উন্মাদ।

আমাকে দেখিয়াই "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিয়া চিৎকার করিয়া পড়িয়াগেল। শুনিলাম ঐ প্রকার সময় সময় উন্মাদাবস্থায় সে অজ্ঞান হইয়া থাকে। বুঝিলাম এই তার পাপের ভোগ।



জুম্মা মসজিদ।

পাশে যে চিত্রটী দেওয়া গেল তাহা দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদের চিত্র। সাজাহান নির্ম্মিত রাজ প্রাসাদের কিছু দূরে জুম্মা মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। জুম্মা মস্‌জিদের নামেই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে ইহা একটী মুসলমানদিগের ভজনালয়। মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রধান ভজনালয়গুলিকেই জুম্মা-মস্‌জিদ বলা হইয়া থাকে; কারণ জুম্মাবার অর্থাৎ শুক্রবার মুসলমানদিগের সর্ব্বসাধারণের একত্র হইয়া নামাজ করিবার দিন। মস্‌জিদের ন্যায় রমণীয় অট্টালিকা ভারতবর্ষে অল্পই দেখা যায়। শ্বেত ও রক্তবর্ণ প্রস্তরে জুম্মা মস্‌জিদটী নির্ম্মিত। প্রস্তর নির্ম্মিত গম্বুজের উপর রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত চূড়াগুলি দেখিতে অতি মনোহর। জুম্মা মস্‌জিদের কারু-কার্য্য ভারত বিখ্যাত। এত বৃহৎ ও প্রশস্ত এবং মনোহর মস্‌জিদ ভারতের কোথাও নাই এবং ইহার শিল্পকার্য্যের তুলনাও খুব কম দেখা যায়। দিল্লী নগরী মোগল সম্রাটদিগের প্রধান রাজধানী ছিল, এই জন্য জুম্মা মস্‌জিদও ভারতীয় মুসলমানদিগের প্রধান ভজনালয়।



জুলাই, ১৮৯২।



বিবিধ।

৬ই জুলাই হইতে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ভয়ানক বন্যা হইয়া উত্তর-বঙ্গের অনেক স্থানের ঘর বাড়ী, রাস্তা ঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। উত্তর-বঙ্গে এরূপ বন্যা শীঘ্র হয় নাই। দিনাজপুর সহর একেবারে ডুবুডুবু হইয়াছিল। অধিকাংশ বাড়ীর ঘরে জল প্রবেশ করায় ঘর দরজা পড়িয়া গিয়াছিল। রেলের রাস্তা ডুবিয়া যাওয়াতে রেল যাতায়াত বন্ধ ছিল। এই বন্যা উপলক্ষে উত্তর-বঙ্গের প্রায় সমস্ত স্থানে খাদ্য সামগ্রী অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়াছে এবং লোকজনের ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরই প্রায় কোন না কোন স্থানে এইরূপ বন্যা হইয়া যে লোকের কি কষ্ট হয় তাহা বলা যায় না।

* *
*

বিলাতের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট এই মাসে নূতন গঠিত হইতেছে। গত ৭বৎসর এই ব্যবস্থাপক সভা রক্ষণশীল দলের প্রভুত্বে চালিত হইয়া আসিয়াছে। বিলাতের আইনানুসারে এ সভা কোন এক দলের নেতৃত্বে ৭বৎসরের অধিক কাল পুণর্গঠিত না হইয়া চলিতে পারে না; তাই নূতন সভ্য নির্ব্বাচন দ্বারা ইহার পুনর্গঠন হইতেছে। নূতন সভায় উদারনৈতিক দলের সংখ্যা অল্পই অধিক হইবে; কিন্তু তাহাতে উদারনৈতিকগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ চালাইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায় না। নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের ফল যে ঠিক কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও কিছু বলা যায় না। বিলাতে এই সভার নূতন গঠন এবং সভ্য নির্ব্বাচন লইয়া এখন যে কি একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, আমাদের দেশের কোন কাজের আভাস দিয়া সখার পাঠকপাঠিকাগণকে তাহা ঠিক বুঝান দায়। নূতন সভার জন্য আমাদের দেশের পার্সিকুল-তিলক শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় উক্ত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে দুই এক কথা পাঠক পাঠিকাবর্গকে উপহার দিলাম।

* *
*

অষ্ট্রেলিয়ায় একরকম আশ্চর্য্য পাথর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার চলৎশক্তি আছে। এই পাথর গুলি গোলাকার, এবং দেখিতে লোহার মত। একটী টেবিলের উপর কিম্বা অন্য কোন সমতল স্থানে দুই কি তিন ফিট্ তফাৎ করিয়া এই পাথর গুলি ছড়াইয়া রাখিলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ একটী

সাধারণ কেন্দ্রের দিকে চলিতে থাকে এবং সবগুলি গিয়া অবশেষে সেই কেন্দ্রটীতে একটী পাখীর বাসার মধ্যে যেমন কতকগুলি ডিম থাকে, ঠিক সেইভাবে জড় হয়। তখন এগুলির কোন একখণ্ডকে যদি ৩ ফিট্ কি ৩৷৷ ফিট্ তফাৎ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রস্তর খণ্ড তৎক্ষণাৎ সবেগে গিয়া অপর গুলির সহিত মিশে। একটু অধিক তফাতে রাখিলে আর নড়ে চড়ে না। এই প্রস্তর খণ্ড-গুলি আয়তনে খুব ছোট। সমতল প্রস্তর ভূমির উপরে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে এ গুলি চুম্বক পাথর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

* *
*

ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপে এক রকম নদী আছে। ইহাকে প্রস্তর-নদী বলে। এই নদীর গর্ভ জল-শূন্য; কেবল প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ। এই প্রস্তর খণ্ডের বিশেষত্ব এই যে এগুলির চলৎশক্তি আছে। স্রোতের ন্যায় একদিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছে। পৃথিবীতে যে কত আশ্চর্য্য পদার্থ আছে তাহা বলা যায় না।

* *
*

গ্রীশ দেশের রাজা গ্রীষ্মের সময় কয়েক মাস আশ্চর্য্য ভাবে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এই কয়েক মাস তিনি তাঁহার রাজসিংহাসন ও রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য কৃষকের বেশ ধারণ করেন এবং ঠিক সেই শ্রমজীবী কৃষকের মত শস্যক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করেন। তিনি লাঙ্গল দিয়া সুন্দররূপে একখানি ক্ষেত্র চাষ করিতে পারেন। তাহাতে শস্যের বিজ বপন, এবং শস্য জন্মিলে তাহা কাটা ও বান্ধা প্রভৃতি সমস্ত কাজ নিজে করিয়া থাকেন। স্থুল কথা, শস্যক্ষেত্রে একটী কৃষকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ তিনি স্বহস্তে করিতে পারেন। রাজ রাজড়ার পক্ষে এ একটী আশ্চর্য্য এবং প্রশংসনীয় আমোদ সন্দেহ নাই।

বালকের সদনুষ্ঠান।

[যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফল।]

ছেলেবেলায় ঠাকুরমার নিকট রামায়ণের গল্পে শুনিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র যখন সমুদ্র বন্ধন করেন, তখন কাঠবিড়ালীরা ছোট ছোট কাঠ আনিয়া বানরদিগের সাহায্য করিয়াছিল। অত ছোট জানোয়ার সমুদ্র বন্ধনের কিরূপে সাহায্য করিল—ইহা ভাবিয়া তখন আমার হাসি পাইত, এবং সেই জন্য অনেক দিন ঠাকুমার নিকট তিরস্কারও খাইয়াছি। ভাই পাঠক পাঠিকা, কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের সংবাদে কি তোমাদিগেরও হাসি পাইয়াছে? আমার কিন্তু এখন আর হাসি পায় না। আমি এখন বড় হইয়াছি,—এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাঠবিড়ালী কেন, ইচ্ছা ও যত্ন থাকিলে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমুদ্র বন্ধন করিতে পারে।

তোমাদিগের কাহারও যদি কোন দিন কোন সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, আর যদি—"আমি এত বড় কার্য্যের পক্ষে ভারি ছোট"—ঐ ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া থাক, তবে এই কাঠবিড়ালীর গল্প হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে সকলেই সকল কার্য্যের সাহায্য করিতে পারে; এবং দশজন যত্নশীল ব্যক্তি একত্র মিলিত হইলে সকল সৎকার্য্যই সফল হইতে পারে। কথায় বলে,—"দশের লাঠি একের বোঝা"। তাই বলি, সৎকার্য্য করিতে ছোট বড় দেখিবার আবশ্যক নাই। সামান্য পিপীলিকাও

খুব বড় একটী কাজে যথা শক্তি সাহায্য করিতে পারে, এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিও।

আজ তোমাদিগকে একটী সদনুষ্ঠানের কথা বলিব। তোমরা দেখিতে পাইবে, তোমাদিগের মত ছোট ছোট বালক বালিকা দ্বারাও কতবড় মহৎ কার্য্য হইতে পারে। তোমরা "শিশুর-সদাচারে" বোধহয় বিলাতী বালকদিগের এই প্রকার মহৎ কার্য্যের অনেক গল্প শুনিয়াছ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তোমাদিগের সমবয়স্ক বাঙ্গালীর ছেলেরা যে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের জন্য খাটিতেছে, একথা তোমরা বোধহয় জান না; আশা করি, তাহাদের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া তোমরাও ঐ সমুদয় বালক বালিকাদিগের ন্যায় পরের জন্য প্রাণপণে খাটিতে আরম্ভ করিবে।

আজ প্রায় দশ বার দিন হইল আমি মফস্বলের একটী গ্রামে* কিছুদিনের জন্য বাস করিয়াছিলাম। সেই গ্রামে একটী দাতব্য-ভাণ্ডার আছে। দাতব্য-ভাণ্ডার কি বুঝিতে পারিয়াছ তো? দীনদরিদ্র-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে এই গ্রামে অর্থ সংগৃহীত হয়, এবং এই সঞ্চিত অর্থ সাধারণ দাতব্যে ব্যয়িত হয় বলিয়াই ইহাকে দাতব্য-ভাণ্ডার (Charity Fund) বলা হয়। আমি কলিকাতা রওনা হইবার ২।১ দিন পূর্ব্বেই ঐ ভাণ্ডারের জন্মোৎসব হইল। জন্মোৎসব উপলক্ষে গ্রামের জনসাধারণের একটী সভা হয়। বলা বাহুল্য, আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভায় ভাণ্ডারের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার এমন আনন্দ হইয়াছিল যে, তাহা তোমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। ছোট ছোট বালকদিগের কার্য্য দেখিয়া আমার বাস্তবিক বোধ হইল যে ঠাকুরমার কথা মিথ্যা নহে,—কাঠ-বিড়ালীও সেতু বন্ধন করিতে পারে।

সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম—টেবিলের উপর কতকগুলি পুরস্কার সজ্জিত রহিয়াছে। শুনিলাম, যে সমুদয় বালক অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত ভাণ্ডারের কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে কতিপয় ভদ্রলোক প্রীতি-চিহ্ন স্বরূপ ঐ পুরস্কার গুলি দিয়াছেন। পুরস্কার প্রদানের সময় দেখিলাম সেই বালকদলের মধ্যে কয়েকজন ক্ষুদ্র "বালকবীর" আছেন। তাঁহাদের প্রফুল্ল বদন ও সৎকার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া প্রাণে বড়ই আহ্লাদ হইল।

এখন ভাণ্ডারের কার্য্য প্রণালীর কথা শুন। গ্রামস্থ দরিদ্রগণকে পালন করাই ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য। এই কার্য্যে যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন তাহা তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। ঐ গ্রামটিতে প্রায় একশত জন নিঃস্ব ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহাদিগের কাহারওই পরিশ্রম করিয়া খাইবার শক্তি নাই;—কেহবা রোগা, কেহবা বালক, আর কেহ বা ভদ্র-বিধবা। খাইবার এত লোক আছে বটে, কিন্তু দিবার লোকের বড়ই অভাব। গ্রামের অধিকাংশ লোকই মধ্য-বিত্ত অবস্থার। একেবারে অনেক টাকা সাহায্য করিবার শক্তি কাহারওই নাই। সুতরাং, দাতব্য-ভাণ্ডারের জীবন গ্রামের সাধারণ লোকের বদান্য-তার উপরই নির্ভর করে। কিন্তু গ্রামস্থ সাধারণ লোকে সকল সময় নিয়ম মত অর্থ সাহায্য করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। এই জন্য দাতব্য ভাণ্ডার পয়সার পরিবর্ত্তে চাউল লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবারে যখন রান্না করিবার চাউল লওয়া হয়, তখন তাহা হইতে গৃহকর্ত্রী একমুঠা করিয়া চাউল দাতব্য-ভাণ্ডারের জন্য উঠাইয়া রাখেন। এই-

* সেনহাটী——জেলা খুলনা।

রূপে প্রত্যেক পরিবার হইতে সপ্তাহে ১৪ মুষ্টি—প্রায় ৩ পোয়া চাউল সংগৃহীত হয়। এই সমুদায় চাউল সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক পাড়ায় ২।৩ জন করিয়া বালক আছে। তাহারা প্রত্যেক রবিবার অপরাহ্নে নিজের পাঠাদি সমাপন করিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং ভাণ্ডার গৃহের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট মাপিয়া রাখিয়া আইসে। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ পয়সা দেন, তাহাও তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকে। কেহ কেহ রীতিমত চাঁদাও দেন,—এবং তাহা ছাড়া গ্রামে বিবাহাদি উৎসব হইলে কর্ম্মকর্ত্তা দাতব্য ভাণ্ডারে কিছু কিছু সাহায্য করেন। এই প্রকারে সপ্তাহে প্রায় দেড়মণ চাউল ও কিছু নগদ পয়সা হয়।

এইত গেল আয়ের কথা। এখন ব্যয়ের কথা শোন। যে সমুদয় ব্যক্তি ভাণ্ডারের সাহায্য লন, তাঁহাদিগের জনপ্রতি পূর্ব্বে সাপ্তাহিক তিন সের হিসাবে চাউল দেওয়া হইত। এক্ষণে সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে এবং বালক ও বৃদ্ধের গড়ে তিন সের অত্যন্ত অধিক হয় বলিয়া দুই সের করিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রত্যেক পাড়ার আদায়কারী বালকেরাই ঐ পাড়াস্থ দরিদ্রদিগকে চাউল বিতরণ করে। সোমবার অপরাহ্নে স্কুলের পর উহারা চাউল মাপিয়া নিজের নিজের পাড়ায় বিতরণ করিয়া আইসে। দান কার্য্য অতি গোপনে হয়; কারণ তাহা না হইলে যে সমুদয় ভদ্র পরিবার সাহায্য গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা পাইতে হয়।

ভাণ্ডারের কার্য্য-বিবরণীতে দেখিলাম গত বৎসরে এই প্রকারে ৫৪ চুয়ান্ন মণ চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গত শীতে কোন কোন ব্যক্তিকে শীতবস্ত্রও দেওয়া হইয়াছে। একুনে প্রায় চল্লিশ জন নিঃসম্বল ব্যক্তি প্রতিপালিত হইয়াছে; এবং বৎসরের শেষে সম্পাদকের নিকট পঞ্চাশ টাকা মজুত আছে।

ভাই পাঠক পাঠিকা, এখন ত দেখিলে কাঠ-বিড়ালীরও সেতুবন্ধনের শক্তি আছে। ছোটর সমষ্টিতেই বড় হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারি বিন্দুতেই সমুদ্র হয়—তাই বলি তোমরা ছোট বলিয়া ভয় পাইও না। তোমাদিগের সমবয়স্ক বালকেরা মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া কতবড় বৃহৎ কার্য্য করিতেছে দেখিলে ত?

এ পর্য্যন্ত তোমাদিগকে ভাণ্ডারের কার্য্য প্রণালীরই বিবরণ বলিয়াছি। এক্ষণে ভাণ্ডারের উদ্যোগীদিগের উদ্যম এবং অধ্যবসায়ের কথা কিছু বলিব। প্রথম যখন এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তখন অনেকেই ইহাতে বাধা দিয়াছিলেন। কেহ বা বলিয়াছিলেন—"যত বাহাত্রামি আর কি!" কেহ বা তাহাতে সায় দিয়া সহাস্যে বলিয়াছিলেন—"খেয়ে দেয়ে ত আর কাজ নেই—আর কি করে?" কোন কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"ভদ্র গৃহের বালকগণ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হইবে।" অপর কোন খুড়া মহাশয় তাঁহার অনুমোদন করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, বিশেষ যাহারা সাহায্য গ্রহণ করিবে তাহাদিগের সন্তান সন্ততির বিবাহের সময় মহা গোল-যোগ হইবে এ ঠিক জানিয়া রাখ।" এই প্রকার বাধা বিপত্তি—এই প্রকার শ্লেষ এবং তিরস্কারে যে বালকের প্রাণ দৃঢ় থাকে, ইহা যদি আহ্লাদের বিষয় না হয়, তবে আর আহ্লাদের বিষয় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি যখন বালকেরা ভিক্ষা করিতে যাইত তখন কোন কোন মুখরা স্ত্রীলোক তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"কিরে, তোদের

মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপস্থিত নাকি?" একদিন একটি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বালক এই প্রকার প্রশ্ন শুনিয়া সবিনয়ে বলিয়াছিল—"আজ্ঞে, আমার মাতৃশ্রাদ্ধ অপেক্ষা অধিক দায় উপস্থিত।" যাহাহউক, এই প্রকার বাধা বিপত্তিতে দৃক্‌পাত না করিয়া ভাণ্ডারের উদ্যোগিগণ ধীরভাবে আপন কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।" তাই বুঝি এখন আর বাধা বিপত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পূর্ব্বে যাঁহারা বাধা দিয়াছিলেন, এখন তাঁহারাই আবার ভাণ্ডারের শুভানুকাঙ্ক্ষী। সদনুষ্ঠান এই প্রকারে সর্ব্বত্রই সফল হইয়া থাকে।

ভাই পাঠক পাঠিকা, আমার ইচ্ছা তোমরাও এই প্রকারে পরের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম কর। যাদের প্রাণে দয়া নাই তাদের প্রাণ মরুভূমি। তারা মানুষ নয়। পরের দুঃখে যাদের প্রাণ না কাঁদে, পরের অনাহার দেখিয়া যাদের চক্ষে এক বিন্দু জল না আইসে, তারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহে। তাই ভাই, আমার বড় সাধ হয় তোমরাও পরের জন্য প্রাণপণ কর। কিন্তু সাবধান একদিকে এইরূপ সৎকাজ করিতে যাইয়া যেন অন্যদিকে ক্ষতি না হয়। পড়া শুনায় যেন মনোযোগের ক্রটি না হয়।

ফুলের খেলা।

(আজ) সাঁজের বেলা সবাই মিলে
খেল্‌ব ফুলের খেলা,
ফুলের বোঝায় ভর্‌ব সাজি
গাঁথ্‌ব মোহন মালা।
শৈল তুমি সবার বড়
হবে ফুলের রাণী,
ফুলের সাজে মোহন বেশে
সাজ্‌বে তনু খানি।
নমু বড় চালাক মেয়ে
হবে গোলাপ বালা,
ছায়া মতী উষা হ'বে
যুঁথি যাথি বেলা।
ঘিরে ঘিরে রাণীর পাশে
কর্‌ব মোরা গান,
কেউবা দিব হাতে তালি
পাখীর তানে তান।
এম্নি ধারা ফুলের খেলা
আমি ভাল বাসি—
(তায়) নেচে উঠে ভা'য়ের প্রাণ
হাসে রবি শশী।



বিলাতের গল্প।

ইংরেজদের শিষ্টাচার ও একটী আদর্শ ভদ্রলোক।

ভারতবর্ষে যে সব ইংরেজ আসেন, তাঁদের সকলই যে ভদ্র বংশের তাহা নহে। সেই জন্য এদেশীয় অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের মধ্যে (যে সব বিলাতের লোক ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক বৎসর থাকে, তাহাদিগকে অ্যাংগ্লো-

ইণ্ডিয়ান বলে।) আমরা ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সদালাপ প্রভৃতি গুণ সব সময়ে দেখিতে পাই না। মনে করি, ইংলণ্ডের লোকেরা বড় দুর্দ্দান্ত, আর গোরামুখ দেখিবামাত্র ভয়ে জড়সড় হই। বাস্তবিক প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। বিলাতের ভদ্রলোকেরা অতি সৎ ও শিষ্টাচারী। আর আমাদের দেশেও তাঁরা অনেক সময়ে ভদ্রতা দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁরা সাহসীজাতি ব'লে তাঁদের চরিত্রের এই একটী বিশেষ গুণ যে, তাঁরা কখনও ভীরুতা দেখিতে পারেন না। তোমরা তাঁদের দেখে যত ভয় পাইবে, তাঁরা তত তোমাদিগকে ঘৃণা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবেন। কিন্তু এক বার সাহস করিয়া তাঁদের সঙ্গে সমানে কথা কও, বন্ধুভাবে আলাপ কর, দেখিবে তাঁরা সদালাপ ও ভদ্রতায় তোমাদিগকে মোহিত করিবেন। তা ছাড়া, ইংরেজ পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও শিষ্টাচারাদি দেখে আমরা অনেক সময়ে আশ্চর্য্য হই। তোমাদিগকে ঐ বিষয় ভাল করিয়া দেখাবার জন্য নীচে একটী আদর্শ ভদ্র ইংরেজের চিত্র দিলাম।

তোমরা যদি দুএক বছর আগের খবরের কাগজ পড়ে থাক, তাহলে লর্ড গ্র্যাণভিলের নাম নিশ্চয় পড়েছ, কেননা তিনি অনেক দিন ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। অল্প কাল হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আর তাঁকে হারাইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও ইংরেজ সমাজ বিশেষ শোক পাইয়াছেন। কারণ, তিনি মহারাণীর একজন বহুকালের বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন, আর সমাজের একটী অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাহার শিষ্টাচার ও আতিথ্যে সকলে মোহিত ছিলেন। অন্যান্য লোকদের মত তিনি একজন সাংসারিক মানুষ হলেও সকলেই তাঁকে অধিকতর মান্য ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিত। সৌজন্য, শিষ্টাচার, সাহস ও অমায়িকতা প্রভৃতি প্রাচীন ইংরেজদের কতকগুলি অতি সুন্দর গুণে তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন। সব স্ত্রীলোকদিগকেই তিনি রাণীর ন্যায় মান্য করিয়া চলিতেন; আর নারী জাতি যে পুরুষের মা, স্ত্রী ও বোন—এ কথা কখনও ভুলে যেতেন না। এ ছাড়া তিনি আনন্দ ও মজার গল্পের জালা ছিলেন, আর সর্ব্বদা এমন প্রফুল্ল থাকিতেন যে, তাঁর কাছে যে আসিত তাকেই হাসাতেন। প্রাচীন বয়সেও এত আমুদে ছিলেন যে, তিনি কোন বাড়ীতে পা দিবা মাত্র পাড়ার যত যুবক ও ছেলে মেয়েরা তাঁর পাশে আসিয়া জুটিত ও তাঁর আমোদে না হেঁসে খেলে থাকিতে পারিত না। তিনি ইংরেজ সমাজে সভ্যতা, শিষ্টাচার ও ভদ্রতার খুঁটিস্বরূপ ছিলেন। তাঁর সদাচার ও সদ্‌গুণের প্রভায় বিলাতের সমাজ সর্ব্বদা উজ্জ্বল ছিল। যে কোন অবস্থাতেই হোক না, লর্ড গ্র্যাণভিলকে দেখিবামাত্র—তিনি যে একজন অতি ভদ্র ও অমায়িক লোক—এবিষয়ে কেহ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিতে পারিত না।

আবার অতি সরল হলেও তিনি বৈরাগী ছিলেন না। তিনি আমোদ আহ্লাদ খুব ভাল বাসিতেন বলিয়া, ব্যঙ্গপ্রিয় লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত বন্ধুভাবে দেখিত। তিনি সকল অবস্থাতেই আদর্শ পুরুষ থাকিয়া সকলের কাছেই উপযুক্ত ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাইয়া গিয়াছেন। লর্ড গ্র্যাণভিলের স্ত্রীও তাঁর ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্না, সুশিক্ষিতা ও মার্জিতা ছিলেন। ইংলণ্ডের অন্তর্ভাগে তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান 'ওয়ামার' পারিবারিক সুখ ও ভালবাসার যেন আধার। লণ্ডনে তিনি রাজনৈতিক কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় নিজ পরিবারের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে পারিতেন না। কিন্তু

'ওয়ামারে' তিনি প্রাণ খুলে স্ত্রী ও সন্তানদের লয়ে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সেখানে সমস্ত জিনিষ থেকে যেন শান্তি, স্নেহ ও সুখের নিশ্বাস বহিত। আর লর্ড গ্র্যাণভিলকে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের সঙ্গে খেলা বা ভোজনে রত দেখিলে অতি দুঃখী ব্যক্তিরও প্রাণে ক্ষণেকের জন্য আনন্দের সঞ্চার হত।

তাঁর পরিবার ও সন্তানদের মধ্যে শিষ্টাচার, সরলতা ও সহৃদয়তা সর্ব্বদা বিদ্যমান দেখিয়া অথচ সকল বিষয়ে বাবুয়ানা বা আতিশয্যের অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে অনেক প্রশংসাবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তাঁর পুত্রকন্যারা অল্প বয়স থেকেই পিতামাতার ন্যায় দয়া সদাচার ও উন্নতচরিত্রের প্রমাণ দিয়াছেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁরা যে গরীবদুঃখী,ছোটবড় সকলের প্রতি সমভাব দেখাতে শিক্ষা পাইয়াছেন, তার একটী উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদিন লর্ড গ্র্যাণভিল তাঁর বড় ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে সইসকে লয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যান। ছেলেমেয়েরা তাদের টাট্টু চালিয়ে সইসের সঙ্গে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন; তিনি কোন বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে কিছু পিছনে পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে লর্ড গ্র্যাণভিল তাদের কাছে গিয়া দেখেন যে তাঁর ছেলে ও ১০।১২ বৎসরের মেয়েরা একটী প্রকাণ্ড ফটক খুলিতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি সন্তানদের ঐ কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসিলে বড় মেয়েটী প্রফুল্ল স্বরে বলিল—আর কিছু নয় বাবা, হেন্‌রীর (সইসের নাম) ঘোড়া দুষ্ট ব'লে ও ফটক ডিঙ্গাতে গিয়া পড়ে গিয়াছিল, তাই আমরা ফটক খুলে ওকে নিরাপদে ভিতরে আনিবার চেষ্টা করিতেছি। লর্ড গ্র্যাণভিল সন্তানদের এরূপ সদাশয়তার কাজ দেখে যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়ে হাসিয়া বলিলেন—ঠিক করেছ, বাছারা! ঠিক করেছ। পরস্পরকে ঐরূপে সাহায্য করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এরকম উন্নত সদাশয়তার ও সরলতার উদাহরণ বড় মানুষদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বেশী দেখা যায় না।

এসব দৃষ্টান্ত ছাড়াও তাঁর আনন্দপূর্ণ গৃহের দৃশ্য যিনি একবার দেখেছেন তিনি তাহা কখন ভুলিতে পারিবেন না। 'ওয়ামার' আলয়ে প্রাতর্ভোজনের পর ছেলে বুড়ো সব যার যা ইচ্ছা কাজ বা খেলাতে মন দিতেন। লর্ড গ্র্যাণভিল ঐ সময়ে সচরাচর রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, কেননা তিনি অনেক দিন ধরিয়া ব্রিটিশ রাজ্যের বিদেশীয় সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি আর তাঁর স্ত্রী এক টেবিলে বসিয়াই লিখিতেন। তাঁর টেবিলের উপর দুতিন ডজন কাগজের মোড়ক জমা থাকিত। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটরী নানা বিদেশের যত রাজকীয় চিঠি পড়িতেন ও উহার মর্ম্ম তাঁকে জানাতেন। আর মহারাণীর প্রধান বিদেশীয় সেক্রেটরী লর্ডগ্র্যাণভিল এক সময়েই নিজ কর্ম্মচারীর চিঠি পাঠ শুনিতেন, তাঁকে পরামর্শ দিতেন, পত্র স্বাক্ষর করিতেন, আবার তার মধ্যে চারিদিকস্থ ছেলেমেয়ের দিকেও নজর রাখিতেন। এক কোণে তাঁর বড় মেয়ে লেডী ভিক্‌টোরিয়া ছোট বোনদের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতে ও গান গাইতে শিখিতেছেন। আর এক স্থানে তাঁর ভগিনী লেডী ফুলারটন বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন ও তাঁর স্বামী শুনিতেছেন। আর এককোণে লেডী গ্র্যাণভিল তাঁর পুত্রকে লয়ে একটি খেলানার কামানে মটরের গুলি দিয়া পিজবোর্ডে ছেঁদা করিতেছেন। প্রতিবারে পিজবোর্ডে একটি করে গুলি মারেন, আর মাতাপুত্রের আনন্দ দেখে কে? লর্ড গ্র্যাণভিল তাঁর কর্ম্মের মধ্যে থেকে ও শুধু যে ঐ স্ত্রীপুত্রের কামান ছোড়ার

দিকে চোক রেখেছেন তা নয়। কন্যার পিয়ানো বাজানর প্রতিও তাঁর কাণ থাকিত। তিনি কখনও বা ভগিনীর পড়া শুনিয়া নিজ অভিপ্রায় জানাতেন; কখনও বা পুত্রকে লক্ষ্যের উপর গুলি মারিতে দেখে হাত তালি দিয়া তাকে বাহবা দিতেন; আর মাঝে মাঝে কন্যাদের বাজানতে উৎসাহ প্রদান করিতেন, বা ভুল গৎ শুধরাইয়া দিতেন। আবার সেই মুহূর্ত্তে নিজ কাজে মন দিয়া হয় ত কোন অতি দরকারী শান্তি-পত্র স্বাক্ষর করিতেন।

এইরূপে তিনি সন্তানদের খেলার মধ্যে থাকিয়াই যত আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সাধন করে গিয়াছেন। ইংলণ্ডের একজন মন্ত্রী ব্রিটিশরাজ্যের এত বড় বড় কাজ করিতে করিতে আপন স্ত্রীকন্যাদের প্রতি এরূপ প্রফুল্ল মন রাখিতে পারিতেন ও তাদের খেলাতে যোগ দিতেন ও আগ্রহ দেখাতেন, এ বড় কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যেমন রাজকীয় কাজের মধ্যে,তেমনি এই সব সুন্দর গার্হস্থ্য দৃশ্যের মধ্যেও লর্ড গ্র্যাণভিলের মহচ্চরিত্রের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যদিও খুব বড় কোন কাজ করেন নি বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি ঠিক কাজ করিতেন। সকল বিষয়েই তিনি একজন আদর্শ রাজকর্ম্মচারী ও গৃহকর্ত্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ইংরেজ সমাজ ও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা বহুদিন পর্য্যন্ত শোকাকুল থাকিবেন। তাঁর চরিত্রে আমরা শিষ্টাচার, প্রফুল্লতা, সততা ও সৎস্বভাবের সমাবেশ দেখিতে পাই, আর ঐ কারণেই তিনি অত লোকপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

পাগলের ধূর্ত্ততা।

ইংলণ্ডের আইনমতে লোকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে পারে না। আমাদের দেশে যেমন দলে দলে বৈষ্ণব ও ফকির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে, সেখানে যদি কেহ সেরূপ করে তবে তাহাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া শ্রমাগারে (work house) বন্ধ করিয়া রাখে। সেইখানে তাহার নিয়মিত রূপে খাটিতে হয় ও তাহার বিনিময়ে খাইতে পরিতে পায়। এই প্রকার শ্রমাগার ইংলণ্ডে অনেক আছে।

ফুলহাম নগরে একটী শ্রমাগার আছে। কিছু দিন হইল তথায় এক পাগল আট্‌কা পড়িয়া ছিল। এই পাগলটী বড় ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছিল; কাহাকেও কিছু বলিত না, এবং তাহার সহিত আলাপ করিলেও সে যে পাগল তাহা সহজে বুঝা যাইত না। তথাপি তাহাকে ঐস্থানে না রাখিয়া পাগলা-গারদে রাখা উপযুক্ত বলিয়া স্থির হইল। শ্রমাগারের অধ্যক্ষ পাগলকে পাগলা-গারদে রাখিবার হুকুমনামা বাহির করিয়া আনিলেন। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় হুকুমনামা পকেটে করিয়া লইয়া পাগলকে পাগলা-গারদে দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গেলে পাগল অধ্যক্ষ ভায়ার পকেট হইতে হুকুমনামা খানি চুপে চুপে বাহির করিয়া নিজের কাছে রাখিল। পাগলা-গারদের দ্বারে উপনীত হইবামাত্র পাগল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল ও গারদের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বলিল,—"আমি একটি পাগল এইখানে রাখিবার জন্য আনিয়াছি, তাহার আর কোন পাগলামী নাই, কেবল তাহার এই এক ভুল সংস্কার যে, সে ফুলহামের শ্রমাগারের অধ্যক্ষ"।

সেই দুষ্ট পাগলের এই কথা শুনিয়া পাগলা গারদের কর্ত্তৃপক্ষেরা অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধরিয়া ভিতরে লইয়া

যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ প্রাণপণে প্রতিবাদ করিতে লাগিল ও বলিল,—'আমি পাগল নহি,আমি প্রকৃতই অধ্যক্ষ,ঐ ব্যাটাই পাগল।" পাগল একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আমি ত পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি যে,ঐ ভ্রান্ত সংস্কারই উহার পাগলামি। যাহা হউক, তর্কের প্রয়োজন নাই; ইহাকে গারদে রাখিবার হুকুমনামা এই লউন" বলিয়া নিজের পকেট হইতে হুকুমনামা বাহির করিয়া দিল। তখন গারদের কর্ত্তৃপক্ষেরা অধ্যক্ষকেই পাগল স্থির করিয়া তাহাকে জোর করিয়া গারদের ভিতরে লইয়া গেল। পাগল গাড়ী হাঁকাইয়া পলায়ন করিল।

সরকারী রিপোর্টে ব্যক্ত যে এই লোকটী প্রকৃতই পাগল ছিল। পাগলের এ ধূর্ত্ততা অসাধারণ সন্দেই নাই।

শ্রীযুত দাদাভাই নৌরজী এম, পি।

তোমার পাঠক পাঠিকাগণ, ইহার পূর্ব্বে বিলাতের মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের কথা বিস্তারিত তোমাদিগকে সখাতে বলা হইয়াছিল, মনে আছে বোধ হয়। পার্লিয়ামেণ্ট ইংরাজদের সর্ব্ব-প্রধান ব্যবস্থাপক সভা। এই সভার অনুমতি ও অনুমোদন ব্যতীত ব্রিটিশ রাজ্যের কোন শাসন-কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমস্ত ব্রিটিশ রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও এই পার্লিয়ামেণ্ট সভার অনুমোদন ব্যতীত কোন কার্য্যই স্বেচ্ছাক্রমে করিতে পারেন না। তিনি নামে মহারাণী, কিন্তু তাঁহার রাজ্য-শাসন ষোল আনা এই সভা দ্বারাই হয়। অতএব তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, এই সভার কত ক্ষমতা ও কত অধিকার, এবং এই সভার সভ্য হওয়াই বা কতদূর সম্মান ও গৌরবের বিষয়।

পার্লিয়ামেণ্ট সভা দুইটী বিভাগে বিভক্ত। তাহার একটীকে "হাউস-অব-লর্ডস্" বলে এবং অপরটীকে "হাউস-অব-কমন্স" বলে। বড় বড় পাদরী এবং লর্ড ও ডিউক ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ দ্বারা "হাউস অব লর্ডস গঠিত।" আর সাধারণ সমাজের লোক দ্বারা "হাউস অব কমন্স্ গঠিত।' এই হাউস-অব-কমন্সের সভ্যগণ দেশীয় সাধারণ লোক দ্বারা মনোনীত হন। ইঁহারা অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং উদারনৈতিক সম্প্রদায়ই প্রধান। যখন কোন প্রশ্ন উঠে, সমস্ত সভ্যগণ এই দুই দলে বিভক্ত হইয়াই উহার মিমাংসা করেন। ইংলণ্ডের আইনানুযায়ী কোন পার্লিয়ামেণ্ট ৭ বৎসরের অধিককাল পুনর্গঠিত না হইয়া চলিতে পারে না। তাহা ছাড়া, এই ৭ বৎসরের মধ্যেও অনেক কারণে পার্লিয়ামেণ্টের পুনর্গঠনের প্রয়োজন হইতে পারে। প্রত্যেকবার এই সভার নূতন গঠনকালে যে সম্প্রদায়ের সভ্যের সংখ্যা অধিক হয় সেই সম্প্রদায়ের প্রভুত্বেই রাজ্য শাসনাদি চলে। গত ৭ বৎসর লর্ড সলিসবারির নেতৃত্বে রক্ষণশীল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজ্য শাসন চলিয়াছে। এবার নূতন পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচনে উদারনৈতিকের দলের সংখ্যা অল্পই অধিক হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে উদারনৈতিক সম্প্রদায় তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে নূতন পার্লিয়ামেণ্ট রাখিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। কোন দল এবার কর্ত্তৃত্বে থাকিবেন সে বিষয়ে ঘোরতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টের পুনর্গঠনকালে স্থানীয় লোকেরা যাঁহাদের উপরে তাঁহাদের আস্থা আছে, এরূপ লোককেই সভ্য মনোনীত করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, অনেক লোক এই মহাসভার সভ্য-পদের



সম্মান লাভ করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও লোকের মত সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সভ্য নির্ব্বাচন নিয়া প্রত্যেকবার যে কি ভয়ানক হুলস্থূল পড়িয়া যায় তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে বিদেশীয় লোকের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হওয়া কি কঠিন ব্যাপার সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা-হাইকোর্টের সুযোগ্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয় ডেট্‌ফোর্ডের উদারনৈতিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আহূত

হইয়া পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী ফিন্স্‌বারীর হলবণ বিভাগের উদারনৈতিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মনোনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেবার উভয়েরই অতি অল্পের জন্য প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টা এরূপ বিফল হইতে দেখিয়া এদেশের অধিকাংশ লোকই মনে করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হওয়া আকাশ-কুসুম প্রায়,—স্বপ্নের বিষয়। এবারকার পার্লিয়ামেণ্টের নূতন গঠনোপলক্ষে সেই স্বপ্ন ফলিয়াছে,—যাহা এক সময় আকাশ-কুসুম মনে হইয়াছিল আজ, তাহা সত্য হইয়াছে। পার্সিকুল-তিলক শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী মধ্য-ফিন্সবারীর উদারনৈতিক সম্প্রদায় দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। আজ ভারত মাতার সুসন্তান দাদাভাই নৌরজীকে এম, পি (অর্থাৎ মেম্বর-অব-পার্লিয়ামেণ্ট) উপাধি লাভ করিতে দেখিয়া ভারতের প্রতিগৃহে আনন্দ-ধ্বনি উঠিয়াছে। আনন্দ ও উল্লাসে বিহ্বল হইয়া ভারতবাসী নৃত্য করিতেছে এবং মধ্য ফিন্সবারীর উদারনৈতিক সম্প্রদায়কে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছে। বহু অর্থ ব্যয় ও অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে দাদাভাই নৌরজী এই সম্মানের পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা, জ্ঞান ও বহুদর্শীতায় প্রবীণ। তাঁহার উপর ভারতবর্ষের আপামর সাধারণের অবিচলিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে; আর আমাদের বিশ্বাস যে তিনি যখন পার্লিয়ামেণ্টগৃহে ব্রিটিশ সভ্যগণের নিকট ভারতের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিবেন তখন তাঁহারা তাহাতে মনোযোগ প্রদান না করিয়া পারিবেন না। আমরা আশা করি দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায় ভারতের অনেক দুর্দ্দশা মোচন হইবে।

১৮২৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর দাদাভাই নৌরজী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন পার্সি ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন। বম্বাইনগরের এলফিন্‌ষ্টন কলেজে তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার শিক্ষা শেষ হওয়ার পর ঐ কলেজেই একজন সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে তিনি কলেজ বিভাগে অধ্যাপক (এসিষ্ট্যাণ্ট্ প্রফেসার) নিযুক্ত হন। দেশীয়দের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে কেহ কলেজের পধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। এই সময়ে তিনি দেশহিতকর অনেক সদনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। যাহাতে দেশীয় লোকের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ১৮৫১ সালে তিনি রাস্ত-গফ্তার" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করেন। এই পত্রিকা খানি বম্বাই প্রদেশে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী।

১৮৫৫ সালে দাদাভাই নৌরজী অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া এদেশীয়দেরদ্বারা পরিচালিত একটী কারবারের লণ্ডনস্থ অংশীদার হন। তদবধি তিনি লণ্ডনে বাস করিতেছেন। মধ্যে কয়েক বার মাত্র অল্পদিনের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া অবস্থিতি করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারই চেষ্টাতে লণ্ডনে "ইষ্টইণ্ডিয়া-এসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাঁহারই উদ্যোগ ও উত্তেজনায় সেই সভা ভারতীয় রাজস্বের সদ্ব্যয়ের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। সেই আন্দোলনের ফলে ১৮৭৩ সালে সভার উক্ত প্রস্তাবের সদ্বিবেচনার জন্য পর্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক একটী অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়।

১৮৭৪ সালে বরদা রাজ্য যখন কুশাসনে এবং অন্যায় বিচারে অত্যন্ত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল, তখন দাদাভাই নৌরজী ঐ রাজ্যের মন্ত্রীর পদ গ্রহণ

করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার সুশাসনে ও সুমন্ত্রণায় রাজ্যটীকে ঘোর দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করেন। ১৮৭৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি বম্বাই মিউনিসিপ্যালিটী ও টাউন কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার কার্য্যদক্ষতার—বিশেষ অর্থ ব্যবহার শাস্ত্রে পারদর্শিতার—বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বম্বাইয়ের মিউনিসিপাল আইন সংশোধনে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি সেই মহাসভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বহু যত্ন, বহু চেষ্টা, বহু কষ্ট, এবং বহু অর্থ ব্যায়ের পর দাদাভাই নৌরজী আজ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার বয়স এখন ৬৭ বৎসর। এ বয়সে এত ক্লেশ স্বীকার কয়িয়া এরূপ উচ্চপদ লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি ভারত মাতার এই সুসন্তানটীকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন, এবং দাদাভাই নৌরজী ইংলণ্ডবাসীদের নিকট ভারতের অভাব ও দুর্দ্দশার কাহিনী গাহিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করুন। ভারত মাতার দুর্দ্দশা মোচন হউক।

পাপে মলিনতা।

গোপালের কেমন অভ্যাস সে আপনার কাপড় চোপড় সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে ভালবাসে, কাপড় কি জামা ময়লা হইলে, জুতা জোড়াটী ব্রুশ করা না হইলে, সে কোথাও বেড়াইতে যায় না। তার লজ্জা করে। একদিন আমাদের বাড়ী তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ওপড়া হইতে দুটী বন্ধু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গোপাল আসে না দেখিয়া, আমি ডাকিতে গেলাম, গিয়া দেখি গোপাল বাবু আপন গৃহে চৌকিতে বসিয়া আছেন, সম্মুখে টেবিলে আয়না রখিয়াছে; তার পার্শ্বে ২।৩ রকমের পমেটম্ ও হেয়ার অয়েলের শিশি খোলা রহিয়াছে। গোপাল এক একবার তাই মাথায় লাগাইতেছেন আর বামহস্তে চিরুণী ও ডানহাতে ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতেছেন। সম্মুখের চুল গুলা ঠিক বসিতেছে না। এই জন্য বড়ই বিরক্ত বোধ হইতেছিল। আমি বলিলাম "একি গোপাল, দশটার সময়ে আহারের নিমন্ত্রণ, দুই প্রহর অতীত হইয়াছে; তুমি এখনও কি করিতেছ? ও পাড়ার বন্ধু দুটী তোমার জন্য বসিয়া রহিয়াছেন? ক্ষুধা পাইয়াছে, সকলেই কষ্ট পাইতেছেন; আর আহারীয় সামগ্রী প্রায় নষ্ট হইয়া গেল, ব্যাপার কি?' গোপাল বলিল কি করি! স্নান করিয়া অবধি এই ২ ঘণ্টা জ্বালাতন হইতেছি, সম্মুখের চুল গুলা ঠিক হইতেছে না। আজ বোধকরি আমার নিমন্ত্রণে যাওয়াই হইবে না।" অনেক কষ্টে মাথা একরূপ সুশৃঙ্খল করিয়া তবে গোপাল সে দিন আমাদের বাড়ী গেল।

আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে অপরিষ্কার কাপড়ে দেখে নাই। কামিজের কলারটী মুচড়িয়া গেলে, আর তাহার পরা হয় না। এজন্য প্রথম প্রথম কত তিরস্কার, ভৎসনা এবং প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছে। কিন্তু অভ্যাসটী ছাড়িতে পারে নাই।

যেদিনকার ঘটনা উপরে লিখিত হইয়াছে তারপর একদিন আমরা বলিয়াছিলাম যে "আমাদের বাড়ী ত তোমার ঘরের কথা, আমরা

কেহই তোমার পর নই তবে আমাদের সম্মুখে তোমার এত লজ্জা কি কারণ?" তাহার উত্তরে গোপাল বলিল—"আমি যে আপনাদের লজ্জায় আসি নাই তা মনে করিবেন না, আমার এমনি অভ্যাস যে বাড়ীতেও আমি ওভাবে থাকিতে পারি না। কোন রকম অপরিষ্কার আমার প্রাণে সয় না। যখন একাকী থাকি কেহ দেখিতে আসে না; তখনও এক তিল কিছু অপরিষ্কার বা পারিপাট্যের অভাব হইলে যেন অন্ধকার দেখি, আর কিছুই তখন ভাল লাগে না; শান্তি ঘুচিয়া যায়, যতক্ষণ না সেটুকু পরিচ্ছন্ন হয় ততক্ষণ আর অন্য কোন কাযই করিতে পারি না। ফল কথা এই আমার নিজে নিজেই লজ্জা করে, ঘৃণা বোধ হয়। গা ঘিন্ ঘিন্ করে, পৃথিবী যেন উলট পালট্ হইয়া গেল মনে হয়। বিছানার চাদরটী ময়লা হইলে কিম্বা ঘরে চারিখানা কাগজের কুচি ছড়াইয়া থাকিলে, বা একস্থানের কোন বস্তু অন্যস্থানে রাখিলে আমি পাগলপানা হইয়া যাই। চাকর না থাকিলে আমি নিজেই করি; নহিলে যে আমার প্রাণে জ্বালা ধরে।"

বস্তুতঃই এই পরিচ্ছন্নতা গোপালের স্বভাবের মূলে বসিয়া রাজত্ব করিতেছে। তাহার জীবনের সুখ ইহারই উপর নির্ভর করে। তাহার ঘর দ্বার, বৈ কাগজ, পত্র টেবিল চেয়ার, কাপড় চোপড়, ও ঘর সাজাইবার অন্যান্য সামগ্রী সমস্তই আশ্চর্য্য রূপ পরিষ্কার ও পরিপাটী, দেখিলে চক্ষু যেন জুড়ায়। বার মাস চব্বিশ ঘণ্টা, দিন ও রাত সমান ধপ্ ধপ্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আমরা কত বার কত চেষ্টা করিয়াছি যে কখন একেলা হয়ত অপরিষ্কার থাকে, ধরিব, কিন্তু এক দিনও কেহ দেখিতে পায় নাই।

যেখানে কোনরূপ দুর্গন্ধ বা ময়লা জিনিস আছে, গোপাল সেদিকে প্রাণ গেলেও যাবে না। প্রাণান্তেও তাহাকে কেহ বর্ষার দিনে কাঁচা পথে লইয়া যাইতে পারে নাই। ছেলে বেলা স্কুলে কেহ কাপড়ে বা জামায় কালি দিলে বা কাদা লাগাইলে সে কাঁদিয়া ফেলিত, আর যতক্ষণ সে কাপড়ে থাকিতে হইত অন্যমনস্ক হইয়া মহা কষ্টে কাল যাপন করিত, ঠিক যেন কাপড়ে কেহ ভয়ানক দুর্গন্ধ ময়লা লাগাইয়া দিয়াছে। ততক্ষণ তাহার কিছু ভাল লাগিত না।

গোপালের যে কেবল নিজের ঘরটী এমনি তাহা নহে। তাহার এই খুঁৎখুঁতে স্বভাব বলিয়া তাহার মা বাপ, ভাই ভগিনী, চাকর বাকর এমন কি প্রতিবেশিগণ পর্য্যন্ত সকলে আপন আপন গৃহ ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। বাড়ীর কোন ঘর মলিন থাকিলে বা আলুথালু হইলে গোপাল দেখিবামাত্র আর সেখানে যাইবে না, বসিবে না—বসিতে পারে না। কাজেই মা বাপ তখনি সে স্থান সুচারু রূপে পরিষ্কার করিয়া ডাকিয়া পাঠান। গোপালের দৌরাত্ম্যে ছোট ভাই বন গুলির ধূলি মাখিয়া বেড়াইবার যো নাই। চাকরেরা ফরসা কাপড় না পরিলে গোপাল বাবুর কাছে তিরস্কার খাইবার ভয়ে কেহ মলিন বসনে বা মলিন দেহে থাকে না। আর পরিষ্কার থাকাতে যে সুখ ও আরাম তাহার আস্বাদন একবার পাইয়া আর কেহ ছাড়িতেও ইচ্ছা করে না। পাড়ার ছেলেরা গোপালের শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে কেহ মলিন থাকিতে ভাল বাসে না। এইরূপে তাহার দৃষ্টান্তে পরিষ্কার থাকা অভ্যাস ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং মলিনতা, অপরিচ্ছন্নতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরিপাট্য এখন সে পাড়ার সকল লোকের ঘৃণার জিনিস হইয়াছে।

ভাই পাঠক ও পাঠিকাগণ, আমরা ইচ্ছা করি তোমরাও সকলে গোপালের মত হও। ঘর

দ্বার ও কাপড় চোপরে ওরূপ হইতে পারা অর্থের সাপেক্ষ, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তথাপি সে বিষয়েও যথা সাধ্য আপন আপন বাসস্থান ও বস্ত্রাদি অবশ্য সতত পরিষ্কার রাখা এবং দেহ ও কেশ বেশ পরিচ্ছন্ন রাখা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু আমাদের এ প্রবন্ধের আসল উদ্দেশ্য নীতি ও চরিত্রের বিশুদ্ধতা। আহা কবে তোমরা সকলে গোপালের মত খুঁৎখুঁতে হইবে? কবে নীতির শুভ্র বসনে কেহ কোন দোষরূপ কালী হটাৎ ঢালিয়া দিলে ঘৃণায় কাঁদিয়া ফেলিবে? কবে আচার ব্যবহারে, কার্য্য কর্ম্মে, কথা বার্ত্তায়, এমন কি নির্জ্জনে নিজ মনে মনেও অপরিষ্কার ভাব বা অবিশুদ্ধ চিন্তা একটীও উদিত হইবে না। স্বভাব কবে এমন বিমল ও শুদ্ধতাপ্রিয় হইবে যে, মদের গন্ধও সহিতে পারিবে না, অপবিত্র মলিন কার্য্য বা ভাবের সংস্পর্শে কষ্ট হইবে, ঘৃণাতে আপনা আপনি মন প্রাণ "ছি ছি!!" বলিয়া সে পথ পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিবে?—লোক দেখাইবার জন্য নয়, প্রশংসা পাইবার জন্য নয়, লোকের তিরস্কার বা নিন্দার ভয়ে নয়,—যথার্থই, সত্য সত্য, অন্তর হইতে মন্দকে ঘৃণা করিতে না শিখিলে নীতি বিশুদ্ধ হয় না। চরিত্র মানে—স্বভাব। লোকে কার্য্য দেখিয়া বা কথা বার্ত্তা শুনিয়া চরিত্রের বিচার করে সত্য; কিন্তু চরিত্র অন্তরের জিনিষ। যখন নির্জ্জনে আপনার গৃহে একাকী বসিয়া আছি, তখন পাপ হইতে আমাকে কে বাঁচাইতে পারে? কুচিন্তা বা দুরভিসন্ধি মনে না আসিতে পায় ইহার উপায় কি?—পাপের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা হওয়া চাই। মন্দকে ময়লা বিষ্ঠাবৎ ঘৃণা করা আবশ্যক। শুদ্ধতা শুভ্র বসনের মত ভাল বাসিব, আদর করিব, প্রাণের বস্তু মহামূল্য রত্ন ইহা জানিয়া তাহাতে এক বিন্দুও মলিন দাগ লাগিতে দিব না। যদি একটী বার প্রাণের ভিতর গোপালের মতন পরিষ্কার থাকিবার নেশা জন্মে,তাহা হইলে আর কখনও ছাড়িতে পারিবে না। কেন না চরিত্রের বিমলতা নিরুপম স্বর্গীয় সুখের আকর। ইহাতে যেমন বিশুদ্ধ আনন্দ ও আত্মপ্রসাদরূপ অমৃত লাভ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

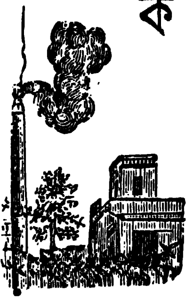
অতএব বালক বালিকাগণ, এই বেলা অল্প বয়স হইতে ভালকে ভাল বাসিতে ও মন্দকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা কর। এমন অভ্যাস কর যে মন্দ কর্ম্ম, কুভাব, কুচিন্তা মনে উদয় হইলে তাহা দূর করিবার জন্য যুক্তি তর্ক ও বিচার করিবারও আবশ্যক না হয়, কেবল মনে আসিবা মাত্র ঘৃণা হইবে ও আপনা আপনি দূর হইয়া যাইবে। পথে চলিতে চলিতে কোন স্থানে পচা মৃত দেহের দুর্গন্ধ নাকে আসিলে কি তর্ক বিতর্ক করিয়া নাকে কাড়প দাও?—কখনই না। তবে কেন ছি ছি করিয়া সে অপবিত্র স্থান হইতে দ্রুত পদে প্রস্থান কর? সেই রূপ সহজ ভাবে স্বভাবতঃ পাপকে ঘৃণায় চক্ষে দেখিতে শিখ, কুভাবের বাতাস কাছে আসিলে, সেখান হইতে ঘৃণার সহিত দূরে প্রস্থান করিবে। যে লোকের সঙ্গে ভাব রাখিলে একটু ঘৃণা কমিয়া যায়, তাহার ছায়া মাড়াইবে না। যে সংসর্গে মন্দ আলোচনা প্রশ্রয় পায়, তাহার ত্রিসীমায় যাইও না। যে সকল পুস্তক পড়িলে মন্দে মতি হয়, তাহা ছুঁইওনা। দৃঢ় ভাবে এ বিষয়ে গোপালের মতন সাবধান হইলে, নিজে ভাল হইতে পারিবে, ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণ সকলেই তোমার দৃষ্টান্তে ও তোমার ভয়ে ভাল হইবে;

ইহাই নীতির দ্বিতীয় সঙ্কেত।



প'ড়ো বাড়ী।

(১)



কর্ম্মস্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, বিশেষ আবশ্যকীয় কাজ হাতে থাকাতে, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করিয়া একেবারেই "আফিস" ঘরে গিয়া বসিয়াছি। যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছিল একে একে খুলিয়া পড়িলাম, তাহার মধ্যে একখানি চিঠি এই :—

"———, অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, বড় দেখিতে ইচ্ছা করে, একবার শীঘ্র দেখা দিবে কি? কলিকাতা থেকে আজ চার মাস গিয়েছ, যাবার পর দু তিন খানা চিঠি লিখিয়াছিলে, কিন্তু তার পর আর কোন খোঁজই নাই। তোমার কাজ চুলোয় যাক্। কাজের জন্য যদি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে ভুলিতে হয়, তবে আমিও সে কাজ চাই না এবং আর কেহ তেমন কাজে লিপ্ত হয়, তাহাও ইচ্ছা করি না। সে যাই হউক, তোমাকে একবার আসিতেই হইবে। বড়দিনের ছুটী এলো, আমারও কদিন অবকাশ থাক্‌বে, তুমি এইছুটীতে অবশ্যই এখানে আস্‌বে। আমি সম্প্রতি বাড়ী পরিবর্ত্তন করেছি, সুতরাং তোমার জন্য ষ্টেশনেই লোক থাকিবে, তাহার সঙ্গেই তুমি আসিবে। আজ শনিবার, কাল রবিবারের সন্ধ্যার গাড়ীতে তোমার প্রতীক্ষা করবো। তুমি আসিতে ভুলিও না। আমার একটু অসুখ হয়েছে, সেই জন্য নিজের হাতে চিঠি লিখ্‌তে পারলাম না।

তোমার———"

হাতের কাজ শেষ হইলে, পত্রখানি হাতে করিয়া বাড়ীর ভিতরে বিশ্রাম করিতে গেলাম।

(২)

"তবে আপনি আজই যাইতেছেন?"

আমি বলিলাম, "আজ যাওয়াই স্থির"

"কলিকাতায় আপনার কদিন বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা?"

"চারি পাঁচ দিনের অধিক নহে।"

"তবে মহাশয়, আমি আসি, আপনি ফিরিয়া আসিলে সাক্ষাৎ করিব। আগন্তুক এই বলিয়া উঠিলেন, আমিও "আচ্ছা তাই আসিবেন," বলিয়া বিদায় দিলাম।

যাঁহার সহিত এই কথাবার্ত্তা হইল, তাঁহাকে আমি চিনি না এবং কখন দেখিয়াছি এমনও মনে হয় না। আমি যে কার্য্যে সম্প্রতি ব্যাপৃত ছিলাম, সেই সম্বন্ধে ইহার কোন প্রয়োজন থাকাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমি কলিকাতা যাইব বলিয়া ব্যস্ত ছিলাম এই জন্য সে সম্বন্ধে কোন কথা হইল না, ফিরিয়া আসিলে কথাবার্ত্তা হইবে স্থির রহিল। লোকটীকে খুব চতুর ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইল।

এদিকে যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল—আজ রবিবারের বৈকালের গাড়ীতেই কলিকাতায় যাওয়া স্থির। একে বন্ধুর অনুরোধ, তা ছাড়া আমার নিজের একটু প্রয়োজনও ছিল, কাজেই যাওয়াই স্থির। পত্রখানি যিনি লিখিয়াছিলেন তিনি আমার একটী প্রিয়তম বন্ধু, কলিকাতায় এক জন উচ্চ

পদস্থ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী। কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে তাঁহাকে রীতিমত চিঠিপত্রও লিখিতে পারি নাই, সে অনুযোগে লজ্জিতও হইলাম, বিশেষ তাঁহার অসুখের কথা জানিয়া তাড়াতাড়ি যাওয়া আরও আবশ্যক হইল। অসুস্থতার জন্য নিজ হাতে চিঠি লিখিতে পারেন নাই জানিয়া কিছু উদ্বিগ্নও হইলাম। এই বন্ধুটীর সহিত বাল্যকাল হইতেই আমার অতিশয় সৌহৃদ্য এবং আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। সে যাহা হউক যথা সময়ে ষ্টেশনে পৌছিলাম, ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া কলিকাতাভিমুখে ছুটিল।

(৩)

শীতকাল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের কিরণ-রশ্মি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অবশেষে একেবারেই নিবিয়া গেল। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে পৃথিবীর মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। আমাদের গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌছিল তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে; ষ্টেশন আলোক মালায় সজ্জিত হইয়াছে। গাড়ী প্লাটফর্ম্মে পৌছি-তেই কুলিরা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল; টিকিট কলেক্টর লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া টিকিট লইয়া গেল, আমরাও জিনিষপত্র লইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। গাড়ী হইতে নামিতেই একজন হিন্দুস্থানী সেলাম করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কুলিদিগকে জিনিষপত্র উঠাইতে বলিয়া আমাকে বলিল, "হুজুর চলুন, বাহিরে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে।" বুঝিলাম এ আমার সেই বন্ধুর প্রেরিত লোক, সুতরাং তাহার সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। লোকটী জিনিষপত্র ঠিক করিয়া রাখিয়া কোচম্যানের পার্শ্বে গিয়া বসিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিল। গাড়ী ছুটিল,, আমিও বন্ধুর সহিত অনেক দিন পরে দেখা হইবে, সেই সুখের কল্পনায় মগ্ন হইলাম। গাড়ী এই ভাবে কতক্ষণ চলিয়াছিল জানি না। গাড়ী থামিলে সেই লোকটী গাড়ীর দরজা খুলিয়া যখন আমাকে বলিল, "হুজুর নামুন," তখন আমার হুঁস হইল। দেখিলাম একটী ছোট গলির মোড়ে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়াছে। শীতকালের রাত্রি, খুব অন্ধকারে আছন্ন ছিল, কাজেই স্থানটা ভাল ঠাওর করিতে পারিলাম না। বিশেষ গাড়ীতে আমি অতিশয় অন্যমনস্ক ভাবে ছিলাম, কোন পথে গাড়ী আসি-য়াছে তাহা লক্ষ্য করি নাই। কলিকাতায় আমি বহু দিন আছি, কিন্তু তবুও স্থানটা যেন নূতন নূতন বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক গাড়ী হইতে নামিলাম। সঙ্গের লোকটী বলিল যে গলির মধ্যে গাড়ী যায় না, একটুখানি গেলেই বাড়ী, এইটুকু হাঁটিয়া যাইতে হইবে। আমি তাহাই করিলাম।

ক্রমশঃ

ধাঁধা।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। কমল।

ধাঁধা।

১। হস্ত আছে, পদ নাই, (তাহা)
সমস্ত শরীর আছে, বলে নাকো কথা। (মতন)
সব লোকে যতনেতে রাখে তারে তুলে,
সময়েতে তারা পুনঃ মনুষ্যকে গিলে।
গিলিত মনুষ্যগণ গর্ব্বভরে চলে,
কিবা হেন বস্তু আছে বলহ সকলে।
আজ কাল সে বস্তুর বড়ই আদর,
তন্মধ্যে ভদ্রের কাছে বেশী সমাদর।

সখা

দশম ভাগ। ৮ম সংখ্যা।

আগষ্ট, ১৮৯২।

বিবিধ।

নিঃসহায়া ভদ্রবংশীয়া হিন্দু বিধবাদিগের সাহায্যের জন্য মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে পাঠক পাঠিকা দিগকে জানাইয়াছি। আমাদের নিকট এ সম্বন্ধে বিশেষ [illegible] জানিবার জন্য একব্যক্তি পত্র লিখি[illegible] জানিতে পারিলাম তাহা [illegible] মহারাজা তাঁহার [illegible] শিবসুন্দ[illegible] ঐ [illegible] চা[illegible] কাজ চুলোয় [illegible] স্বজন বন্ধু [illegible]তে হয়, তবে আমি [illegible] কাজ চাই না এবং আর কেহ [illegible] থাকিবে। হয়, তাহা [illegible]টার সভাপতি, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটি-[illegible] সোসাইটীর দেশী বিভাগের সভাপতি, বৃটীশ ইণ্ডিয়ান সভার সভাপতি বা সহকারী সভাপতি, এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের ও তাঁহার উত্তরাধিকারী বর্গের কোন মনোনীত ব্যক্তি ;—এই কয়জনের হাতে খরচের ভার থাকিবে। সাহায্যপ্রার্থী বিধবাদিগের চরিত্র এবং অবস্থা সম্বন্ধে পাড়ার দুইজন ভদ্রলোকের নিদর্শন দেওয়া আবশ্যক।

*

* *

একখানি ফরাসী পত্রিকায় সে দেশের কয়েকজন প্রতিভাশালী গ্রন্থকার এবং প্রধান ব্যক্তির বাল্যকালের ও পাঠ্যাবস্থার দারিদ্র্যের কথা লেখা হইয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক থেয়ার যখন প্রথম ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে আসেন, তখন তিনি একটা বাড়ীতে একটী অতি ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া করিয়া থাকেন। কয়েকখানি তক্তা দ্বারা তাঁহার টেবিলের অভাব পূরণ হইয়াছিল, এবং খড়ের বিছানায় তাঁহাকে [illegible] করিতে হইত। বিখ্যাত নভেল [illegible]য়াছেন যে, তিনি [illegible] একটী [illegible] কোনমতে [illegible] ঐতিহাসিক গিজো যখন [illegible] হইয়াছিলেন, তখনও ছেলেবেলার কষ্ট [illegible] ভুলেন নাই, তখনও তিনি পাঁচ তলার উপরে কষ্টে থাকিতেন। ফরাসী রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট কার্ণোর পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। দৃষ্টান্তের অভাব আমাদের দেশেও নাই; অক্ষয় কুমার, বিদ্যাসাগর, গুডিভ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির কথা তোমরা জান। এই সকল ব্যক্তিরা নিজ চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে ধনে মানে কত উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

*

* *

দাদাভাই নৌরজির পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের কথা লেখা হইয়াছে। তিনি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া রীতিমত প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এবার লিবারেল অর্থাৎ উদার-

নৈতিক দল মন্ত্রিত্ব পাইলেন। গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। লর্ড কিম্বারলী ভারতের প্রধান সেক্রেটারী হইয়াছেন।

*
* *

গ্লাডষ্টোনের বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি দেখিলে অবাক হইতে হয়। শুধু যে কার্য্য করিবার শক্তি তাহা নয়, ইঁহার জ্ঞানের প্রসার এবং সর্ব্ব বিষয়েই অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিলে অবাক হইতে হয়। নিম্নে একটী উদাহরণ দেওয়া গেল।

একবার গ্লাডষ্টোনের দুইটী বন্ধুর বড় ইচ্ছা হইল গ্লাডষ্টোনকে কোন প্রকারে অপ্রস্তুত করিবেন। অনেক চিন্তা-করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, এমন একটী বিষয় লইয়া তাঁহার সাক্ষাতে আলোচনা আরম্ভ করিবেন যে, তিনি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দুই বন্ধুতে তর্ক করিতে করিতে গ্লাডষ্টোনকে মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিবেন; তিনি মীমাংসা করিতে না পারিয়া অপ্রস্তুত হইবেন। দুইজনে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এমন বিষয় আর খুঁজিয়া পান না, যে সম্বন্ধে গ্লাডষ্টোন অনভিজ্ঞ। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর একখানি অতি পুরাতন পত্রিকায় চীনদেশের দাবা খেলা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন গ্লাডষ্টোন অবশ্য এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু জানেন না, সুযোগ উপস্থিত হইলে ইহাদ্বারাই তাঁহাকে ঠকাইবেন। সুযোগও শীঘ্র হইল। এক বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হইল। গ্লাডষ্টোনেরও নিমন্ত্রণ ছিল। আহারের পর নানা-প্রকার কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল। ক্রমে খেলা সম্বন্ধে কথা উঠিল। কোন বিষয় তর্ক উপস্থিত হইলে গ্লাডষ্টোনের উপরই মীমাংসার ভার ছিল। তিনিই মীমাংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে চীনদেশের দাবা খেলা সম্বন্ধে কথা উঠিল। দুইবন্ধুর নিমন্ত্রণ কর্ত্তার সহিত পরামর্শ ছিল। তাঁহারা দুইপক্ষ হইয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন। গ্লাডষ্টোন এই তর্কের সময় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করিল গ্লাডষ্টোন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এইবার তাঁহাকে ঠকিতে হইবে। তর্ক খুব বাধিয়া গেল। তখন সকলে গ্লাডষ্টোনকে মীমাংসা করিতে বলিবেন, এমন সময় গ্লাডষ্টোন নিজেই বলিয়া উঠিলেন, "আমার বোধ হইতেছে যেন বহুদিবস পূর্ব্বে আমি চীন দেশীয় দাবা খেলা সম্বন্ধে যে অমুক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, আপনারা তাহাই পাঠ করিতেছেন।"

*
* *

বিলাতের জুয়লজিকেল গার্ডেনে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটী অদ্ভুত সর্প আনা হইয়াছে। এই জাতীয় সর্প পক্ষীর ডিম আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপ টাউন নামক সহরে সাপটী ধরা পড়িয়াছিল। আমাদের দেশে এপ্রকার সর্প দেখা যায় না বটে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহা বিস্তর পাওয়া যায়। এই সর্প দেড় হাতের অধিক লম্বা হয় না এবং একটী আঙ্গুলের মত মোটা হইয়া থাকে। ইহাদের হাঁ করিবার শক্তি আশ্চর্য্য। পায়রা ও মুরগি প্রভৃতির ডিম অনায়াসে আহার করিয়া থাকে। উক্ত সর্পটী একটী পায়রার ডিম মুখে লইয়া যাইতেছিল এমন সময় ধরা পড়ে। ডিম খাইবার প্রণালীও একটু আশ্চর্য্য। প্রথমে ডিমটী গ্রাস করে, তার পর [illegible] মধ্যে রাখিয়া ভিতরের পদার্থ খাইয়া, খোলা [illegible] এক খণ্ডের মধ্যে আর এক খণ্ড [illegible] ফেলিয়া দেয়। ইহাদের বিষ [illegible] কিন্তু প্রকৃত [illegible] করিতে থাকে [illegible] গিয়া ইহারা [illegible] থাকে। [illegible] এ প্রকার করে, [illegible] যখন পলায়, তখন ইহারা [illegible] ডিম আহার করে এবং [illegible] থাকে।



মহাত্মা আকবর সাহ।



ইংরেজেরা আমাদের এই ভারতবর্ষের রাজা হইবার পূর্ব্বে, মোগলেরা প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। যে মহাত্মার নাম এই প্রবন্ধের শিরোভাগে দেওয়া হইল, তিনি মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিলেন; এবং ইঁহার সময়ে প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ মোগল রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইঁহার পিতা হুমাউন্ বাদ্‌সা রাজ্য-চ্যুত হইয়া আফগান্-স্থানাভিমুখে পলায়ন করিবার সময় অমরকোট নগরে আকবর সাহ জন্ম গ্রহণ করেন। এ ৩৫০ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি। যখন আকবর সাহ ১৪ বছরের বালক তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সেই অল্প বয়সেই তিনি খুব যুদ্ধ-বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং যে সকল শত্রুরা একবার তাঁহার পিতাকে তাড়াইয়া দিয়া

ছিল ও পরে আবার তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্ত একত্র হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সহিত পানিপথক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন ও পিতৃরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন।

আকবর সাহ যে সকল সেনাপতিদিগের সাহায্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যেই কয়েকজন তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিলে, তিনি অসীম পরাক্রম সহকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে হারাইয়া দিলেন। এই প্রকারে দেশের সকল অশান্তি দূর করিয়া পিতৃরাজ্য বহুদূর বিস্তার করিলেন। দেশের নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত ও প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া ৫০ বৎসর রাজত্বের পর তিনি ১৬০৫ খৃঃ অঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আকবর সাহের রাজত্বকালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত যে কোন এক খানা ভারতবর্ষের ইতিহাস খুলিলেই দেখিতে পাইবে। আকবর সাহের চরিত্র সম্বন্ধে গুটিকতক কথা আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিব। তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে যে, যাঁহারা প্রকৃত বড় লোক, তাঁহাদের অন্তঃকরণের মাহাত্ম্য কত অধিক ও তাঁহারা কি প্রকারে সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। ঐশ্বর্য্য থাকিলেই বড়লোক হয় না। যে ধনী নিজের ধন আছে, এই ভাবিয়া সর্ব্বদা ঘৃণিত আমোদে মত্ত থাকেন, জীবনের এক মুহূর্ত্তও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন না, তিনি ক্রোড়পতি হইলেও তাঁহাকে কেহ বড় লোক বলিবে না। ধর্ম্মে মতি রাখিয়া, আত্মসুখ ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মশীল না হইলে কোন ক্রমেই বড়লোক হওয়া যায় না। আকবর সাহ বাল্যকালে বৈরম খাঁ নামক তাঁহার পিতার একজন সেনাপতির নিকট যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং পানিপথের যুদ্ধে বৈরম খাঁই আকবরের প্রধান সহায় ছিলেন। আকবরের বিপক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক, হিমু নামক একজন হিন্দু সেনানী, যুদ্ধে আহত হইয়াও অসীম বীরত্ব সহকারে লড়াই করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা পরাজিত হইল, তিনি বন্দী হইয়া আকবর সাহের সম্মুখে আনিত হইলেন। তৎকালে বৈরম খাঁ আকবরকে বলিলেন—"আপনি নিজ হস্তে এই কাফেরের মস্তক ছেদন করুন"। আকবর সাহ উত্তর করিলেন "যুদ্ধের নিয়মানুসারে ইহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে বটে, কিন্তু আমি কখনই নিজহস্তে এই আহত বীরপুরুষের মস্তক ছেদন করিব না।" বৈরম খাঁ নিজে হিমুর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। দৈবের এমনি বিড়ম্বনা, কিয়ৎকাল পরে বৈরম খাঁ রাজবিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। সম্রাটের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরাভূত করিয়া আকবর সাহের নিকট ধরিয়া আনিল। তখন আকবর বৈরম খাঁর প্রাণদণ্ড না করিয়া, তাঁহাকে নিজ দরবারে সম্মানিত পদে অভিষিক্ত হইতে বা মক্কায় যাইতে বলিলেন। বৈরম খাঁ মক্কায় যাওয়াই শ্রেয় বোধ করিলেন। যে ব্যক্তি পদানত শত্রুর সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন তিনিই প্রকৃত মহাত্মা।

আবুল ফাজেল্ নামক আকবরের একজন প্রধান সভাসদ্ আইন আকবরী নামক গ্রন্থে, আকবর সাহ কি কি কার্য্য করিয়া দিন যাপন করিতেন, তাহা যেরূপ লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা দেওয়া গেল।

কি উপায়ে সমুদায় প্রজাপুঞ্জের ভালবাসা পাইবেন, আকবর সাহ সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিতেন। রাজ্য শাসনের সহস্র দুশ্চিন্তা ও নানা প্রকার জটিল মন্ত্রণা মধ্যেও কখন তিনি চিত্তকে চঞ্চল হইতে দেন নাই, বরং সর্ব্বদাই প্রফুল্ল মুখে ও প্রশান্ত চিত্তে কাল যাপন করিতেন। যে সকল কার্য্য করিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হন, সেই সকল কার্য্য

করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, অন্য লোকের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে পারেন কি না, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন, ও এই হেতু যাহার যাহা বলিবার থাকিত, প্রতিদিন তাহা মনোযোগ করিয়া শুনিতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির মুখ হইতে কোন সৎপ্রসঙ্গ বা কোন সৎকার্য্যের বিবরণ প্রকাশ হইলে, তদ্দারা রাজার মনও উন্নত হইতে পারে। তিনি দিল্লীশ্বর—তাঁহার ক্ষমতা অসীম, তথাপি তিনি কখন রাগের বশীভূত হইয়া কোন অন্যায় কার্য্য করেন নাই। অন্য রাজারা উপন্যাস শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হয়েন, কিন্তু সম্রাট আকবর নিদ্রিত না হয়েন এই জন্য উপন্যাস শুনিতেন। প্রজাগণ চিরপ্রচলিত প্রথা উঠাইয়া দিলে দুঃখিত হইবে, এই জন্য বাহ্যিক আড়ম্বর কিছু কিছু বজায় রাখিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার ভিতরে কি বাহিরে কোন আড়ম্বর ছিলনা। সম্রাট কোন ধর্ম্ম বা উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি উপহাস বা বিদ্রূপ করিতেন না। কখন সময় অপব্যয় করেন নাই এবং কখনই কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতেন না। সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন; ও আপনার কার্য্য সকল পরীক্ষা করিতেন। প্রত্যুষে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যার সময় ও দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে বাদশাহ সমস্ত দিন কি কি কার্য্য করিলেন তাহা নিজে আলোচনা করিতেন। এবং কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া থাকিলে আপনাকে ঘৃণিত মনে করিতেন।

প্রজাগণ সকলেই সুখে থাকে এইটি তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, এই জন্য তিনি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কাহারও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেন না।

মাংস ভোজনের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। সময় সময় এক মাসের অধিক কাল মাংস স্পর্শও করেন নাই। ইন্দ্রিয় সুখে তাঁহার লালসা ছিল না। দিবা রাত্রির মধ্যে একবার মাত্র আহার করিতেন।

নিদ্রা যাইতে যে অল্প সময় আবশ্যক, তাহা বাদে অবশিষ্ট দিবারাত্রি রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সন্ধ্যার পর ও প্রাতে অল্প নিদ্রা যাইতেন। নানা দেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত নানা দেশীয় রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় অধিকাংশ রাত্রি কাটিয়া যাইত। ঐ সকল শুনিয়া, তন্মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া, স্বীয় রাজ্য শাসনের নিয়ম প্রস্তুত করিতেন। রাত্রিতেই রাজ্য সম্বন্ধীয় যে সকল হুকুম দিতে হইবে তাহা দিতেন। রাত্রি প্রভাত হইবার ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ গায়ক ও বাদকগণ রাজসভায় আসিত ও সুললিত সঙ্গীত দ্বারা সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করিত। ১ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে বাদসাহ নিভৃত স্থানে যাইয়া ঈশ্বরোপাসনা ও আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইতেন।

প্রজারা দিবসে দুইবার রাজ দর্শন পাইত। প্রাতঃকালের উপাসনা সমাধা করিয়া বাদসাহ একবার জানালায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তৎকালে প্রজাগণের আবেদন স্বহস্তে লইতেন। বেলা ৯টার সময়ে দৌলৎখানা নামক প্রাসাদে গিয়া উপবেশন করিতেন। এই স্থানের দ্বার অবারিত ছিল—সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজারা রাজসমীপে নিজ নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিতে পারিত।

সমুদয় রাজকার্য্য করিয়াও বাদসাহ নিজে হাতী, ঘোড়া, অশ্বতর, উষ্ট্র, চিতেবাঘ, পায়রা, কুকুর প্রভৃতি পালিত পশু পক্ষী দিগের আহার ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি করিতেন এবং নিজের ও পরিবারবর্গের আহারের জন্য কি রান্না হইবে তাহাও দেখিতেন।

ইহাকেই প্রকৃত বড়লোক বলে, এবং এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুকুল-তিলক ক্ষত্রীয় রাজপুরুষগণ আকবর সাহের গুণে মুগ্ধ হইয়া, জাতীয় অভিমান ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিতে আপত্তি করিতেন না।



স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ নিয়ম।

আমাদের দেশের লোকেরা পুস্তকে স্বাস্থ্য-রক্ষার কথা পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহাদের পুস্তকের বিদ্যা পুস্তকেই থাকিয়া যায়, তাহা কাজে লাগে না; তাহাতে কত সময় দারুণ অনর্থ ঘটে। অনেকে অসতর্কতা নিবন্ধন স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় লঙ্ঘন করিয়া প্রাণে মারা যান। আজ আমরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাদিগকে কয়েকটী সাধারণ কথা বলিয়া দিতেছি—

১। ভিজা কি ঠাণ্ডা পায়ে কখনও শয়ন করিবেনা।

২। কোন ঠাণ্ডা স্থানে কি পদার্থে পিঠ লাগাইবেনা।

৩। প্রাতঃকালে কিছু না খাইয়া খালিপেটে অনেক দূর হাঁটিবেনা।

৪। অত্যুষ্ণ দ্রব্য পান করিবেনা, কিংবা গরম জিনিস খাইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগাইবেনা, অথবা বাহিরে যাইবে না।

৫। অসুস্থ না হইলে কখনও নিয়মিত স্নান-বন্ধ করিবে না। চামড়ার সম অবস্থা বজায় না থাকিলে স্বাভাবিক শীত তাপ সহের শক্তি লোপ পায়, এবং তাহা হইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ফুস ফুসের ব্যারাম কি অন্য রোগ হইতে পারে।

৬। শারীরিক পরিশ্রম কি ব্যারামের অব্যবহিত পরে, খোলা গাড়ীতে চড়িয়া কিংবা গাড়ীর দরজার নিকট বসিয়া ভ্রমণে বাহির হওয়া নিরাপদ নহে;—তাহাতে স্বাস্থ্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইতে পারে।

৭। কোন কারণে গলার স্বর ভঙ্গ হইলে, যত দূর সম্ভব কম কথা বলিবে। এবং অসুখ সারিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিবে। নতুবা চিরজীবনের মত স্বর ভঙ্গ হইয়া থাকিবে; কিংবা কণ্ঠনালীতে এরূপ কোন ব্যারাম জন্মিবে যে, আজীবন কথা বলিতে ক্লেশ হইবে।

যখন কোন গরম স্থান হইতে ঠাণ্ডা হাওয়াতে যাইবে, তখন মুখবন্ধ করিয়া কেবল নাসিকারন্ধ্র দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস লইবে। নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিলে বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস নাসিকা পথে গরম হইয়া ফুস ফুসে প্রবেশ করে। আর মুখ দিয়া বাতাস গ্রহণ করিলে ঠাণ্ডা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া ফুসফুসের প্রদাহ ও কাশ রোগ জন্মিতে পারে।

৮। ঠাণ্ডা হাওয়াতে কখনও দাঁড়াইয়া থাকিবেনা। বিশেষতঃ পরিশ্রম কি সামান্য ব্যায়াম করিয়া কখনই ঠাণ্ডা হাওয়াতে দাঁড়াইবে না কিংবা গায়ে লাগাইবে না। ঠাণ্ডা কিংবা ভিজা স্থানে পা দিয়া দাঁড়াইবে না।

———

বোবার কথা।

ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম 'ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ।' বুঝিয়াছিলাম, চক্ষু দ্বারা দর্শনের জ্ঞান জন্মে; কর্ণ দ্বারা শ্রবণের জ্ঞান জন্মে; নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণের জ্ঞান জন্মে, ইত্যাদি। শিক্ষক মহাশয় বুঝাইয়াছিলেন যে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি কোন একটী ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলে, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হইবার কথা, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হই। কাজেও তাহাই দেখিয়াছি। দর্শন দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা অন্ধের নাই, শ্রবণ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা বধিরের নাই, ইত্যাদি। কিন্তু যত্ন চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতেছে, এই সকল প্রাকৃতিক অভাবও কতক পরিমাণে পূরণ করিতেছে। চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায়ের বলে আজ, বোবা কথা কহিতেছে, বধির শুনিতেছে।

শিশু যখন প্রথমে কথা কহিতে আরম্ভ করে, তখন কাণে যে প্রকার শব্দ শোনে তাহারই অনুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে। প্রথম অতি সহজ কথা গুলি তাহার মুখ হইতে বাহির হয়, এবং ক্রমে অভ্যাস করিয়া করিয়া তবে স্পষ্ট করিয়া সকল কথা কহিতে পারে। সুতরাং কথা কহিবার জন্য যেমন জিহ্বা ও ঠোঁটের আবশ্যক, তেমনি কাণেরও বিশেষ আবশ্যক। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাদের কাণ নাই, অর্থাৎ শ্রবণ শক্তি নাই—বধির, তাহারা বোবাও হয়। কারণ শিশুকালে, যখন প্রথম কথা বলিতে শিখিবে, বধির বলিয়া তখন কোন শব্দ বা কথা তাহাদের কাণে প্রবেশ করে না। সুতরাং পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিশু কাণে শব্দ শুনিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, তাহা তাহারা পারে না। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, যাহারা জন্মাবধি শ্রবণ শক্তি হীন, তাহারই বোবা হইয়া থাকে। এই শ্রবণ শক্তি নাই বলিয়াই হাবা কালাদের দুরাবস্থা, নতুবা কথা বলিবার যন্ত্রের কোন প্রকার বিকৃতি বা বুদ্ধিবৃত্তির অভাব ইহার কারণ নহে।

সৌভাগ্যক্রমে মানুষের যত্ন ও অধ্যবসায়ে এই দুর্দ্দশাপন্ন হাবা কালাদিগের দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে এক ইন্দ্রিয়ের অভাব আর একটী দ্বারা অনেকটা পূরণ হইতে পারে। শিক্ষা ও অধ্যবসায় বলে একটীর অভাবে যে অসুবিধা, তাহা আর একটীর সাহায্যে দূর করিতে পারা যায়। কাণে শুনিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়া শিশুরা প্রথমে কথা কহিতে শিখে, ইহাই জানিতাম। যাহাদের কাণ নাই—বধির, তাহারা বোবা হইয়া থাকে, ইহাই দেখিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, কাণ না থাকিলেও—বধির হইলেও, চক্ষের সাহায্যে মানুষ কথা কহিতে শিখিতেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকা দেশে ইহার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহাতে আশ্চর্য্য ফলও দর্শিতেছে। চক্ষের অভাবে যে সমস্ত কাজ করা অসম্ভব, অন্ধেরা অনায়াসে সেই সমস্ত কাজ করিতেছে; বোবা কথা কহিতেছে। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।

বোবা ও বধির দিগকে চক্ষের সাহায্যে কথা কহিতে শিক্ষা দিবার প্রণালী অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে বোবা ও বধিরদিগের জন্য একটী জাতীয় বিদ্যালয় আছে। এব্ ডি এপি নামক একজন মানব-হিতৈষী মহাত্মা এই বিদ্যালয়ের স্থাপন কর্ত্তা। পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে ইঙ্গিত ও চিহ্ন দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু সে প্রণালী কঠিন এবং

তাহাতে খুব ভাল ফল হয় নাই বলিয়া, এখন সে প্রণালী পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৮০ সন হইতে এক নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সমস্ত বোবা ও বধিরদিগের বিদ্যালয়েই এখন এই নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এবং অতি আশ্চর্য্য ফল ফলিতেছে। ইঙ্গিত ও চিহ্নের পরিবর্ত্তে এখন ঠোঁট নড়া দেখিয়া কথা কহিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কাণের অভাব এখন চক্ষের দ্বারা পূরণ হইতেছে।

পারিসের এই বিদ্যালয়ে কেবল নয় হইতে বার বৎসরের বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য লওয়া হইয়া থাকে। এই বিষয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এখন দেখিতেছেন যে, ছয় সাত বৎসরের বালক বালিকাদিগকেও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। বার বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগের শিখিবার শক্তি থাকে; কিন্তু তাহার অধিক বয়স হইলে, তাহাদিগের কথা বলিবার যন্ত্র এবং শ্বাস যন্ত্র এরূপ ভাবে গঠিত হইয়া যায় যে, তখন আর তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারা যায় না। একুশ বৎসর বয়স হইলে আর তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে থাকিতে দেওয়া হয় না। যে সমস্ত বালকের স্বাস্থ্য ভাল নয়, মানসিক শক্তি কম এবং দৃষ্টি শক্তি কম, তাহাদিগকে লওয়া হয় না। বিশেষ দৃষ্টি শক্তি কম হইলে কিছুতেই লওয়া হয় না; কারণ এই শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তির উপরই নির্ভর করে।

যাহাদিগের মানসিক শক্তি কম, তাহাদিগের জন্য অধিক যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগের জন্য এক পৃথক শ্রেণী আছে। শিশুরা যেমন শব্দ শুনিয়া প্রথমে তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে; এবং ক্রমে মা, বাবা, দাদা, প্রভৃতি সহজ ও সরল শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া পরে স্পষ্ট কথা কহিতে শিখে; এই বিদ্যালয়েও তেমনি ঠোঁট নাড়িয়া, হাঁ করিয়া মুখভঙ্গি দ্বারা প্রথমে সহজ ও সরল শব্দগুলি উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই রূপে ৪ বৎসর কাল শিক্ষা করিলেই এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, একজন কথা কহিলে তাহার ঠোঁট নড়া দেখিয়া, তাহার সমস্ত কথাই বুঝিতে পারে এবং অনায়াসে সেই প্রকার ঠোঁট নাড়িয়া তাহার সহিত কথা বার্ত্তা বলিতে পারে।

এই প্রথম শিক্ষা শেষ হইলে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এখানেও সেই প্রকার, এই বোবা ও কালাদিগকে সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া এই বোবা ও বধিরেরা নিজে উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এ জন্য প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করিয়া ছুতারের ও লিথোগ্রাফের কাজ, জুতা তৈয়ার এবং বাগান প্রভৃতি তৈয়ার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার শেষ দুই বৎসর নিজ দেশের (ফ্রান্সের) ইতিহাস ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এখানকার এক জন ছাত্র শিক্ষা সম্বন্ধে কোন বিষয়ে হীন থাকে না। এই সমস্ত শিক্ষা শেষ করিতে আরও ৪।৫ বৎসর লাগে। এই সকল বিদ্যালয়ে ৮।৯ বৎসর শিক্ষা করিয়া হাবা কালারা মানুষ হইয়া যায়। এখানকার শিক্ষা শেষ করিয়া ইহারা অনেকে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এবং কেহবা কোন প্রকার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া সৎপথে থাকিয়া, নিজ উপার্জ্জনে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে। পারিসে একটী প্রসিদ্ধ ছাপাখানা আছে, সেখানকার সকল কর্ম্মচারীই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত বোবা ও বধির স্ত্রীলোক। এই ছাপাখানার কাজ নাকি অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চিত্র সম্বন্ধে ও কাষ্ঠের শিল্পকর্ম্মে অনেকে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। ছাপাখানার কাজ অন্ধদিগের দ্বারাও অতি সুন্দররূপে হইতেছে, তাহাদিগকেও শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক বিদ্যালয় আছে।

আমাদের দেশে ইহার একেবারেই অভাব। অন্ধ চিরজীবনই অন্ধকারে রহিয়া গেল, বোবা বধির চিরজীবনই দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া রহিল।



সোণার খাঁচা।

"আয়রে পাখি! আ
মধুর রবে ডেকে ডেকে
প্রাণ জুড়াবে শুনে তো
সুধামাখা ?
"'পিউ' 'পিউ' 'পিউ' মধুর বোলে
নাচ্‌বে খুকী তালে তালে,
খোকা দেবে হাতে তালি—
কোর্‌ব আমি গান।
"নীল আকাশে ধীর বাতাসে
মনের সুখে যাচ্ছ ভেসে,
জাননা ত কষ্ট কত
আছে তোমার তরে—
"গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এলে
পাখী বাসা ভিজবে জলে
ঘুচবে ডাকা ভাঙ্গবে খেলা—
বুঝবে মজা পরে।
"তার চেয়ে এই 'কট্‌রা' করে
রেখে দিছি দুধে সরে,
পেটটি পুরে ঠোঁটটি দিয়ে
মনের সুখে খাবে;
"আর—সকাল বেলা সাঁঝের বেলা
নেচে নেচে কোর্‌বে খেলা,—
রেতের বেলায় সোণার খাঁচায়
সুখেতে ঘুমাবে।"
"রোজ সকালে আদর করে
তোমায় যাদু বুকে ধরে—
একশ করে চুমো দেব
ওই রাঙ্গা ঠোঁটে;—
"কাজকি তোমার কষ্ট করা?
কাজকি শুধু পথে ফেরা?
কে বল সুখ পায়ে ঠেলে
আপনি যদি জোটে?"
পাখী বলে—"খুকুমনি! সোণার খাঁচার চেয়ে
ফিরব বনে স্বাধীন ভাবে কষ্ট জ্বালা পেয়ে।"

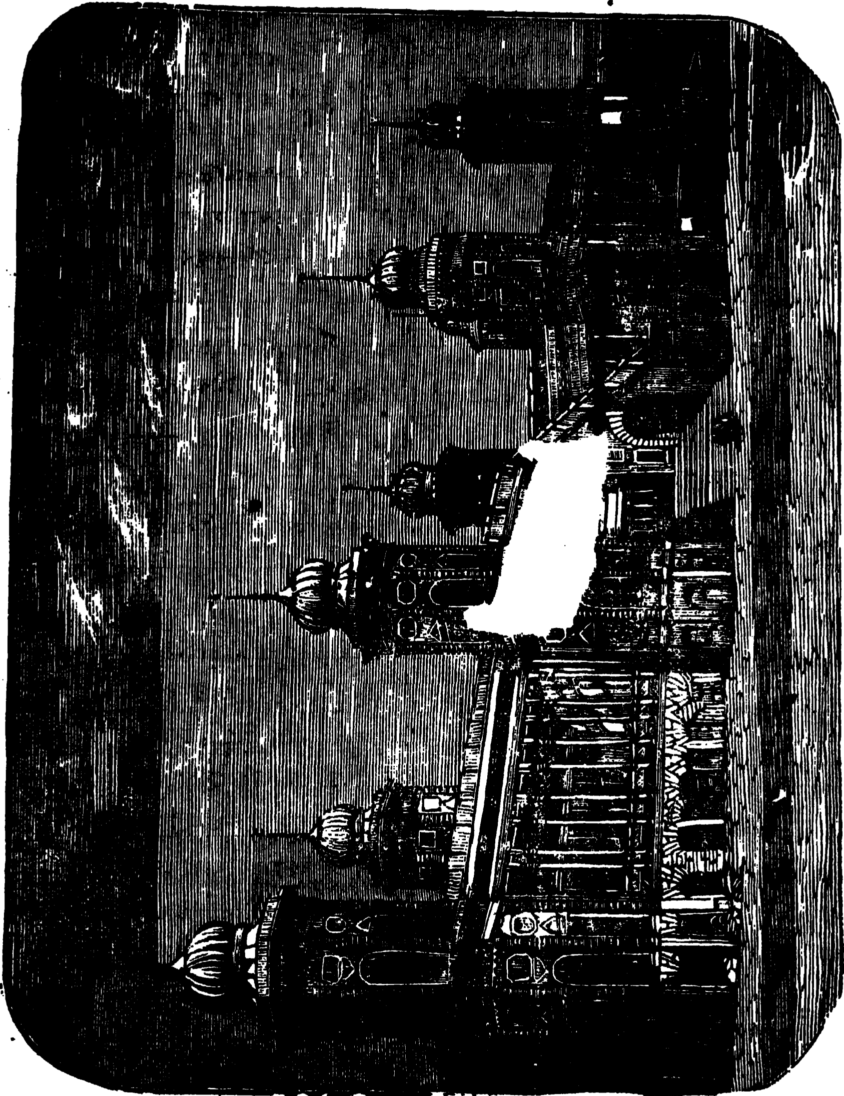
লক্ষ্ণৌ।



যোধ্যা হইতে যাত্রা করিয়া অতি প্রত্যূষে গাড়ী আসিয়া লক্ষ্ণৌ পৌছিল। দূর হইতে লক্ষ্ণৌ নগরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর ও মনোহর। কারুকার্য্য বিশিষ্ট অসংখ্য শ্বেত অট্টালিকা, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাজপথ এবং মনোহর পুষ্পোদ্যানে লক্ষ্ণৌ পরিশোভিত। শোভা ও সৌন্দর্য্যে লক্ষ্ণৌ ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ স্থান।

লক্ষ্ণৌ নগরের দক্ষিণ প্রান্তে একটী খাল এই খালের উপর একটী সেতু আছে, এই সেতু পার হইয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। লক্ষ্ণৌ গোমতী তীরে অবস্থিত; এবং এক্ষণে অযোধ্যার রাজধানী। রামচন্দ্র রাবণ বধের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া, লক্ষ্মণকে লক্ষ্ণৌ ও তাহার নিকটস্থ

স্থানের শাসন ভার দেন। লক্ষ্মণ গোমতীতীরে একটী স্থানে নিজ রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং



তাহার নাম লক্ষ্মণপুর রাখিলেন। প্রাচীন কালের সেই লক্ষ্মণপুরই এখনকার লক্ষ্ণৌ।

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দি, বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ মুসলমানদিগের নির্ম্মিত। ইংরাজদিগের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ দিল্লীশ্বরের অধীন ছিল। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর সাহের রাজত্ব কালে, সদৎ খাঁ নামক একজন খোরাশান দেশীয় বণিক এ দেশে আসিয়া, নিজ কার্য্য দক্ষতায় দিল্লীর দরবারে যথেষ্ট সম্মান ও উচ্চপদ

লাভ করেন। ইংরাজী ১৭২১ সনে তিনি অযোধ্যার সুবাদারের পদ পান। এই সদৎ খাঁই অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাসে অনেকে পড়িয়া থাকিবে যে, এই সদৎ খাঁই দুর্দ্দান্ত নাদির সাহকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা—অসৎ কার্য্যের এমনি বিপরীত ফল যে, সদৎ খাঁ সেই নাদির সাহ কর্ত্তৃকই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া শেষে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সদৎখাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হন। এই সুজাউদ্দৌলার সময়েই ইংরাজী ১৭৬৪ সনে বাক্‌সারের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়, এবং তাহাতে তিনি পরাজিত হন। যুদ্ধে পরাজিত হইলেও লর্ড ক্লাইব নবাবকে অযোধ্যা ছাড়িয়া দেন। এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা রাজত্ব করিতে থাকেন। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার পৌত্র সদৎ আলী খাঁ, তাঁহার রাজ্যে অবস্থিত ইংরাজ সৈন্যের বেতন স্বরূপ, ৭৬ লক্ষ টাকা সর্ত্ত অনুসারে ইংরাজ রাজকে দিতে অসমর্থ হওয়ায়, অযোধ্যা প্রদেশ শাসনের জন্য, লক্ষ্ণৌতে ১৮০৩ সনে, ইংরাজ রাজ একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিলেন। অবশেষে অযোধ্যার শেষ মুসলমান নবাব, অকর্ম্মণ্য বিলাসী ওয়াজিদ আলীসাহা ১৮৫৬ সনে ইংরাজ গভর্ণর লর্ড ড্যালহৌসী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে নির্ব্বাসিত হন; এবং ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া মেটেবুরুজে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বাস করেন। ১৮৮৭ সনে ইঁহার মৃত্যু হয়।

লক্ষ্ণৌতে অনেকগুলি দেখিবার জিনিষ আছে। আমরা প্রথমে চক্ (বাজার) দেখিলাম; তারপর লক্ষ্ণৌর কেল্লা দেখিতে গেলাম, কেল্লাটী দেখিতে খুব সুন্দর। প্রসিদ্ধ কেইশার বাগ লক্ষ্ণৌর একটী প্রধান দেখিবার স্থান। দূর-বিস্তৃত কারুকার্য্য বিশিষ্ট বৃহৎ অট্টালিকাগুলি শোভিত এই মনোহর উদ্যান, মুসলমান রাজত্ব কালে ভারতের একটী প্রধান দেখিবার স্থান ছিল। কেইশার বাগের এক অংশের ছবি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দিলাম, পূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্য এখন অনেকই গিয়াছে। কেইশার বাগের চারিদিকে চারিটী গেট আছে। বিলাসী নবাব ওয়াজিদ আলী সাহের নাকি এই কেইশার বাগে ৫২ টী অন্দর মহল ছিল। এই বেগম মহল এখন মিলিটারী জেল (military jail) অর্থাৎ সেনাকয়েদীদের বাসস্থান। ইহার মধ্যস্থলে ক্যানিং কলেজ এবং পশ্চিম প্রান্তে গভর্ণমেণ্টের আফিসগুলি স্থাপিত হইয়াছে। কেইশার বাগের মধ্যে জয়পুরের শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ আছে। মাটির তলায়ও এখানে অনেকগুলি ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, নবাব ঐ সকল ঘরে গ্রীষ্ম কালে বাস করিতেন। মার্টিন নামক একজন ফরাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত লা মার্টিনিয়ার কলেজ বাড়ীটি অতি সুন্দর; বাড়ীটি সাততলা। লক্ষ্ণৌর পুরাতন রাজভবন ছত্র মসজিদ বা ছত্র মঞ্জিলটীও একটী দেখিবার জিনিষ। এই মঞ্জিলটী পাঁচতলা, একটী তলা মাটীর মধ্যে আছে। ইহার মস্তকে একটী প্রকাণ্ড ছাতি আছে, এই জন্যই ইহাকে ছত্রমঞ্জিল কহিয়া থাকে। এই ছাতিটী এক সময়ে নাকি স্বর্ণ মণ্ডিত ছিল এবং মণি মুক্তার ঝালরে শোভা পাইত; এক্ষণে উহা গিলটীর। এই ছত্র মঞ্জিল এক্ষণে একাউন্টেণ্ট আফিস ও লক্ষ্ণৌবাসী ইংরাজের ক্লাবগৃহ হইয়াছে।

বেলীগার্ড, (Bailey guard) পুরাতন রেসিডেন্সী, ইতিহাসের একটী বিখ্যাত স্থান। একটী উচ্চস্থানে এই প্রকাণ্ড তৃতল বাড়ীটি নির্ম্মিত। বেলিগার্ড দুইটী উচ্চচূড়ায় শোভিত ছিল এবং ইহার প্রাচীর অতিশয় প্রশস্ত ছিল। কিন্তু এখন ইহার ভগ্নাবস্থা; যেন গত ঘটনা সকল স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই আজও রহিয়াছে। ১৮৫৭ সনে

সিপাহি বিদ্রোহের সময় এইখানে একটী যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহের সময় প্রাণ রক্ষা করিবার আশায় প্রায় এক হাজার ইংরাজ, স্ত্রী পুত্র লইয়া এই রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লন। স্যার হেন্‌রি লরেন্স এই খানেই, পাঁচ শত ইংরাজ সৈন্য ও পাঁচ শত দেশীয় সৈন্য লইয়া, ছয় মাস পর্য্যন্ত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ কালে প্রাচীরের যে সকল স্থানে, বন্দুক ও কামানের গোলাতে যে সকল চিহ্ন হইয়াছিল, অথবা যে সকল স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, একটু একটু বিবরণ সহিত তাহা সেই অবস্থায়ই রাখা হইয়াছে। এইখানে একটী সমাধিক্ষেত্র আছে। অবরোধের সময় যে সকল ইংরাজ পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার মৃত্যু হইয়াছিল, এইখানে তাহাদিগকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। দুই একটী সমাধি স্তম্ভের লেখা পড়িলে মনে বড় কষ্ট হয়। সমাধিস্তম্ভ গুলির মধ্যে হেনরি লরেন্সের সমাধি স্তম্ভই সকলের অপেক্ষা উচ্চ এবং মনোহর। জেনারেল হ্যাবলক, মেজর আউটরাম, জেনারেল নীল প্রভৃতি বীরগণও লক্ষ্ণৌতে প্রাণত্যাগ করেন। জেনারেল নীল যেখানে হত হন সেই স্থানে, স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটী তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় যে সকল দেশীয় লোক, ইংরাজের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের স্মরণ চিহ্নস্বরূপও একটী স্তম্ভ এখানে নির্ম্মিত হইয়াছে। আলম বাগ ও সেকেন্দর বাগ নামক আর দুইটী যুদ্ধক্ষেত্র লক্ষ্ণৌতে আছে। আলমবাগে জেনারেল হ্যাবলকের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। সেকেন্দর-বাগে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে হৃৎকম্প হয়। ইংরাজ সৈন্যেরা এইস্থানে দুই হাজার সিপাহিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করে! শিল্প ও কারু-কার্য্যের ভূষণ স্বরূপ লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়ী আর একটী প্রধান দেখিবার স্থান। সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফউদ্দৌলা ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইমামবাড়ী দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোহর। কিন্তু ইহা যে কেবল সুন্দর ও মনোহর তাহা নহে; ইহা যেমন দৃঢ় তেমনি প্রকাণ্ড এবং বিস্তৃত। ইহার একটী হল ১২০ হাত দীর্ঘ। অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে আজব ঘর (মিউজিয়ম), মচ্ছিভবন, হোসেনাবাদ প্রভৃতি মসজিদগুলি এবং বারাণসীবাগ প্রভৃতি মনোহর উদ্যানগুলি প্রধান।

বৃষকেতু।

সেদিন আর নাই। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন লোক আজ কাল কয়জন পাওয়া যায়? এমন পিতৃভক্ত বালক আজ কালকার দিনে কি একটীও মিলে, যে জীবনকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পিতার সত্য রক্ষা করিতে পারে। হরির নামে জীবন উৎসর্গ করিতে, হরিকে নিজের হৃদয়ে বিরাজিত জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিতে—বালক ত দূরের কথা—প্রবীণের মধ্যে কয়জনে পারে? তাই বলিতেছিলাম সেদিন আর নাই। এদিনে আদর্শ বালক খুঁজিয়া পাওয়া ভার, আমরা তাই পুরাণকালের দুই চারিটী বালকের আদর্শ-চরিত্র সখার পাঠক পাঠিকাদের নিকট উপস্থিত করি—ভরসা করি এই সকল বালকের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া, নিজের চরিত্র গঠন করিতে সখার পাঠক পাঠিকারা সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। এমন কথা অবশ্য আমি বলি না যে, সখার পাঠক শ্রেণীর মধ্যে কোন বড় লোকের ছেলে, সৎমায়ের বাক্য যন্ত্রণায়, মনের

দুঃখে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া, ধ্রুবের মত হরির সাক্ষাত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, অথবা প্রহ্লাদের মত অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, কিম্বা বৃষকেতুর মত হরিগুণ গান করিতে করিতে, তীক্ষ্ণ করাতের ধারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। আমরা বলি এই সকল বালককে আদর্শ রাখিয়া সকল বালকই সাধু চরিত্র গঠন করিবে। অধ্যবসায়,যত্ন,একাগ্রতা, উৎসাহ, সরলতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল শিক্ষা করিবে। এই প্রস্তাবের শীর্ষ-ভূষণ বালককে সকলেই জান। যাত্রা গানে, ঠাকুরমার মুখে, বটতলার শিশুবোধকে সকলেই ইহার বিষয় অবগত আছ। পুরাণ কথার বিবরণ করা কেন? পুরাণ কথা নূতন করিয়া বলিতে পারিলে সে মন্দ নয়। কিন্তু আমার সে উদ্দেশ্য নয়। সখায় এসব কথা থাকিলে বালকেরা একটু আগ্রহ করিয়া পড়িবে এবং সাধু প্রস্তাবের যতই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা যায় ততই ভাল; এই সব বিবেচনায় বৃষকেতুর আদর্শ চরিত্রটী সখায় প্রকাশিত হইল।

ভাগলপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী কতিপয় প্রদেশ লইয়া একটি রাজ্য ছিল তাহার নাম অঙ্গ। এই অঙ্গ দেশে কর্ণ রাজা ছিলেন, কর্ণ ভিন্ন অর্জ্জুনের সমকক্ষ আর যোদ্ধা ছিল না। ভারত যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন সমস্ত রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল, সেই সময় কর্ণ খুব প্রশংসার সহিত অঙ্গ রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কর্ণ যেমন বীর ছিলেন তেমনি দাতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। সে সময়ে ইঁহার সমান দাতা ভারতবর্ষে আর ছিল না। কর্ণের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী, এবং ইহাদের একমাত্র পুত্র বৃষকেতু। বৃষকেতু পঞ্চম বর্ষীয় বালক, হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়, হরিনাম করিয়া হরিভক্ত পিতামাতার মনে অমৃত ঢালিয়া দেয়। আমাদের সেই চক্রী ঠাকুরটী কর্ণের দাতৃশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একদা ছদ্মবেশে কর্ণের আলয়ে উপস্থিত হয়েন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে একাদশীর পরদিন কর্ণের নিকট আহার প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। দেবতারা সেকালে প্রায়ই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যালয়ে দেখা দিতেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন দেবতা মানুষকে বিবাহ করিবার জন্য স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু আজ কাল আর দেবতাদের তেমন ভাবটী নাই, সাধ্য সাধনা করিয়াও দেখা পাওয়া যায় না। আমি ভরসা করি সখার কোন পাঠক পাঠিকা দেব দর্শন লালসায় উৎসুক হইবে না। দেবতার সাহায্য পাইবার জন্য কেহ নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবে না। শিক্ষকের নিকট তিরস্কৃত হইয়া হরিনাম জপ করিয়া হরিদর্শন প্রত্যাশা করিবে না। কারণ সেদিন নাই, সে দেবতাও নাই। এখন যে দেবতা আছেন তিনি সকলেরই সমান। তিনি উদ্যমশীল, কার্য্য তৎপর বালকেরই সহায় হইবেন। নিরুদ্যম নিশ্চেষ্ট যে বালক, সে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইবে না, বরঞ্চ তাঁহার ঘৃণার পাত্র হইবে। প্রবাদ আছে "Heaven helps those who help themselves", ওসব কথায় আর দরকার নাই, যাহা লিখিতেছিলাম—কর্ণের নিকট সংবাদ গেল,এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারদেশে তাঁহার প্রতীক্ষায় আছেন। কর্ণ তাড়াতাড়ি করিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন, আসিবার সময় তাঁহার বাম নেত্র,বাম বাহু,নৃত্য করিতে লাগিল। ঠাকুরমার কাছে তোমরা শুনিয়া থাক, পুরুষের বাঁ চোক নাচিলে বা বাম অঙ্গ নাচিলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হয়। দৃষ্টান্ত দিতে ঠাকুরমা বড় পটু। হয়ত তিনি বলিবেন, ঐ সেদিন আমার ডান চোক নাচিতেছিল তাহার কিছুপরেই তোর জেঠা মশায় (ঠাকুরমার বড় ছেলে) জর হয়ে বাড়ী এলো। আমি মনে করি তোমাদের কেহই ঠাকুরমার নিকট এইসব কথা

শুনিয়া বিশ্বাস করিবে না। কারণ একগাঁয় ঢেকি পড়িলে আর গাঁয়ের লোকের মাথা ধরে না। আমার চোক নাচিল—ব্যামো হল আমার ছোট বোনের। আর চোক নাচার সঙ্গে মঙ্গল অমঙ্গলের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। আমাদের শরীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত সঞ্চালনী শিরা আছে। হৃদপিণ্ড হইতে সর্ব্বদা সেই শিরা দ্বারা সমস্ত দেহে রক্তের চলাচল হইতেছে। এই রক্তের চলাচলে একটু তারতম্য হইলে শিরা নাচিয়া উঠে, এসব কথা অন্য প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, হাঁচি পড়িলে, টিকটীকি ডাকিলে, কোন কার্য্যে বাধা হয় না, কোন অঙ্গ নৃত্য করিলে, কাহারো মঙ্গলামঙ্গল হয় না। কর্ণ খুব বীর ছিলেন সত্য, কিন্তু কুসংস্কারের নিকট তিনি অবনত মস্তক ছিলেন। তাঁহার মনে হইল আজ কোন অমঙ্গল ঘটনা হইবে সন্দেহ নাই। এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি সেই বৃদ্ধ ঠাকুরটীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কর্ণ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমি কাল একাদশী করিয়াছি এখনও আহার করি নাই, তুমি আমাকে উত্তম রূপে আহার করাও—বিলম্ব করিও না ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। ব্রাহ্মণের সামান্য আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া কর্ণের একটু সাহস হইল। আমুন রন্ধন প্রস্তুত প্রায়, রাণী পদ্মাবতীকে বলিয়া আপনার আহারের যোগাড় করিয়া দিতেছি। নতুবা কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন পদ্মাবতী স্বয়ং রন্ধন করিয়া আপনাকে পরিতোষ ভোজন করাইবেন।

তোমাদের মনে হইতে পারে বৃদ্ধটী ব্রাহ্মণ, কর্ণও কি ব্রাহ্মণ না? তাহা নহে। কর্ণ ক্ষত্রিয়। সেকালে বিবাহে বা আহারাদি কোন কার্য্যে জাতিগত প্রভেদ রক্ষিত হইত না। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ের অন্ন গ্রহণ করিতে বা তাহাদের কন্যা বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মোটের উপর বলিতে গেলে এখন যেমন জাতিভেদের আঁটাআঁটি বন্ধন, সেকালে তাহা ছিল না। ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের অনুগ্রহে আজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জল গ্রহণ করেন না।

যাহা হইক রাজা কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলে আমি তোমার গৃহে আহার করিব না। কর্ণ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, ব্রাহ্মণ মাংস দ্বারা একাদশীর পারণ করিতে চাহিলেন।

"পক্ষী মাংস মৃগ মাংস যেবা রুচি হয়,
অনুমতি কর তাহা আনি মহাশয়।"

রাজা এই কথা বলিলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, নরমাংস না হইলে আমার আহার হয় না। তুমি বড় দাতা—বহুদিবস আমার মাংস খাওয়া যোটে নাই—আজ তুমি তোমার পুত্র বৃষকেতুর কোমল কচি মাংস দ্বারা আমার তৃপ্তি সাধন কর।

(ক্রমশঃ।)

প'ড়ো বাড়ী

(গত সংখ্যার ১১২ পৃষ্ঠার পর।)

(৪)

একটী দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখটা কিছু আঁধার আঁধার, কিন্তু গেটের মধ্যে একটী আলো জ্বলিতেছে, গেটে একজন দরওয়ান বসিয়া আছে। আমার গাড়ী হইতে নামিয়া দুই তিন মিনিট চলিয়াই এই বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। আমরা

যাইবা মাত্র দরওয়ান উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল; তখনই আর একটী লোক একটী সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়া আমাকে উপরে লইয়া গেল; সঙ্গের লোকটী তখন জিনিষ পত্রগুলির তদ্বির করিতেছিল। বন্ধুকে দেখিবার আগ্রহে এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবেই সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। খুব বেগে দরজা বন্ধ করিলে যে প্রকার শব্দ হয়, এও সেই প্রকার শব্দ। তার পরেই গাড়ী খানা চলিয়া যাইবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যাই হউক অতিকষ্টে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম, কারণ সিঁড়িটী যেমন সংকীর্ণ, তেমনি আলো ও বায়ুশূন্য এবং স্থানে স্থানে ভগ্ন। আমার বন্ধুটী বেশ অর্থশালী লোক, তিনি এমন বাড়ী করিয়াছেন দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলাম, এবং এ পর্য্যন্ত বাড়ীর কোন ছেলে পিলেকে না দেখিয়া আরও কিছু বিস্মিত হইলাম। যাহাই হউক উপরে ত উঠিলাম, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে বাড়ীর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। উপরে উঠিয়াই সম্মুখে একটী ছোট গোছের ঘর দেখিতে পাইলাম; ঘরের মধ্যে বসিবার জন্য একখানি বিছানা পাতা রহিয়াছে এবং একটী দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। চাকরটী আমাকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "আপনি এইখানে বসুন, আমি বাড়ীর ভিতর খবর দিয়া আসি।" এই বলিয়াই সে চলিয়া গেল, আমি তাহাকে কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। আমার সকলই কিছু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া আমাকে কখনও বাহিরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার সহিত আমার বাল্যকাল হইতে অতিশয় সৌহার্দ্দ্য; আমাদের উভয় পরিবারে আত্মীয়তা এত অধিক যে আমরা পরস্পরকে এক পরিবারের ন্যায় দেখিয়া থাকি। তার পর এতক্ষণ পর্য্যন্ত এ বাড়ীর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ইহারই বা কারণ কি? তবে কি আমার বন্ধুর কোন কঠিন ব্যারাম? এই জন্যই কি কাহাকেও দেখিতেছিনা? বসিয়া এই সকল চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সেই লোকটী পুনরায় আসিয়া আমাকে বলিল, "বাড়ীর ভিতর চলুন।"

(৫)

চিন্তিত মনে তাহার সঙ্গে চলিলাম। একটী সংকীর্ণ পথ দিয়া একটী ঘরের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। ঘরের মধ্যে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে অতিশয় বিস্মিত হইলাম। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম, আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। সেখান হইতে দৌড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা হইল। পলকে একবার পিছন-দিকে চাহিলাম, চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বুক শুকাইয়া গেল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, প্রকাণ্ড লাঠি হাতে, একটা ষণ্ডাকৃতি লোক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া একটু একটু হাসিতেছে, সেই হাসিতে তাহার বিকট মুখের চেহারা আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। আমার চক্ষু তাহা হইতে আপনিই ফিরিয়া আসিল। ফিরিবা মাত্র যে লোকটী আমার সহিত পূর্ব্বদিন আমার কর্ম্ম-স্থানে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমার সম্মুখে দেখিলাম। তিনি আমাকে সম্ভা-ষণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয় বসুন, সৌভাগ্য ক্রমে আপনার সহিত আজই সাক্ষাৎ হইল, আমার যে প্রয়োজন টুকু ছিল তাহা এইখানেই হইতে পারিবে।" এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিলেন, ঘরে আর কতকগুলি লোক ছিল, তাহারা বিকট রবে হাসিয়া উঠিল। আমি বসিলাম না। পূর্ব্বদিনের সেই লোকটিকে

দেখিয়া আমার অত্যন্ত রাগ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমাকে কাল আমি ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলাম, এখন বুঝিলাম তুমি অতিশয় অসৎ লোক। আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না, কি মতলবে তুমি আমাকে এখানে আনিয়াছ, এবং আমার সহিত তোমার প্রয়োজনই বা কি? যাহাই হউক শীঘ্র বল, আমি এ প্রকার স্থানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে চাহি না। লোকগুলি আমার এই কথায় আবার বিকটরবে হাসিয়া উঠিল, আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিতে লাগিল। লোকটা আমাকে আবার বসাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল,—"প্রয়োজন এমন কিছু না, সামান্য প্রয়োজন, একটু স্থির হইয়া বসুন বলিতেছি, আর তাহাই বলিবার জন্য আপনাকে এ কষ্টটুকু দিতে হইয়াছে। কিছু মনে করিবেন না।" লোক গুলি আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি নিরুপায় হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও বসিলাম। এ প্রকার কদর্য্য স্থানে আমি কখনও বসি নাই। মাঝারি গোছের একটা ঘর, মেজেতে একটা সতরঞ্চি পাতা, এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। বিছানার উপর প্রায় ৮।১০ জন ষণ্ডা গোছের হিন্দুস্থানী বসিয়া আছে, আর সেই লোকটা সকলের মধ্যস্থলে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে মদের বোতল ও গ্লাস, তামাক এবং গাঁজা উভয়ই চলিতেছে। এই উভয় পদার্থের ধুমে এবং গন্ধে ঘর পূর্ণ হইয়াছে। আমি বসিলে লোকটা বলিতে লাগিল,—"মহাশয় আমার প্রয়োজন বিশেষ কিছু নহে অতি সামান্য; কিছু টাকার আবশ্যক হইয়াছে, এই জন্যই আপনাকে একটু কষ্ট দেওয়া, আমার কালই আটহাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন, তাই আপনাকে এখানে আনাইয়াছি, আর বিশেষ কিছু নয়। ইহাদের মতলব বুঝিলাম। বুঝিলাম এ একটী জুয়াচোরের দল, এই প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করাই ইহাদের কাজ। বুঝিলাম বন্ধুর পত্র জাল পত্র, ইহাদেরই লেখা। যে লোক ষ্টেশন হইতে আমাকে লইয়া আসিয়াছে, সে ইহাদেরই লোক। যে লোকটা আমার সহিত পূর্ব্বদিন সাক্ষাৎ করিয়াছিল সে ইহাদেরই অধিপতি। আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে কাঁপিতে লাগিল। আমি অতিশয় রাগের সহিত বলিলাম, তুমি যে এমনতর বদমায়েস তাহা আমি বুঝি নাই, এই প্রকার জুয়াচুরী করিয়াই তুমি লোকের সর্ব্বনাশ কর। আমার নিকট হইতে একটী পয়সাও পাইবে না, যদি ভাল চাও আমাকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। যে লোক-গুলি সেইখানে বসিয়া এতক্ষণ হাসি ঠাট্টা করিতে-ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার এই কথায় ভয়ঙ্কর রাগিয়া উঠিল, কেহবা আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সেই লোকটী তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"মহাশয় এখানে জোর করিতেছেন বৃথা। টাকার আমার বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং আপনি ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন আর যে আপনাকে ছাড়িয়া দিব, তাহা পারিতেছি না, ক্ষমা করিবেন। সহজে যদি আপনি না দেন তবে এই যাহাদিগকে দেখিতেছেন ইহারা জোর করিবে, তাহাতেও যদি আপনি স্বীকৃত না হন, তবে জানিবেন যে, ইহারা প্রাণ লইতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই ভয়ানক কথা শুনিয়া আমার মনে অতিশয় আতঙ্ক হইল। বুঝিলাম যে ইহারা কেবল জুয়াচোর নহে, নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি, ডাকাতি, সকলই ইহারা করিয়া থাকে; বুঝিলাম জোর করিয়া এখন আর কোন লাভ নাই। কোন মতে এখন ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই হয়।

(আগামীবারে শেষ হইবে)



সেপ্টেম্বর, ১৮৯২।



বিবিধ।

একজন দন্ত চিকিৎসক অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, যাঁহাদের দাঁতের কন্‌কনানি আছে, তাঁহারা যতক্ষণ একখণ্ড জলন্ত পাথুরে কয়লা পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিতে পারিবেন, ততক্ষণ অসহ্য দাঁতের কন্‌কনানিও আর থাকিবে না।

* *
*

গোবর্দ্ধন বাবুর এককালে বেশ দু পয়সা ছিল, সম্প্রতি অতি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। একদিন গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলেন জান্‌লা খুলিয়া ঘরে কে প্রবেশ করিতেছে,—বুঝিলেন চোর। গোবর্দ্ধন তখন বলিলেন, "বাপুহে চুরি করিয়া কেবল ঋণের দায়ে পড়িবে, ঋণের খত পত্র ভিন্ন আর কিছু আমার ঘরে নাই।"

*
* *

কালাচাঁদ চৌধুরী সেকেলে লোক—সম্পর্কে আমাদের ঠাকুরদাদা হন। বয়সকালে গায়ে বিলক্ষণ বল ছিল। সেদিন দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, "ভায়াহে, এখন আর শরীরে কি আছে, যে বল গায়ে ছিল, তার তুলনায় এখন এক প্রকার মরিয়াই আছি। "এই দেখনা"—এই বলিয়াই, আমি তাঁর কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া ছিলাম, আমাকে সুদ্ধ সেই চেয়ার খানা একহাতে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন, বলিলেন "এই দেখনা এতেও আমার এখন কষ্ট হয়!"

*
* *

কোন চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিলেন যে 'মনুমেণ্টের ন্যায় উচ্চ স্থান হইতে একজন লোক পড়িয়া গেলে তোমরা তখন কি করবে?' ছাত্রেরা তাহাকে চেতনা করিবার উপায় এবং ভগ্ন স্থান গুলি যে প্রকারে বাঁধিয়া দিতে হইবে, সেই সমস্ত যাহা তাঁহার কাছে শিক্ষা করিয়াছিল তাহা একে একে সমস্ত বলিল। শিক্ষক ঘাড় নাড়িলেন। ছাত্রেরা তখন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে কি করিতে হইবে?' শিক্ষক বলিলেন, 'এ প্রকার অবস্থায় চিকিৎসার জন্য কেবল এক গাছি ঝাঁটার দরকার, আমি এ প্রকার রোগীকে ঝাঁট দিয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া দি! কারণ যে মনুমেণ্টের ন্যায় উচ্চ স্থান হইতে পড়ে, তাহার আর অন্য চিকিৎসার দরকার হয় না।'

*
* *

একবার একখানি পত্রিকায় একটী বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে, পাঁচটাকা দিলে দু পয়সার টিকিটে কি প্রকারে চার পয়সার টিকিটের কাজ হয়, তাহা এক ব্যক্তি বলিয়া দিবেন। অনেকে এই উপায় জানিবার জন্ম টাকাও দিল। যাঁহারা টাকা দিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে বিজ্ঞাপন দাতা তাঁহাদিগকে জানাইলেন, "দুখানা টিকিট ব্যবহার কর।"

*
* *

শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বলত বিপিন ধূলা পদার্থটা কি?' বিপিন অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বালক, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'কাদার রস নিংড়াইয়া নিলে যাহা থাকে তাহাই ধূলা।'

*
* *

'দেখ ভাই দেবেন, ও বাড়ীর চারু এত মোটা হয়েছে, তার পেটটা এত ভারি হয়ে পড়েছে যে, আজ পাঁচ বছর পর্য্যন্ত সে নিজের পা নিজে দেখ্‌তে পায় না।' নগেন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র দেবেন্দ্র বলিয়া উঠিল 'সে আর বেশী আশ্চর্য্য কি? আমাদের সঙ্গে একটী ছেলে পোড়তো সে এত লম্বা ছিল যে, স্নান করে মাথা মুছবার সময় তাকে মই লাগিয়ে মাথা মুছুতে হ'ত।" ফণী বলিল' সেই বা বেশী আশ্চর্য্য কি? আমার এক মাসতুত ভাই এত লম্বা ছিল যে, তার যদি মাসের ১লা তারিখ পায়ে ঠাণ্ডা লাগ্‌তো তবে ঠাণ্ডা লাগার দরুণ সর্দ্দি হ'য়ে হাঁচি, প্রভৃতি সর্দ্দির লক্ষণ দেখা দিত সেই মাসের ২৫ শে কি ২৬ শে!'

*
* *

'তাইতো হে যোগীন, কোথা থেকে পড়ে হাত ভাঙ্গলে?'

'সিঁড়ি থেকে।'

'কেমন করে পড়লে?'

'দেখুন দেখি কতখানি অন্যায়, আমি নীচে যাব বলে তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, তা দিদি অমনি বলে উঠলো, 'যোগীন ভাই ধীরে ধীরে যাও, অত দৌড়েগেলে পড়ে যাবে।' তা আমি কি হাতে অত কথার বাধ্য হ'য়ে চল্‌তে পারিনে, বিশেষ আমি পুরুষ হ'য়ে স্ত্রীলোকের কথামত কাজ করবো? তাই যাই দিদি ঐ কথা বলেছে, আর ধীরে ধীরে না গিয়ে আমি একেবারে হুড়মুড় ক'রে নীচে গিয়ে প'ড়েছি।'

"সাবাশ তেজ বটে?

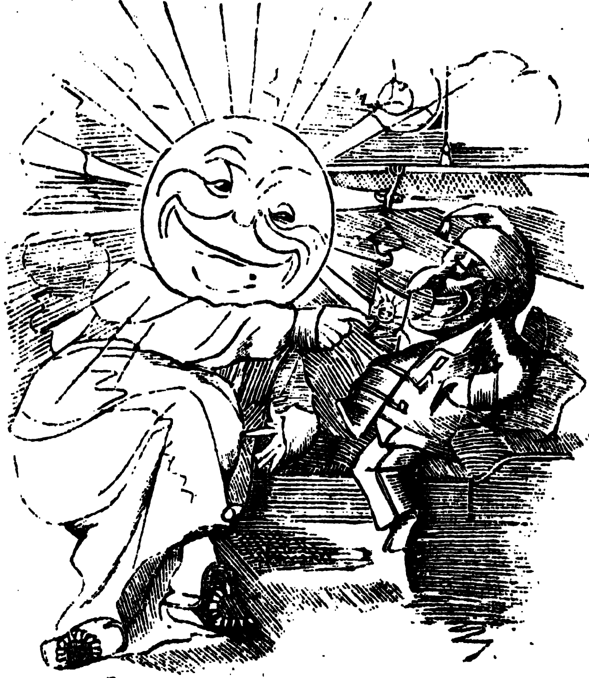
*
* *

এদেশে যাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন বিলাতে তাঁহাদিগকে সিভিল সারভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে হয়। এবারকার এই পরীক্ষাতে শ্রীকিরণচন্দ্র দে এবং শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন গুপ্ত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা দুইজনেই এখানকার খুব ভাল ছেলে। কিরণচন্দ্র বি এ পরীক্ষায় প্রথম হন এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন এম্ এ, পরীক্ষায় প্রথম হন।

*
* *

কস্তুরী গাছের চাষ বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে হয় না। সখার যে সকল গ্রাহক কস্তুরী বীজের জন্ম মাশুল পাঠাইয়াছেন তাঁহাদিগকে বর্ষার পূর্ব্বে বীজ পাঠান যাইবে। যদি কেহ মাশুল ফেরত চাহেন, তাহাও পাইতে পারিবেন।

পূজার গল্প।



(১)

"পূজো এল হাড় জুড়োল মজা হ'ল ভাই,
বই টই সব বাক্সে তুলে খেলায় মেতে যাই।"
কিন্তু বাবু এইনা বলে ষষ্ঠী পূজোর দিনে
লেগে গেলেন পোষাক নিয়ে সাজতে আপন মনে।
যত্ন করে নতুন জামা তুলে দিলেন গায়,
জরী দেওয়া চটি জুতো পুঁছে দিলেন পায়;
রুমাল, কোঁচা, কোন কিছু রইল না আর বাকি—
হলনাক কেবল সিঁথি—চুলের বেলায় ফাঁকি।
সেজে গুজে চেয়ে চেয়ে মেটেনা আর আশ
ভাবেন মনে সবার কাছে হবেন পরকাশ।
নিরিবিলি এমন শোভা সাজে কি কখন?
মরু ভূমির মাঝে যেমন গোলাপ শোভন।
অরণ্যেতে সাজেনা যে গায়ক লোকের গান
ঘরের কোনে বাবু গিরি শুধুই কাঁদে প্রাণ!
"তাইতে" ভাবেন "যাব আমি দেখাব সবায়
এমন বাহার দেখে পাছে মুচ্ছো সবাই যায়"।!
কিন্তু বাবু এই না বলে হেসেই অস্থির
আতর গোলাপ গায়ে মেখে হ'লেন বাহির।

(২)

পূজার দিনে এত মানুষ রাস্তা চলা ভার,
যে যার মনে যাচ্ছে ধেয়ে কেউ ধারে না কার।

এত মানুষ আছে ধরায়—শিউরে ওঠে গা—
রাস্তা ঘাটে ধরে না আর চ'লছে পায়ে পা।
এত মানুষ দেখে কিনু ভাবেন মনে মনে
"কিনু বাবু আজ্‌কে বড় এত লেকের জ্ঞানে" !!
মানুষ গুলো বড়ই হাবা আমার দিক না চায়—
মুখের দিকে চেয়ে সুধু মুচকি হেসে যায় !
যত লোকে হেসে চলে কিনু ওঠেন কেঁপে—
জরীর চটীর "চটচটানি" ত্রিভুবন কাঁপে।
এমন কালে দেখা হ'ল বেচু বুড়োর সাথে—
রসিক বুড়ো ব'সে আছে আয়না ক'রে হাতে।

(৩)

বেচুর রূপে ভুবন মাতে কবির আকুল প্রাণ—
শুক পাখীর চঞ্চু জিনি নাসিকা প্রমান।
"দাড়ীটিও নাকের মতন—যেন নীচের ঠোঁট—
বুড়ো গায় যত্ন ক'রে দেছেন সাটিন কোট—
পায়জামা পরে বুড়ো আয়না হাতে ক'রে—
নাকের বাহার দেখ্‌চে ব'সে 'গরম পোষটী' শিরে।
এমন সময় কিনু ভায়া হ'লেন আগুয়ান—
বুড়োর রূপের বাহার দেখে হেসে আকুল প্রাণ।
হাঁয়ের দুটী কোনা গিয়ে লাগলো দুটী কানে।
উপুড় হ'য়ে পড়ে গেলেন বাঁচেন্ না আর প্রাণে।
মোটা মোটা গাল দুটীতে ঢেকে গেল চোক।
সাধের জামায় মাটী লাগে যায়না হাঁসির ঝোক॥
বেচু বুড়ো সেয়ানা বড় কিনুর গতিক দেখে
ঘুরিয়ে ধরে আয়না খানা কিনু বাবুর দিকে।
হরি! হরি !! ভেতরে ও কাহার চেহারা,
টাক পড়া গোল মাথা নাক পেটা গড়া।
আকর্ণ "বিস্তার" হাঁটী কর্ণ অপরূপ—
মুখের গহ্বর বুঝি হবে অন্ধকূপ !
আপনার রূপে কিনু হ'লে প্রত্যায়িত
বেচু বুড়ার পায়ের ধুলো লইল ত্বরিত।
বলে হেসে "বেচুদাদা আমরা দুভাই—
রূপে অতুলন দোঁহে হেন কেহ নাই।"



তারা।

তারা আজ মৃত্যু শয্যায়। তারা ১১ বৎসরের বালিকা, বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। অল্প বয়সেই তারাকে লইয়া তারার মাতা বিধবা হন। ঐ মেয়েটি ভিন্ন সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না। মেয়েকে মানুষ করিয়া এবং মেয়ের মুখ চাহিয়াই তিনি সব দুঃখ ভুলিয়াছিলেন। তারা বড় হইবে, দিব্য জামাই আনিয়া তারার বিবাহ দিবেন। তারার ছেলেপিলে হইবে, তাহাদিগকে কোলে করিয়া কত সুখী হইবেন—তারার মাতা এই রূপ কত আশাই করিতেন। তারাই তাঁহার সর্ব্বস্ব, তারার চিন্তা ব্যতীত তাঁহার আর কোন চিন্তাই ছিল না। তারা বই তিনি আর কিছুই জানিতেন না। আজ সেই জীবন সর্ব্বস্ব তারা ধন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিল। একি সহ্য হয় ? তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল,—তিনি সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

দেশে অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অনেক লোক মরিতেছিল। যাঁহাদিগের অবস্থা সচ্ছল, তাঁহাদিগের মধ্যে যথা সম্ভব চিকিৎসা ও যত্নের ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু গরিব দুঃখী যাহারা তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। একে তাহা-

দিগের মধ্যেই সাধারণতঃ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশী দেখা যায়। তারপর এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের চিকিৎসাদি হওয়া একবারে অসম্ভব। সুতরাং অনেক লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছিল ক্রমে এমন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল যে, হতভাগ্য রোগীদিগের একটু যত্ন ও শুশ্রূষা হওয়া দূরে থাকুক, দারুণ পিপাসার সময় তাহাদিগের মুখে একটু জল দেয় এমন লোকও বড় ছিল না। তারার হৃদয় স্নেহ ও দয়ায় পরিপূর্ণ, পরের দুঃখ সে চক্ষে দেখিতে পারিত না। চারিদিকে এত লোকের এমন শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম মায়ের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু শেষে আর পারিল না। এত লোক এত কষ্ট পাইতেছে, আর সে সুখে ঘরে বসিয়া আছে! পীড়া-যন্ত্রণায় এবং অসহ্য পিপাসায় কাতর হইয়া জল জল করিয়া মরিতেছে, সে ত নিজে কত জল খাইতেছে, অথচ এক বিন্দু জল দিয়া তাহাদিগের মৃত্যু যন্ত্রণার একটুও লাঘব করিতেছে না? এ চিন্তাও তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। সে বাড়ী বাড়ী গিয়া হতভাগ্যদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তারা যে দিকে চায় সেই দিকেই কাতরের আর্ত্তনাদ, সেই দিকেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। সে আপনাকে ভুলিয়া রোগীদিগের কষ্ট দূর করিবার জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করিতে লাগিল। তারার মাতা মেয়ের ভাব দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না।

কিছু দিন এই ভাবে গেল। কিন্তু এত পরিশ্রম এবং এত কঠোরতা তাহার সহ্য হইল না। তারাও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। পল্লিগ্রামে যত দূর ভাল চিকিৎসা হইতে পারে, আত্মীয় স্বজন তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তারার অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। শেষে আর জীবনের আশা রহিল না; তারাও বুঝিতে পারিল যে, তাহার মৃত্যু নিকট। হতভাগিনী জননী অধোবদনে শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তারা এতক্ষণ রোগ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছিল, কিন্তু এখন তাহার অবস্থা অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। সে মার দিকে ফিরিয়া ধীরে ধীরে কহিল "মা, আমি মরিলে এই সব দুঃখীদিগকে কে দেখিবে? তুমি দেখিবে মা? বল মা বল, তুমি তাদের দেখিবে, আর যে কেহ ইহাদিগকে দেখিবার নাই মা? তাহার মাতা কথা কহিতে পারিলেন না, অতি কষ্টে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন।

তারা আবার বলিল "তবে আমার মরিতে এখন আর কোন কোন দুঃখ নেই মা কিন্তু কেবল—"

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে জল আসিল। আর বলিতে পারিল না; মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাও কাঁদিলেন। কিছুকাল পরে রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেবল কি মা?"

তারা। কেবল তোমার জন্যই কষ্ট হইতেছে। তোমার যে আর কেউ নাই মা! আমি মরিলে তুমি কি করিবে মা! তারার মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "তুই কেন এমন করিলি মা? আমার যে আর কেউ নাই, আমি কি নিয়ে সংসারে থাকিব? আমার দিকে একটুও চাইলি না? কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলি? কেন নিজের মরণ নিজেই ডাকিয়া আনিলি? আমি কি দিয়ে মনকে প্রবোধ দিব?"

তারা। মা কেন তুমি অমন কথা বলিতেছ? ওকথা মনে ক'রে কেন অত দুঃখ করিতেছ?

আমি কি সাধ করিয়া মরিতে পড়িয়াছি? মরিতে কার সহজে ইচ্ছা করে? কিন্তু কি করিব মা? এত লোকের এত দুঃখ দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই। আর মরার কথা কে বলিতে পারে? সব সময়ইত মানুষ মরিতে পারে, কে কখন কিসে মরিবে তার ঠিক কি? মা তুমি কি বলিতে পার যদি এই রকম না করিতাম, তবে আমি এখন মরিতাম না। কত লোকই আমার মত বয়সে মরিতেছে। ও বাড়ীর সুখো দিদি মরিল কেন? সরলা মরিল কেন? বিন্দুর ভাই মরিল কেন? তারাত আপনা আপনিই মরিল। আমি হয়ত এখন তেমন আপনা আপনি মরিতে পারিতাম। মা তুমি ও সব কথা ভাবিয়া মনে কোন দুঃখ করিওনা।"

এত কথা কহিতে তারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল—গলা শুখাইয়া গেল। একটু জল খাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল। শেষে ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে কহিল "মা আগে মরার কথা মনে হইলে আমার বড় ভয় হইত। ভাবিতাম মরিলে পর বুঝি তোমাকে ছাড়িয়া, সকলকে ছাড়িয়া—খুব আঁধার এক বায়গায় একা আমাকে থাকিতে হইবে। তাই মরার কথা মনে হইলে বড় কষ্ট ও ভয় হইত। কিন্তু মা আজত আমার কোন ভয়ই হইতেছে না। কেবল তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—তোমার বড় কষ্ট হইবে, এই জন্যই বড় কষ্ট হইতেছে। মরিলে পর আমার কি হইবে মা; আমি কোথায় যাইব মা?

তারার মা। স্বর্গে

তারা। সেখানে কি আছে মা? সেখানে কার কাছে থাকিব মা?

তারার মা। সেখানে পরমেশ্বর আছেন তুমি তাঁহার কাছে থাকিবে।

তারা। স্বর্গে পরমেশ্বর আছেন, আমি তাঁরই কাছে থাকিব? মা, তুইত বলিয়াছিলি পরমেশ্বর আমাদিগকে সবার চেয়ে বেশী ভাল বাসেন; তিনি আমাকে মায়ের মতন—মায়ের চেয়েও বেশী ভাল বাসেন। তিনিই আমাদিগের সব দিয়েছেন। আমরা যাহাতে ভাল থাকি সব সময়ে তিনি তাই করেন। তবে আর কিসের কষ্ট মা? তবে আর কিসের ভয় মা? তুই আর কাঁদিস্‌নে মা? আমিত ভালই থাকিব, আমিত ভাল যায়গায়ই যাইতেছি। মায়ের কাছে যাইতেছি।" বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাহার জীবন ফুরাইয়া আসিল। সে ম্লান মুখে একটু হাসি দেখা গেল। অতি ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে তারা তখন কহিল "মা স্বর্গে পরমেশ্বরের কাছে থাকিব?" তারার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহা নিভিয়া গেল। সব ফুরাইল। পরের দুঃখ মোচনের জন্য তারা নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, তারা আজ স্বর্গে চলিয়া গেল!



প'ড়ো বাড়ী।

(গত সংখ্যার ১২৮ পৃষ্ঠার পর।)

আমি নিরুপায় হইয়া বলিলাম,—"আমার নিকট যাহা আছে লও, নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং এই ঘড়ী চেন ভিন্ন আমার নিকট আর কিছু নাই, তোমাদের ইচ্ছা হয় ইহা লইয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।" দলপতি তখন হাসিয়া বলিল,—"এই সামান্য টাকার

জন্ত আপনাকে এত কষ্ট দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না, অন্ত প্রকারে ইহা সংগ্রহ হইতে পারিত। আমি ঐ আট হাজার টাকাই আপনার নিকট চাহি।" আমি বলিলাম—"এই পঞ্চাশ টাকা ভিন্ন আর আমার নিকট একটী পয়সাও নাই, কোথা হইতে আট হাজার টাকা দিব?" তখন সে লোকটা বলিল,—"সে ভাবনা আপনাকে ভাবিতে হইবে না, সে ভাবনা আমি ভাবিয়াছি।" এই বলিয়া একজন লোককে ইসারা করিবা মাত্র সে কাগজ কালী কলম লইয়া আসিল। তখন সে লোকটা বলিল,—"আমি যাহা বলি এই কাগজে তাহাই লিখুন।" আমি প্রথমে স্বীকৃত হইলাম না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া সে যাহা বলিল তাহাই লিখিলাম। পত্র খানি এইঃ—"আমি এখানে আসিয়া একটী সুবিধা মত বাড়ী পাইয়াছি, বাড়িটী * * * বাবুই পূর্ব্বে দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাড়িটী বেশ ভালই আছে। বাড়িটীর দাম পোনের হাজার টাকা, সম্প্রতি অর্দ্ধেক এবং একমাস পরে আর অর্দ্ধেক দিতে হইবে। সুতরাং এই লোক মারফৎ আট হাজার টাকা, এই পত্র পাইয়াই পাঠাইবে, অন্যথা না হয়। ব্যস্ততা বশতঃ বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। দুইতিন দিনের মধ্যেই আমি ফিরিব, তখন সমস্ত জানিবে।" পত্রখানি আমার ভাইয়ের নামে লেখা হইল। পত্র লিখিয়া নাম সহি করিবার সময় একটু ইতস্ততঃ করিলাম; কিন্তু তাহাতে কোন ফল নাই, সুতরাং সহি দিলাম। তৎক্ষণাৎ পত্র লইয়া একজন লোক চলিয়া গেল। দলপতিকে তখন আমি বলিলাম, "তোমার কাজ হইল, এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও।" সে বলিল,—"সে কি? আপনি অতিশয় ক্লান্ত আছেন, রাত্রিটা বিশ্রাম করুন, কাল সকালে যাইবেন।" আমি বলিলাম, "আমার বিশ্রামের কোন দরকার নাই, আমাকে যাইতে দাও।" সে বলিল, "তাও কি হয়।" এই বলিয়া একজনকে কি চুপি চুপি বলিল, সে আমাকে সেখান হইতে আর একটা ঘরে লইয়া গিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বুঝিলাম আমি বন্দী হইলাম। ঘরের ভিতর একধারে একখানি বিছানা, আর একধারে কিছু খাবার জিনিষ রহিয়াছে। আমার সেই কদর্য্য খাবার খাইতে প্রবৃত্তি হইল না, বিছানার উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি হইল! খানিকক্ষণ এইভাবে গেল। কতক্ষণ গেল জানিনা, তার পর একবার উঠিলাম। ভাবিলাম চিন্তা করিয়া কোন লাভ নাই, দেখি পলাইবার কোন উপায় করিতে পারি কি না। কিন্তু দেখিলাম সে চেষ্টা বৃথা। যে দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তা ছাড়া আর সে ঘরে একটীও দরজা জানালা নাই। হতাশ হইয়া আবার বিছানার উপর বসিয়া পড়িলাম। বড় পিপাসা বোধ হইয়াছিল; দেখিলাম একটা গ্লাস জল রহিয়াছে। গ্লাসটা হাতে লইয়া মুখে দিলাম, দেখিলাম মিষ্ট সরবৎ। অতিশয় পিপাসা হইয়াছিল সমস্ত সরবৎ টুকুই খাইলাম। খাইয়া আবার বিছানায় গিয়া বসিলাম। শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, চক্ষু যেন বুজিয়া আসিতে লাগিল। অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সেই বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(৬)

পিঠে একটা গুরুতর বেদনা বোধ করিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিল। চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম, একজন পাহারাওয়ালা রুল হাতে আমার পাশে দাঁড়াইয়া আমাকে মিষ্ট সম্ভাষণে উঠিতে বলিতেছে, এবং এক একবার হাতের রুলখানি দিয়া আদর করিতেছে। দেখিলাম ঘরের মধ্যে আরও

কতকগুলি লোক ; ভদ্র বেশধারী এক আদজন, কিন্তু প্রায়ই ছোটলোক। ভাবিলাম একি? এ আবার কোথায় আসিলাম! চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তখনও আমার মাথা ঘুরিতেছে। পাহারাওয়ালা বেশ-ধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কোথায়।" সে বলিল "শ্বশুর বাড়ী।" আমি বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলাম, আর কেন? তোমারও কার্য্য হইয়াছে, আমারও বিশ্রাম হইয়াছে, এখন তোমা-দের দলপতিকে বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।" পাহারাওয়ালা বলিল, "চল দলপতির কাছেই তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আমার পা টলিতে লাগিল ; মাথা ঘুরিতে লাগিল, কেহ কেহ আমার দিকে চাহিয়া ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতেও ত্রুটী করিল না। আমাকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। দেখিলাম একটা আফিসের মতন ঘরটী সাজান এবং একজন সাহেব ও দুই তিন জন বাঙ্গালী বাবু বসিয়া আছেন। আমার যেন সকলই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এত রাত্রিকার সে ঘর নয়? এত দেখিতেছি পুলিসের থানা! এ আবার কি বিপদ। সাহেব আমার দিকে চাহিয়া হিন্দিতে বলিলেন, "বাবু আপনাকে দেখিতেছি ভদ্রলোক, তবে নেশা করিয়া রাস্তায় পড়িয়াছিলেন কেন?" আমি বলিলাম, "আমি ইংরাজি জানি," এই বলিয়া ইংরাজীতে বলিলাম যে "আমি জন্মে কখনও নেশা করি নাই, মাদক দ্রব্য আমি স্পর্শও করি না, আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হয় আপনার ভুল হইয়া থাকিবে।" সাহেব বলিলেন, "বাবু আপনারই ভুল হইতেছে, এই পাহারাওয়ালাই কাল আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় থানায় লইয়া আসিয়াছে ; এখন আপনাকে লাল বাজারে কমিশনার সাহেবের নিকট যাইতে হইবে।" আমি তখন সমস্তই বুঝিলাম। সেই সরবৎ খাইবার পর আমার শরীর অবসন্ন হইয়া ক্রমে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম ক্লান্তি বশতঃ ঘুমাইলাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। সেই সরবতে কোন মাদক দ্রব্য ছিল, তাহাতেই আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া-ছিলাম। দস্যুরা সেই অবস্থায় আমাকে রাস্তায় ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, পাহারাওয়ালা মাতাল মনে করিয়া আমাকে থানায় লইয়া আসিয়াছে। সাহেব এই থানার ইন্‌স্পেক্টর। বিপদের উপর বিপদ। তখন আমি সাহেবকে সেই পত্র হইতে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিলাম, প্রথম তাঁহার বিশ্বাস হইল না। সৌভাগ্য ক্রমে আমার সেই বন্ধুর পত্র খানা আমার পকেটে ছিল। পকেটে হাত পড়াতে আমার তাহা মনে হইল। আমি সাহেবকে সেই পত্র দেখাইলাম, সাহেব, তাঁহার একজন সব ইন্‌স্পেক্টের বাবুকে দিয়া পত্রখানা পড়াইয়া মর্ম্ম জানিলেন। আরো একটু সুবিধা হইল, সেই সব ইন্‌স্পেক্টর বাবুটী আমার সেই বন্ধুকে জানিতেন। সুতরাং সাহেবের আদেশমত সব ইন্‌স্পেক্টের বাবু আমাকে লইয়া একখানা গাড়ী করিয়া আমার বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হই-লেন। বন্ধুত আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বিশেষ পুলিষের সহিত এই প্রকার অবস্থায় দেখিয়া তিনি আরও বিস্মিত হইলেন। সবইন্‌স্পেক্টর বাবু তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই পত্র খানা দেখাইলেন। পত্র পড়িয়া বন্ধু বলিলেন, "এ পত্র আমার লেখা নয়।" তখন সবইন্‌স্পেক্টর বাবুর সন্দেহ গেল। বন্ধুকে তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সকলেই বুঝিলেন ভয়ানক ষড়যন্ত্রে আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

আমরা পুলিষের থানায় ফিরিয়া আসিলাম। সাহেব সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু আমার এজাহার লিখিয়া রাখিলেন। এই সময় জানিলাম যে, যে দিন আমাকে পুলিশে অজ্ঞান অবস্থায় লইয়া আসে, জুয়াচোরেরা তাহার পূর্ব্বদিন আমাকে চক্রান্ত করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। অজ্ঞান অবস্থায় আমি দুইদিন ছিলাম। আমার কর্ম্মস্থানে ইতি পূর্ব্বে টাকা না দেওয়ার জন্য এক টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিলাম, তখন বুঝিলাম তাহাতে আর কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক এজাহার লেখাইয়া দিয়া, সেই বন্ধুর সহিত তৎক্ষণাৎ কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলাম। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া সকলেই একটু আশ্চর্য্য হইল। আমার ভাই বাড়ী খরিদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিলাম যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে; জুয়াচোরেরা পূর্ব্বদিনই ঐ আট হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। টাকা গিয়াছে, প্রাণটা যায় নাই, এই বলিয়া তখন মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুদিন পরে জানিলাম ডিটেক্‌টীভ পুলিষ আমার এজাহার অনুসারে বহু অনুসন্ধান ও বহু পরিশ্রম করিয়া সেই বাড়িটীর সন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু সেই জুয়াচোরদের কোন সন্ধানই করিতে পারে নাই। সকলেই বলিল যে বহু দিন পর্য্যন্ত সেই বাড়িটী 'প'ড়ো বাড়ী'র ন্যায় রহিয়াছে!



ইংরেজদের পর্ব্ব।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই দুর্গাপূজার বড় ধুমধাম পড়েছে। ছেলেমেয়েদের যত ইস্কুল, পাঠশালা বন্ধ হয়েছে; পাড়াগাঁয়ের বালকেরা সহর ছেড়ে নিজ নিজ বাড়ীতে গিয়াছে; আর কলিকাতার ছেলেরাও বই শ্লেট সব ডেস্কে পুরে একমনে কেবল ঠাকুর গড়া দেখিতেই ব্যস্ত। কারুর তিন সপ্তাহ, কারুর পঁচিশ দিন, আবার কোন ছাত্রের বা দেড় মাস ক'রে ছুটি হয়েছে। এখন কিছুদিন ত আর ইস্কুলে যাবার ভয় নাই, লেখা পড়ারও তত চাড় নাই, এ মাসটা আমোদ আহ্লাদে কাটাতে সকলেরই সাধ—কেমন? এই অবসরে আমি তোমাদেরকে একটা বিলাতী পর্ব্বের গল্প বলিব।

দুর্গাপূজা হিন্দুদের যেমন প্রধান উৎসব, 'খৃষ্টমাস' (বড়দিন) খৃষ্টান বা ইংরেজদের তেমনি সকলের চেয়ে বেশী আনন্দের সময়। তোমরা সকলে নিশ্চয় বড়দিনের নাম শুনেছ, কেননা সে সময়ে তোমাদেরও ছুটি হয়। কিন্তু তোমরা বোধ হয় জাননা প্রায় ২০০০ বৎসর আগে ঐ দিনে, ২৫ শে ডিসেম্বর তারিখে, খৃষ্টান ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা যীশুখৃষ্ট জন্মিয়াছিলেন বলিয়া উহা খৃষ্টানদের কাছে একটী প্রধান উৎসবের দিন। ইংরাজীতে ঐ দিনকে 'খৃষ্টমাস ডে' বলে, কিন্তু আমাদের দেশে উহাকে যে কেন 'বড়দিন' বলে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি উহা ইংরেজ জাতির প্রধান উৎসব বলিয়া বা ২৫ শে ডিসেম্বর বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন হওয়াতে উহাকে আদর ক'রে সকলে ঐ 'বড়' নাম দিয়াছে।

আমাদের দেশের লোকেরা দুর্গা, কালী, কার্ত্তিক, সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের সময় ঐ সব দেবীর ঠাকুর গড়া লইয়াই বেশী সময় ও পয়সা নষ্ট করে; কিন্তু ইংরেজেরা বড় চালাক জাতি, দুদিন পরে কেবল জলে ফেলিয়া দিবার জন্য তারা একটী পয়সাও নষ্ট করে না। বিশেষ ঐ বড় দিনের সময় পূজা আৰ্চ্চার বদলে খাওয়া ও আমোদ আহ্লাদেই তাদের মন মাতিয়া থাকে।

এই পূজার সময় তোমাদের যেমন ছুটী হয়েছে, তোমরা যে যেখানে ছিলে, এখন সকলে বাড়ীতে এসে মিলেছ, দিদি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, বড়দাদা চাকরীর স্থানে ছুটী পেয়েছেন, বাবার আফিস বন্ধ হয়েছে, সম্বৎসর পরে পরিবারের সকলে আবার একসঙ্গে মিলে আমোদ আহ্লাদ করিতেছ, খৃষ্টমাসের সময় ইংরেজ বালক বালিকারাও ইস্কুলের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়া সেই রকম সুখে কাটায়। তোমাদের মত তাদেরও নতুন পোষাক, নতুন টুপি ও নতুন জুতা হয়, আর ছেলে মেয়েরা পরস্পরকে নিজেদের নতুন কাপড় দেখায়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে।

খৃষ্টমাসের আগের দিনের সন্ধ্যাবেলাকে 'খৃষ্টমাস ইভ্' বলে, উহা ইংরেজদের কাছে আমাদের পূজার বোধন বা ষষ্ঠির সন্ধ্যার মত আনন্দময়। ঐ সন্ধ্যা-কালে বিলাতী পরিবারেরা সকলে একসঙ্গে হয়ে একটী বড় ঘরে বসে, গৃহের ছাদের মাঝখান হতে 'মিসেলটো' নামে গাছের একটী বড় ডাল ঝুলিতে থাকে—ইংলণ্ডের রীতি এই যে মিসেল্‌টোর নীচে বাড়ীর সকলে বন্ধু বান্ধব লয়ে পরস্পরের সঙ্গে সস্নেহে আমোদ করিবে ও ছেলেবুড়ো সব একত্র মিশিয়া কোলাকুলি করিবে। এ রীতিটী অনেকটা আমাদের দেশের বিজয়ার প্রণাম ও কোলাকুলির মত।

মিসেল্‌টোর নীচে দাঁড়িয়ে মা ছেলেমেয়েদের গালে চুমোখান, পিতা বড় বড় পুত্রকন্যাদের কপালে চুমো দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, ভাই বোনেরা সকলে গলা ধরাধরি করে পরস্পরকে সস্নেহে আদর করে, বন্ধু বান্ধবেরাও ঐ সব আমোদ আহ্লাদে যোগ দেন। আজ বোবার মত গম্ভীর মূর্ত্তি ইংরেজ জাতি যেন আর একভাব ধারণ করে। নীরব নিস্তব্ধ ইংরেজ গৃহ আজ হাসির রোল ও আনন্দের শব্দে পুরে যায়। বাড়ীর ও পাড়ার যত ছেলেরা ও বুড়োরা পর্য্যন্ত একসঙ্গে জড় হয়ে কানামাছি, লুকো-চুরী, কপাটী প্রভৃতি লাফালাফির ক্রীড়ায় রত হয়, গৃহে হুড়াহুড়ী ও দৌড়াদৌড়ির ভিড় প'ড়ে যায়।

মেরী চোক বেঁধে কানা হ'য়ে হাত দিয়ে সমস্ত ঘর হাঁতড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জন, ফ্র্যাঙ্ক, অ্যালিস সকলেই তার চারপাশে ঘুরছে ও তার মাথায় ঠোকর মেরে যাচ্ছে, কিন্তু সে কাউকে ধর্‌তে পাচ্ছে না; অবশেষে সে একটী নরম জিনিস আকড়িয়া ধরে—এইবারত পেয়েছি, কেমন?— বলিয়া যেই চোকের বাঁধা খুলে ফেল্লে, অমনি ঘরের যত ছেলে হো! হো! কোরে হেসে উঠ্‌লো। কোন খেলুড়ে মনেকরে সে একটা গদিওলা চৌকীকে ধরেছিল।

কানামাছি শেষ হলে লুকোচুরী খেলার পালা আসে। জন চোর হয়ে এক কোণে দাঁড়ায়, তার বাপ তার চোক ধরে থাকেন, আর তার মা খুঁটী হয়ে কৌচে বসেন, অন্যান্য ছেলে মেয়েরা সব লুকোতে যায়। তাদের লুকান শেষ হলে জনের বাবা তার চোক ছাড়িয়া দেন; মা চোকটিপিয়া ইসারায় তাকে খেলুড়েদের লুকানর যায়গা দেখিয়ে দেন; কিন্তু আমাদের মোটা বুদ্ধি জন ক্রিকেট খেলাতেই খুব চালাক, সঙ্গীদেরকে খুঁজে বাহির করিতে তার সাধ্য কি! সে এখানে সেখানে—

কৌচের নীচে, আলমারীর পাশে উকী মেরে দেখছে, এমন সময় তার পেছন থেকে ছেলেরা কেউবা দেরাজের মাথা, কেউবা পিয়ানোর ভিতর হতে ঝুপঝাপ করে নেমে খুঁটি ছুঁয়ে ফেলিল; জন ভ্যাবাগঙ্গারামের মত হাঁ করে চেয়ে রইল। শেষকালে ফ্র্যাঙ্ক নিজে ধরা দিয়ে চোর হল।

জনের বেলায় ছেলেমেয়েরা সব একটী ঘরের ভিতরেই লুকিয়েছিল, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক বড় সেয়ানা চোর, তার নজর এড়ানো দায়। কাজেই সকলে গুপ্তস্থানের সন্ধানে সমস্ত বাড়ীতে ছড়িয়া পড়িল। আমাদের ফ্র্যাঙ্ক এক এক ক'রে—মেরীকে ভাঁড়ার ঘর থেকে, অ্যালবার্টকে সিঁড়ির উপর থেকে, অ্যালিসকে চুপড়ীর ভিতর হতে, এবং জনকে খাটের নীচে থেকে টানিয়া বাহির করিল। কিন্তু এথেল কোথায়? ঐ দেখ না, দুই ভাইবোনে কয়লার ঘর থেকে কাল সং সেজে হাস্তে হাস্তে হাত ধরাধরি ক'রে উপরে এল। তাদের আকার দেখে সকলে হাততালি দিয়ে হাসিতে লাগিল। মা জানিতেন আজ ছেলেমেয়েরা যা খুসি খেলা করিবে, তাই তাদেরকে এখনও নতুন কাপড় পরিতে দেন নাই। তা নহিলে সর্ব্বনাশ হত আর কি!

এই রকম অনেক অনেক হুড়াহুড়ির খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়িলে, সকলে মিলে রাত্র ভোজন করে। পূজার বাড়ীতে লুচি সন্দেশ, মিঠাই মণ্ডায় তোমাদের যেমন আহ্লাদ হয়, খাবার জিনিশ দেখিলে ইংরেজ ছেলেরাও সেই রকম আনন্দে নাচিয়া বেড়ায়। টেবিলের উপর মাঝখানে এক প্রকাণ্ড খোরাবাটীতে সোঁ সোঁ টগবগ শব্দে গরম গরম আপেল ভাসিতেছে আর কত হরেকতর কেক বিস্কুট পুডিং পিঠা সাজান রয়েছে—তাদের মিষ্ট গন্ধে ও মধুর শব্দে, ছেলেদের কথা দূরে থাক, বুড়ো লোকদেরই লোভ সম্বরণ করা অতি কঠিন হয়ে ওঠে। ক্রমে মা আসিয়া টেবিলের মাথার দিকে বসেন ও খাদ্য দ্রব্য সব বাঁটিয়া পরিবেশন করেন, মহা উল্লাসে ভোজ আরম্ভ হয়। ভোজনের পর সকলে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত জাগিয়া খৃষ্টমাস দিনের অপেক্ষা করে।

হিন্দুরা পূজার সময় সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ঠাকুর পূজাতে রত থাকেন, আর দান ধ্যান করিয়া ও অনেক লোক জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। বিলাতে কিন্তু খৃষ্টমাস দিনে পূজা আশ্রায় বড় একটা ভক্তি দেখা যায় না, সকাল বেলায় কেহ কেহ একবার গির্জ্জায় যায়, পরে কি ধনী কি গরীব সকলেই নিজ নিজ পরিবার সঙ্গে ভোজনে রত হয়। আহারের পর সকলে গান বাজনা, খেলা ও নাচ ইত্যাদিতে দিন কাটায়। আমাদের দেশের মত বিলাতে যাত্রা কি বাইনাচ নাই, পরিবারের ছেলেমেয়েরা সকলে মিলিয়া নিজেদিগের মধ্যেই গানবাজনা করে ও নাচে।

এই রকম ভোজন ও আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তাদেরও পর্ব্ব চলিয়া যায়। ছেলে মেয়েদের ছুটি ফুরিয়া আসে, দাদা কাজের স্থানে যান, দিদিকে লইতে পাঠায়, বাবার আফিস খোলে,—সব যে যার কাজ কর্ম্মে ও ইস্কুলে চলিয়া যায় এবং আমোদ ছাড়িয়া কাজ ও লেখাপড়ায় মন দেয়। আবার এক বছর পরে সকলে দেখা হবে।



পূজার পোষাক।

সুশীলাই জিতিল।

(১)

পিতা বলিলেন,—"জীবন! সুরেন সুশীলাকে ডাকিয়া আন; চল, আজ তোমাদের পূজার পোষাক কিনিয়া আনি।"

সুরেনকে ও সুশীলাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য, জীবনের পিতা আরও দুইবার জীবনকে বলিয়াছিলেন। জীবন সে কথায় বড় মন দেন নাই; "যাচ্চি" বলিয়া কথার উত্তর দিয়া একমনে ঘুড়ির লেজটি মেরামত করিতেছিলেন। এবার কিন্তু "পূজার পোষাক" কথাটা কানে যাইবা মাত্র জীবন আর দেরি করিতে পারিল না, ঘুড়িকে পুচ্ছহীন অবস্থায় রাখিয়াই পিতার কাছে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বাবা! কি বল্‌চো?—সুরেনকে সুশীলাকে ডেকে আনবো—আজ পোষাক কিন্‌তে যাবে?"

জীবনের পিতা বলিলেন,—"হাঁ যাব; তাদের কাপড় চোপড় পরে আস্‌তে বল, তুমিও পরে এস।"

জীবন বলিল,—"আমাকে কিন্তু বাবা! আজকেই বিশুর দাদার মতন একটা বিলাতি বাজনার বাক্স কিনে দিতে হবে।"

পিতা বলিলেন,—"সেটা আর আজ হবেনা ত বাপু! এই তোমাদের তিনজনের কোট, বডিতেই আজ তিনদশে ত্রিশ টাকা প'ড়ে যাবে।"

"তিনদশে ত্রিশ, কেন বাবা!" জীবন ব্যগ্র হইয়া কথাটি জিজ্ঞাসা করিল।

জীবনের মনের ইচ্ছা এবং তাহার বিশ্বাসও ছিল যে, তার পোষাকটা সকলের অপেক্ষা অনেক বেশী দামের হইবে। পূজার পোষাকের কথায় সে একদিন তাহার মার কাছে প্রকাশও করিয়াছিল যে, সে সবার বড়, তার পোষাক অনেক দামী হইবে; সুরেনের পোষাক তার নীচে, তার নীচে সুশীলার। বিশেষতঃ সে তাহার ঠাকুরমার কাছেও একদিন শুনিয়াছিল যে, সুশীলা মেয়ে, সে তাহার সঙ্গে কিসে সমান? কাজেই সে পিতার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইল না। কিন্তু তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিতেও তাহার সাহস হইল না; তাই বলিল,—"তিনদশে ত্রিশ কেন বাবা?"

পিতা, তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—"তিনদশে ত্রিশই ত বাপু! এ আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?—তুমি কি নামতা ভুলে গিয়েছ?"

নামতা কেন ভুলে যাব?" বলিয়া জীবন জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা,কার জামার সবার চেয়ে বেশী দাম হবে?"

বাবা বলিলেন,—"আমি ত তোমাদের তিন জনেরই দশ টাকা করে দাম ধরেছি।"

"সবারই দশ টাকা?"

"সবারই দশ টাকা।"

"আমার দশ টাকা?"

"তোমার দশ টাকা।"

"সুশীলারও দশ টাকা?"

"তারও দশ টাকা।"

শুনিয়া জীবন আর সেখানে দাঁড়াইল না। মা যে ঘরে ছিলেন, একেবারে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবনের মাতা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, জীবনের কোন কারণে রাগ হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি হ'য়েছে, জীবন! কেউ তোমাকে কিছু ব'লেছেন নাকি?"

জীবন ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—"আমার জামা কিন্‌তে হবে না।"

"কিন্‌তে হবেনা কেন? আমিত এইমাত্র আজই তোমাদের জামা কিনে আন্‌বার কথা বল্‌ছিলুম।"

"জীবন পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—

"না—নামতা দিয়ে আমার জামা কিন্‌তে হবে না।"

(২)

পিতা তখন সুরেনকে ডাকিলেন। সুরেন কাছে আসিলে বলিলেন,—"আজ তোমাদের কোট কিনতে যাব। তোমরাও আমার সঙ্গে যাইবে।"

সুরেন বলিল,,—"কোট কিন্তু খুব ভাল চাই, বাবা!"

পিতা বলিলেন—জীবনের কুড়ি টাকার, তোমার দশ টাকার আর সুশীলার দশ টাকার হলেই হবে, কি বল?"

সুরেন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,"আমার ক টাকার বাবা?"

"দশ টাকার।"

"আর সুশীলার?"

"দশ টাকার।"

"বাবা! দাদার তবে অত বেশি টাকার কেন?"

"দাদা তোমার চেয়ে বড়।'

"আমিওত সুশীলার চেয়ে বড়।"

"ভাল, তবে তুমি কি চাও বল।"

"দাদার চেয়ে আমার কটাকা কম হবে?"

"দশ টাকা"

"তবে আমার চেয়ে সুশীলারও দশ টাকা কম।

পিতা সুরেনের কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন,—"তা হ'লে যে সুশীলার মোটেই হয় না দেখ্‌ছি।"

সুরেনও, ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিল,—"তা আমি কি করব?" বলিয়াই আর দাঁড়াইল না, ছুটিয়া মার কাছে চলিল।

(৩)

তারপর পিতা সুশীলাকে কাছে ডাকিলেন। সুশীলা আসিলে পিতা বলিলেন,—

"সুশীলা, আজ তোমাদের পোষাক কিন্‌তে যাব, তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে চল।"

'এখনই যাবে, বাবা! দাদাদের তবে ডেকে আন্‌বো?"

"আন।"

সুশীলা খানিকটা যাইয়া কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিল। আসিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"বাবা! আমার পোষাকে ক টাকা লাগ্‌বে?

"পিতা বলিলেন,—তুমি কি বল?"

"তুমি বল-না?"

"দশ টাকা?"

"আচ্ছা," বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুশীলা বলিল, "তা বাবা! তুমি আমাকে ন টাকার মতন পোষাক কিনে দিও, আর এক টাকার তেমন চক্‌চকে পয়সা আমাকে দিও।"

পিতা বলিলেন,—"ন টাকার পোষাক, আর এক টাকার চক্‌চকে পয়সা? কেন, এত চক্‌চকে পয়সা কি কর্‌বে?"

সুশীলা বলিল,—"কেন, আর বছর সেই পূজার সময় কত কাঙ্গালী জড় হ'য়েছিল, দিতে দিতে আমার সব পয়সা ফুরিয়ে গেল!—এবার সবাইকে দিব।"

সুশীলা আর দাঁড়াইল না। দাদাদের ডাকিতে ছুটিয়া গেল।

আমরা শুনিয়াছি, সুশীলার যে পোষাক হইয়াছিল, তাহার দাম কাহারও অপেক্ষা কম নয়। তা ছাড়া, সে দু টাকার চক্‌চকে পয়সাও পাইয়াছিল।



বৃষকেতু।

(১২৬ পৃষ্ঠার পর।)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনিবামাত্র রাজা আকাশ পাতাল ভাবিলেন। উত্তর দিতে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কঠোর ভাবে বলিলেন,—কর্ণ! দাতা বলিয়া তোমার যে খ্যাতি আছে সে মিথ্যা—আমি অন্যত্র চলিলাম; অভুক্ত অবস্থায় অতিথি ফিরিয়া যায়, তোমার কি ধর্ম্মভয়—অধিকন্তু ব্রহ্মশাপ ভয় হয় না? এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া কর্ণ বলিলেন আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি পদ্মাবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া আসি। ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। কর্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর মুখে পদ্মাবতী সমস্ত শুনিলেন, ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূর্ণ না করিলে স্বামীকে নরকস্থ হইতে হয় পদ্মাবতী তাহাও বুঝিলেন; বুঝিয়া বলিলেন—আমি ধর্ম্ম-পত্নী হইয়া তোমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে পারি না, বৃষকেতুর মাংস ব্রাহ্মণেরই ভক্ষ্য হউক। ব্রাহ্মণের এই নিদারুণ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া আমরাও বৃষকেতুর অনুগমন করিব।

এইস্থলে একটী কথা বালকদিগকে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে নরকে যাইতে হয়। এ বাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণে রাখা অতীব কর্ত্তব্য, অপিচ—প্রতিজ্ঞা কেন, কোন কথা বলিয়া তাহার অন্যথাচরণ করিলেও পাপ জন্মে। মনে কর তোমার শ্রেণীর কোন বালক বলিল ভাই আজ বিকালে বাটী থাকিও আমি তোমার কাছে যাইব, বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি স্বীকার করিলে কিন্তু বিকালে আর একজন ছাত্র আসিয়া তোমাকে খেলিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল! পূর্ব্বে বালক যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার বাটী আসিয়া তোমার দেখা পাইল না। এই কার্য্য দ্বারা তুমি মিথ্যাবাদী হইলে, এইরূপ অনেক ঘটনা প্রায় প্রত্যহ ঘটে যাহা তোমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পার না যে, দোষের বিষয় হইতেছে, তাই বলি যাহা বলিবে বা যাহা করিবে তাহা ভাল করিয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া বলিও বা করিও। এক কথা বলিয়া বা এককাজ করিয়া পশ্চাৎ তাহার জন্য অনুতপ্ত হইও না।

পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া কর্ণ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের এপ্রকার ভাব বুঝিতে পারিয়া পদ্মাবতী বলিলেন এখন ভাবিবার সময় নাই, এখন কার্য্যের সময়। ভাবিতে হইলে আগেই বিশেষ ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। এখন আপনি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের নিকট গমন করুন। কর্ণ তাহাই করিলেন। বৃষকেতুর নবনীত তুল্য মাংস ব্রাহ্মণ ভোজনে দিবেন—জানাইলেন। ব্রাহ্মণ ধন্য ধন্য করিয়া বলিলেন, শিশু বৃষকেতুকে জল্লাদে হত্যা করিলে হইবে না। তুমি ও পদ্মাবতী দুই জনে তীক্ষ্ণধার করাতে তাহার মাথা কাটিবে—পদ্মাবতী স্বয়ং তাহার মাংস রন্ধন করিবে। ইহাতে তোমরা কেহ কাতর হইতে পারিবে না। তোমাদিগকে বিমর্ষ দেখিলে আমি আহার না করিয়া চলিয়া যাইব। হরি! হরি! কি ভয়ানক কথা, স্বহস্তে পুত্র হত্যা তাও আবার হাসি মুখে করিতে

হইবে। ইহা কি মানুষে পারে? কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। অগত্যা স্বীকার করিতে হইল।

বৃষকেতু এই সময় প্রতিবেশী অল্প বয়স্ক বালকদের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। বৃষকেতু রাজার ছেলে—তোমরা মনে করিতে পার যে বৃষকেতু উদ্ধত—বৃষকেতু রাগী—বৃষকেতু সকলের উপর ক্ষমতা প্রচার করিতে যত্নবান। এমন মনে করা তোমাদের সম্ভব বটে—কারণ আজ কালকার দিনে যাহার বাপের দশ টাকার সঙ্গতি সে আর আর বালককে চাকরের মত দেখে—অহঙ্কারে মাটিতে পা দেয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বৃষকেতু তেমনটী নয়, সে যে রাজারছেলে, তাহার স্বভাব বা আচরণে তাহা প্রকাশ হইত না—অমন বিনয়ী, অমন মিষ্টভাবী, অমন সৎগুণসম্পন্ন বালক আর দেশে ছিল না। প্রত্যুত বৃষকেতুর ধর্ম্মের উপর বড় টান ছিল। হরি নাম তাহার মুখের প্রধান বুলী ছিল। প্রাতঃকালে উঠিবার সময়, খাবার পূর্ব্বে—শোবার আগে সে হরিনাম করিত। পরেশ পাথর ছুইলে লোহা সোণা হয়। বৃষকেতুর ন্যায় সৎবালক পরেশ পাথর তুল্য—তাহার সহবাসে অপর বালকও সৎ হয়—ধর্ম্মপরায়ণ হয়, হরিভক্ত হয়। কর্ণ একজন হরিভক্ত রাজা, তাহার পুত্র হরিভক্ত—সুতরাং অঙ্গরাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই হরিভক্ত। যাহা বলিতেছিলাম, বৃষকেতু খেলা করিতেছিল। এই সময় খেলিতে খেলিতে হটাৎ বৃষকেতু একটু অন্যমনস্ক হইল, এবং সমবয়স্কদিগকে বলিল "ভাইসকল বেলা বেশী হইয়াছে এখনই বাড়ী যাইতে হইবে। কে বলিতে পারে আবার আমি ফিরিয়া আসিব কিনা, এ শরীর ক্ষণধ্বংসী, এই আছে এই নাই। এক নিমিষেও ভাই প্রলয় হইতে পারে—শিশুর জীবন যাইতে কতটুকু সময় লাগে?" সমবয়স্কেরা তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, ভাই অমন কথা বলিও না; তুমি আমাদের, আমরা তোমার। আমাদের কোন দিন বিচ্ছেদ হইবে না। চিরদিন একত্র থাকিব। এই সময় রাজ-অনুচর আসিয়া বৃষকেতুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল পিতা মাতা বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান, সম্মুখে অতি বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণ। বৃষকেতু ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া পিতামাতার কাছে গিয়া তাহাদের বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রাজা ও রাণী পাষাণে বুক বাঁধিয়া যাহা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন—মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পারিলেন না, বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা ফুকারিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। বৃষকেতু পিতামাতাকে কান্দিতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। যে নরমাংস খাইতে চাহে সে কি সে কথা বলিতে লজ্জা করে? তিনি অবিকৃত মুখে প্রকৃত বিষয় বৃষকেতুকে বলিলেন। শুনিয়া বৃষকেতু পিতামাতাকে বলিল—বাবা মা তোমরা আমার জন্য কেন বৃথা কান্দিতেছ। এই নশ্বর শরীর ধারণ করিয়া কেহত চিরকাল বাচিয়া থাকে নাই। পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহ, এক দিন পঞ্চ ভূতে মিশিয়া যাইবে। আমার এই মাংস পিণ্ডে যদি ব্রাহ্মণের লোভ জন্মিয়া থাকে—এখনি তাহা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সাধন করিব। বিশেষ আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। এ শরীর আপনাদের হইতে পাইয়াছি। ইহাতেও আমার কোন অধিকার নাই—আপনারা এ শরীর লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। লালন পালন করিয়া যাহা বাড়াইয়াছেন তাহাতে আমার কি অধিকার? আমি নিজ হইতে ব্রাহ্মণের চরণে এই মাংস পিণ্ড উৎসর্গ করিব আপনারা চিন্তা করিবেন না; দুঃখিত হইবেন না। আর বাবা এই যে দেহ, এ ত মাংস

শিশু মাত্র। এই দেহের ভিতর যে পরম পদার্থ বিরাজ করেন, তিনি কখন নষ্ট হন না। সে পদার্থ আমার হরির—দেহ লয় হইলে হরির ধন হরির কাছে ফিরিয়া যাইবে তবে কিসের ভাবনা। হরিনাম করি- তোমরা শ্রবণ কর। বালকের মুখে হরির নাম শুনিয়া পদ্মাবতীরও প্রাণ গলিয়া গেল। তাহার পর হরিগুণ গাইতে গাইতে বৃষকেতু ধরাতলে মুদিত নয়নে উপবেশন করিল—মুখে হরি-বোল বলিতে বলিতে রাজা ও রাণী পুত্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। হরিবোল বলিতে বলিতে ছিন্ন মস্তক ব্রাহ্মণের পদতলে পতিত হইল।

অতঃপর মাংস রন্ধন হইল। কিন্তু পদ্মাবতী শিশুর মস্তকটী গোপন করিয়া রাখিয়া ছিলেন—অন্তর্যামী ঠাকুর তাহা জানিয়া সেই শিশু মুণ্ডদ্বারা অম্বল রান্ধিতে বলিলেন। আহার প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্মণ আশনে উপবেশন করিলেন—পদ্মাবতীও কর্ণকে আহার করিতে বলিলেন। তাও কি হয়, নিজের দেহ নিজে ভক্ষণ করিতে কে পারে? শেষে আদেশ হইল নগর হইতে একটী শিশু ডাকিয়া আন—

"তুমি আমি পদ্মাবতী শিশু এক জন,
আনন্দে শিশুর মাংস করিব ভোজন।

নগর হইতে এক শিশু ডাকিয়া আনার জন্য রাজা রাণী বাহির হইলেন। কোন শিশু এ হেন প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের হর্ষে রোমাঞ্চ হইল। চৈতন্য বিলুপ্ত হইল, দেখিলেন ভগবান হরির কোলে বৃষকেতু বসিয়া আছে। ভগ-বান হরি রাজারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃষকেতুকে তাহাদের ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন, বলিলেন—

"যে জন ভগবৎভক্ত তাহার বিনাশ নাই"

এই বাক্যের সত্যতা আমি মায়া প্রপঞ্চ দ্বারা বুঝাইয়া দিলাম, কর্ণ তুমিই দাতা তুমিই ধন্য, তুমিই বৃষকেতুর পিতা, তুমিই ধন্য বৃষকেতু, বাছা মনে রাখিও—

"যে জন ভগবৎ ভক্ত তাহার বিনাশ নাই"

সখার পাঠক পাঠিকা তোমরা ভগবানের বিশ্বাসী হও। এবং সর্ব্বদা মনে রাখিও।

"যে জন ভগবৎ ভক্ত তাহার বিনাশ নাই"



ধাঁধা।

গত জুলাই মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। জামা, পিরাণ।

নূতন ধাঁধা।

তিন অক্ষরে নামটি, তুমি
ভাল বাস তায়;
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে,
সকলে তারে খায়;
ধর্‌লে শেষের দু অক্ষর,
তুমি সেই হও;
নামটি কি তার, সখার সখা,
শীঘ্র করে কও।



অক্টোবর, ১৮৯২।



বিবিধ।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা প্রতি বৎসরে ৬০১০০০০ করিয়া বাড়িতেছে।

*
* *

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম ছাতির ব্যবহার হয়।

*
* *

গননার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে পূর্ণ চন্দ্রের অপেক্ষা সূর্য্য কিরণের তেজঃ ছয় লক্ষগুণ বেশী।

*
* *

আমেরিকার ঘড়ীর কারখানাগুলিতে প্রতি সপ্তাহে ৩৫০০০ ঘড়ী তৈয়ার হয়। ঘড়ীর কাটতি একবার ভাবিয়া দেখ!

*
* *

সমস্ত ইউরোপে যে সকল সাধারণ পুস্তকালয় আছে, সেই সমস্ত গুলির পুস্তকের সংখ্যা ২১০০০০০০; কিন্তু এক আমেরিকায় ৫০০,০০০০০।

*
* *

লণ্ডন টাকশালে সম্প্রতি একটী নূতন টাকা গণিবার যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে, ইহাতে প্রতি মিনিটে তিন-হাজার পেনি গণিতে পারা যায়।

*
* *

পেরু দেশে গ্যালেরা নামক একটি গ্রাম পৃথিবীর মধ্যে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বাসস্থান। সমুদ্র হইতে এ স্থান ১৫৬৩৫ ফিট উচ্চ, মণ্ট ব্ল্যাংক এ স্থান হইতে ১০০ ফিট মাত্র।

*
* *

জর্ম্মাণ দেশে সলফিউরিক এসিড ও বোরাসিক এসিডের সংযোগে অনুবীক্ষণের কায হইতেছে; ইহাতে এক ইঞ্চির বিশ হাজার অংশের এক অংশও পরিষ্কার $\left(\frac{১}{২০০০}\right)$ দেখিতে পাওয়া যায়।

*
* *

বিখ্যাত ডাক্তার লডার ব্রাণ্টন বলেন যে শীতল জল সকলের পক্ষে না হইলেও, অনেকের পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট উত্তেজক। ব্রাণ্ডী অপেক্ষা শীতল জল হৃদ পিণ্ডের গতি বৃদ্ধি করে। তিনি বলেন যে ছোট একটী গ্লাসের আদ গ্লাস শীতল জল ধীরে ধীরে পান করিয়া তাঁহার নিজের নাড়ীর গতি ৭৬ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল।

*
* *

পণ্ডিত অ্যারিষ্টটল্ বলিয়াছেন যে, যাহাদের কান বড় তাহারা মূর্খ হইয়া থাকে, যাহাদের কান নিতান্ত ছোট তাহারা প্রায়ই পাগল হয়। যাহাদের কান চেপ্টা তাহারা রাগী ও নিষ্ঠুর হইয়া থাকে। যাহাদের কান

মাঝারি এবং সুন্দর তাহারাই পৃথিবীতে উন্নতি করিতে পারে। আবার যাহাদের কান চৌকা তাহারা সকলের চেয়ে সুখী হয় এবং তাহারা সদাশয় ও দয়ালু হইয়া থাকে।

*
* *

বিলাতের কোন পত্রিকায় প্রকাশ যে ইংলণ্ডে এত হস্তী দন্তের প্রয়োজন হয় যে, প্রতি বৎসর ২৫০০০ হাজার হস্তীর আবশুক হয়। প্রতি বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫০০০ হাজার হস্তী বধ করা হইয়া থাকে। ইহাতে অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে হস্তী বংশ শীঘ্রই নির্ব্বংশ হইবে। বিলিয়ার্ড খেলার বল যে দন্তে তৈয়ার হয়, তাহারই মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

*
* *

বিলাত বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের অথবা আমেরিকার লোকেরা আমাদের মত অলস ও অকর্ম্মণ্য নয়। এক সময় হয়ত এই হস্তীদন্তের অভাব হইবে, সেইজন্য তাঁহারা এখন কৃত্রিম উপায়ে হস্তী দন্ত প্রস্তুত করিবার উপায় বাহির করিতেছেন। একখানি আমেরিকার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, দুধ পনিরের ন্যায় জমাইয়া তাহার সহিত সোহাগা মিশাইয়া এই পদার্থের নাম হইয়াছে ল্যাক্‌টাইস (Lactities)। হস্তিদন্তের দ্বারা যে সকল কাজ হইয়া থাকে, অর্থাৎ চিরুণী, বিলিয়ার্ড খেলার বল, কলমের বাঁট প্রভৃতি; ইহাদ্বারা ও সেই সকল সুন্দর তৈয়ার হইবে।

*
* *

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্যে কোন স্থানের সমুদ্রজল কাহাকেও তুলিতে দেন না কাহারও যদি সমুদ্রজলে স্নান করিতে ইচ্ছা হয় বা অন্য কোন কারণে আবশ্যক হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে তাহা একবিন্দুও কাহারও লইবার যো নাই। কেহ যদি সমুদ্র জল লইয়া গোপনে লবণ তৈয়ার করিয়া লয় এই জন্যই ফরাসী দেশে এপ্রকার নিয়ম।

ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ রাজ বৎসরে ৭০০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১০৫০০০০০০ টাকা আয় করিয়া থাকেন। এ দেশে যে লবণ প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশ বিলাত হইতে আসে; এখানে সমুদ্রজল হইতেও লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ দেশে যে লবণ প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসে। রাজপুতনায় সম্বর নামক একটী খুব বড় লবণ হ্রদ আছে। ইহা লম্বায় ২০ মাইল এবং প্রস্থে ৫ মাইল। প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫৭০০০০ মন লবণ সম্বর হ্রদ হইতে প্রস্তুত হয়। দিল্লীর নিকটে গুর্জ্জাও নামক স্থানেও লবণ পাওয়া যায়। পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম অংশে লবণের পর্ব্বত আছে, গভর্ণমেণ্ট-তত্ত্বাবধানে এখান হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ১২২০০০০ মণ লবণ সংগ্রহ হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, এখানে যে লবণ আছে তাহাতে চল্লিশ হাজার বৎসর চলিতে পারে।

*
* *

বিগত লোক গণনার কমিসনার (Census commissioner) বেইনস সাহেব যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গননার জন্য ৯৫০০০০ জন গননাকারী নিযুক্ত হইয়াছিল। গ্রাম ও ছোট ছোট সহরের ৬০টী করিয়া বাড়ী এক এক জন গননাকারীর উপর ভার ছিল। গড়ে এই ৬০ টী বাড়ীতে ৩০০ শত লোক ছিল। গননার কাগজ সতেরটী ভাষায় মুদ্রিত করা হইয়াছে, এই গননায় প্রতি হাজারে সাড়ে দশ টাকা খরচ পড়িয়াছে।

*
* *

ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড এই তিনটী দেশকে একত্রে ইউনাইটেড কিংডম বলে, তোমরা জান। এই ইউনাইটেড কিংডমে ২২০৫ খানি সংবাদ পত্র আছে। ইহার মধ্যে লণ্ডন সহরে ৪৬১ খানি এবং ইংলণ্ডের আর আর স্থানগুলিতে ৪০০২ খানি প্রকাশিত হয়। ওয়েলস প্রদেশে ৯৬, স্কটলণ্ডে ২০৬, আয়র্লণ্ডে ১৩৭, এবং ইংলণ্ডের নিকটস্থ দ্বীপগুলিতে ২৩খানি প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে ১২৮ খানি, ওয়েলসে ৬খানি, স্কটলণ্ডে ২০খানি, আয়র্লণ্ডে

১৯ খানি, এবং দ্বীপ গুলিতে ২ খানি দৈনিক পত্রিকা আছে। মাসিক পত্র ১৯০১ খানি আছে, ইহার মধ্যে ৪১০ খানি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়।

*
* *

বঙ্গীয় পদাতিক সৈন্যদলের একজন কর্ম্মচারীর একটী সুন্দর পোষা হাতী ছিল; তিনি প্রত্যহ নিজে দাঁড়াইয়া তাহাকে খাবার দিতেন। একবার কোন কার্য্য বশতঃ তিনি মাহুতের উপর হাতীর ভার দিয়া বিদেশে যান। তাঁহার যাইবার পর মাহুত প্রত্যহ হস্তীর খাবার চুরি করিত, তাহাতে উত্তমরূপ খাইতে না পাইয়া হস্তী দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে সেই কর্ম্মচারী ফিরিয়া আসিলে হস্তীটী নানাপ্রকার আহ্লাদের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। তারপর তিনি মাহুতকে হস্তীর খাবার আনিতে আজ্ঞা করিলেন। মাহুত খাবার আনিয়া হস্তীর সম্মুখে রাখিলে সে তাহা দুইভাগ করিয়া লইল, এবং কেবলমাত্র একটী ভাগ খাইল। সেই কর্ম্মচারী তখন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন; মাহুত অবশেষে তাহার চুরির কথা স্বীকার করিল।

*
* *

জেনিভা নিবাসী ড্রোজ নামক জনৈক কর্ম্মকার একটী আশ্চর্য্য ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ঘড়ির ভিতর একটী কাফ্রি বালক একজন কৃষক ও একটী কুকুরের মূর্ত্তি ছিল। যখনই ঘড়িটী বাজিত তখনই ঐ কৃষক বাড়ির সম্মুখে আসিয়া ছয়বার বাঁশি বাজাইত, কুকুরটী তাহার চারিদিকে লাফালাফি করিত। এই ঘড়িটী স্পেনের সম্রাটকে দেখান হয়, তিনি অনেক টাকা দিয়া ঘড়িটি কিনিয়া লন। প্রথমে ড্রোজ রাজাকে ঐ কৃষকের ঝুড়ি হইতে একটী ফল তুলিয়া লইতে বলিলেন। রাজা যেমন একটী ফল তুলিয়া লইয়াছেন অমনি সেই কুকুরটা আসিয়া ভয়ানক চেঁচাইতে লাগিল। তৎপরে ড্রোজ ঐ কাফ্রি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কটা বাজিয়াছে" বালকটী ফরাসী ভাষায় যে কটা বাজিয়াছিল তাহা ঠিক মানুষের মত বলিল।

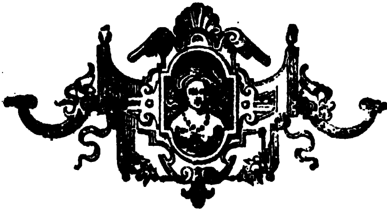
*
* *

হার নোল নামক একজন জর্ম্মান কারীকর একটি ঘড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। একবার দম দিলে ঘড়িটী নাকি নয় হাজার বৎসর চলিবে। নয় হাজার বৎসর টিকিলে হয়! ডি এল গফ নামক আমেরিকার একজন ধনী ব্যক্তির গৃহে একটী ঘড়ী আছে; যত দিন সেই গৃহে লোকবাস করিবে ততদিন ঘড়িটী বন্ধ হইবে না। বিনা দমে আপনিই চলিবে। ঘড়ীটির স্প্রিং এর সঙ্গে নাকি বাড়ীর সদর দরজার এমন ভাবে যোগ আছে যে, লোক যাতায়াত করিবার সময়, দরজা খোলা ও বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ীতে দম দেওয়ার কার্য্য হইয়া যায়। ক্যালিফর্ণিয়াতে টি, জি, ফেরার নামক একব্যক্তি একটী ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা কেবল মধ্যাকর্ষণের বলে চলিবে, স্প্রিং প্রভৃতির কোন দরকার হইবে না। ১৮৪০ অব্দে লীডস নগরে স্মীথ নামক একব্যক্তি একটী ঘড়ী তৈয়ার করিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত বিদ্যুতের বলে চলিতেছে। ১৮৯০ অব্দে স্মীথের মৃত্যু হইয়াছে, এই পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ঘড়িটী বেশ চলিতেছে। একবার দম দিলে পঞ্চাশ বৎসর চলে, বেলজিয়মে এ প্রকার ঘড়ী এখন তৈয়ার হইতেছে। বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্ট ইহার একটী ঘড়ী গবর্ণমেণ্টের মোহর দিয়া বন্ধ করিয়া এক রেলওয়ে ষ্টেশনে রাখিয়া দিয়াছেন, ঘড়িটী বেশ চলিতেছে।

*
* *

একলক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার আটশত সাতান্ন '১৪২৮৫৭' সংখ্যাটী বড় আশ্চর্য্যজনক। ইহাকে ১, ২, ৩, ৪, ৫, অথবা ৬ ইহার যে অঙ্কটীর দ্বারা গুণ কর, গুণফলের অঙ্কগুলি একই হইবে। অর্থাৎ এক হইতে ছয় পর্য্যন্ত যে কোন অঙ্ক দিয়া গুণকর সকলগুলিরই গুণফলে ১৪২৮৫৭ এই কয়টী অঙ্ক থাকিবে। কেবল যে অঙ্কগুলি একই হইবে তাহা নয়; ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দ্বারা গুণ করায়, গুণফলের প্রথম অঙ্কটী বিভিন্ন হইবে, কিন্তু পরের অঙ্কগুলি সকল গুণফলেই আরম্ভ অনুসারে ঠিক পরে পরে বসিবে। '১৪২৮৫৭' সংখ্যাটীকে '১' দিয়া গুণ করিলে ১৪২৮৫৭ হইল। '২' দিয়া গুণ করিলে ২৮৫৭১৪ হইল; ১ দিয়া যে গুণফল হইয়াছিল, ২ দিয়া গুণ করাতে গুণফলের অঙ্কগুলি তাহাই ঠিক আছে, কেবল আরম্ভের তফাৎ। তুই দিয়া গুণ করাতে গুণফলটী '৪২৮৫৭১' এই সংখ্যাটির তৃতীয় অঙ্ক-

'২' হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু অঙ্কগুলি ঠিক পরে পরে বসিয়াছে,—'২৮৫৭' এবং অবশিষ্ট '১৪'। তেমনি '৩' দিয়া গুণ করিলে গুণফল হইবে ৪২৮৫৭১ ; সেই একই অঙ্কগুলি কেবল আরম্ভ বিভিন্ন। এবার '১৪২৮৫৭' এর '৪' হইতে আরম্ভ। '৪২৮৫৭' আর অবশিষ্ট '১'। '৪' দিয়া গুণ কর, গুণফল ৫৭১৪২৮ হইবে। ঠিক সেই অঙ্কগুলি, এবার আরম্ভ '৫' হইতে। '৫৭' এবং অবশিষ্ট '১৪২৮'। '৫' দিয়া গুণ কর, গুণফল ৭১৪২৮৫ হইবে। এবার আরম্ভ '৭' হইতে ; এবং অবশিষ্ট '১৪২৮৫'। '৬' দিয়া গুণ কর, গুণফল ৮৫৭১৪২ হইবে ; এবার আরম্ভ '৮' হইতে, '৮৫৭' এবং অবশিষ্ট '১৪২'। কিন্তু ইহাকে যদি '৭' দ্বারা গুণ করা যায় তাহা হইলে সমস্তই '৯' হইবে ;—'৯৯৯৯৯৯'। '৮' দিয়া গুণ করিলে, গুণফল '১১৪২৮৫৬' হইবে। ইহার প্রথম অঙ্ক '১', শেষ অঙ্ক '৬' যোগ কর দেখিবে পুনরায় সেই এক-লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার আটশত সাতান্ন তোমার হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে।



টুনী।

—:o:—

বিহারীর বয়স বার বৎসর, টুনীর দশ। দুইজনে কোন সম্পর্ক ছিল না ; কে কি জাতি দুই জনের মধ্যে কেহ জানিত না। পিতা মাতার নাম দুইজনের মধ্যে এক জনও জানিত না, পৃথিবীতে তাহাদের কেহ স্বজন আছে কিনা তাহাও জানিত না। দুইজনই নিঃসহায়,সেই তাহাদের সম্পর্ক, সেই তাহাদের বন্ধন। পৃথিবী যেন দূরে; তাহারা দুইটী যেন পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত। নির্ব্বাসনে দুই জনে যে মমতা জন্মে, তাহাদের সেই সম্বন্ধ।

পূর্ব্বে বিহারী একা ছিল। ভিক্ষা করিয়া খাইত, পথে পথে বেড়াইত কেহ ভিক্ষা দিত, কেহ দিত না, কেহ মারিতে উদ্যত হইত, কেহবা মারিত; কেহ একটা ভাল কথা বলিত। বিহারীর সব সহিয়া গিয়াছিল। একদিন পথে দেখিল তাহার সমবয়স্ক একটী বালক একটী বালিকাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে। বালিকা চীৎকার করিতেছে না, কিন্তু যে রকম করিয়া বুক ফাটিয়া ফোঁপাইতেছে দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। বিহারী সেইখানে দাঁড়াইল। তাহার বুকের ভিতরে কে যেন আঁটিয়া চাপিয়া ধরিল, গলার কাছে গোলার মত একটা কি উঠিতে লাগিল, চোকে একটু ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিল। অপর বালক তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিল না। বিহারী নিজে অনেক বার অনেক মার খাইয়াছে, কিন্তু আজ সেই বালিকার জন্য সে ব্যথিত হইল।

তাহারাও বিহারীর স্বজাতি, অর্থাৎ ভিক্ষুক, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য। সেই জন্য বিহারী সাহস করিয়া বলিল, "ওকে মার্‌চিস্ কেন রে?"

যে মারিতেছিল সে রাগিয়া বলিল, "তোর কি রে?" রাগিয়া বালিকাকে আরও মারিতে লাগিল, বিহারীকে গালি দিতে লাগিল।

বিহারী একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। সে সময় পথে লোক জন বড় ছিল না। বিহারী গিয়া সেই নিষ্ঠুর বালককে ধরিল, ও তাহার তৈল-শূন্য রুক্ষ কেশ, জটার মত,—বিহারী তাহার কেশ ধরিয়া টানিয়া ফেলিল। বালিকা মুক্তি পাইয়া একটু সরিয়া বসিল, পলায়ন করিল না।

বিহারী এত দিন নিজেই মার খাইত, কিন্তু কাহাকেও বড় একটা মারিতে পারিত না। এখন

সেই সকল কথা তাহার মনে পড়িল। তাহার বাহুতে যেন দ্বিগুণ বল বাড়িল। সেই বালককে উত্তমরূপে প্রহার করিয়া তাহাকে টানিয়া রাস্তার ধারে ফেলিয়া দিল। পরে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও তোমার কে হয়?"

বালিকা বলিল, "কেউ নয়।"

বিহারী বালিকাকে ডাকিয়া আপনার সঙ্গে লইয়া গেল।

বালিকা ক্রমে আত্ম পরিচয় দিল। তাহার কেহ ছিল না, সে বালকের সহিত একত্রে ভিক্ষা করিত। বালক তাহাকে দিয়া সমস্ত দিন ভিক্ষা করাইত, নিজে কড়ি খেলিয়া বেড়াইত। বালিকার ভিক্ষালব্ধ সমস্ত কাড়িয়া লইত, কোন দিন খাইতে দিত, কোন দিন খাইতে দিত না। যে দিন বালিকা ভিক্ষা করিয়া কিছু পাইত না, অথবা অতি অল্প পাইত সে দিন তাহাকে মারিত।

সেই অবধি টুনী ও বিহারি একত্রে থাকিত।

২

টুনী সুন্দরী নয়। শীর্ণ, ম্লান, সঙ্কুচিত ভীত বালিকা। একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। চক্ষু কেমন করিয়া গেল জিজ্ঞাসা করাতে বিহারীকে বলিয়াছিল। টুনী এক দিন পথে ভিক্ষা করিতেছিল, এক খানা গাড়ি সেই পথে যাইতেছিল। গাড়িতে একটী বালক ও একটি স্ত্রীলোক ছিল। টুনী হাত বাড়াইয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। বালক একটা কাঁচের মারবেল লইয়া খেলা করিতেছিল, টুনীকে গাড়ীর সঙ্গে দৌড়িতে দেখিয়া হাসিয়া তাহার প্রতি মারবেল নিক্ষেপ করিল। গুলি সজোরে টুনীর চক্ষে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, সে চিৎকার করিয়া পথের মধ্যে পড়িয়া গেল। গাড়ী চলিয়া গেল। টুনীর চক্ষু বিনষ্ট হইল।

শুনিয়া বিহারী বিস্মিত হইল না। যাহারা গাড়ী চড়ে তাহারা মারে, আর যাহারা ভিক্ষা করে তাহারা মার খায়—সে তাহা জানিত। কিন্তু বিহারীর মনের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে মনে করিল যে বালক টুনীর চক্ষু কাণা করিয়া দিয়াছে তাহাকে যদি সে দেখিতে পায় ত মারিবে, তাহারও চক্ষু কাণা করিয়া দিবে; সে গাড়ী চড়িয়াছে বলিয়া ভয় পাইবে না! বিহারীর কেমন একটু মন বদলাইয়া গেল। যে সংসার হইতে সে এত দূরে ছিল, টুনী যেন তাহাকে সেই সংসারের কাছে একটু টানিয়া আনিল। তাহার চারি পাশে স্নেহের স্পর্শে যেন সমস্ত সরস, কোমল, মধুর হইয়া উঠিল। আগে যে জিনিসের জন্য তাহার কখন সাধ হইত না তাহা পাইতে ইচ্ছা হইল—পাইলে টুনীকে দিবে। টুনীকে নিত্য ভিক্ষায় যাইতে দিত না, একা যাইত। টুনীকে কোন দিন বাগানে লইয়া যাইত, কোন দিন দুই জনে নদীর ধারে বসিয়া থাকিত। মানুষের মুখে যেন পূর্ব্বের মত নিষ্ঠুরতা রহিল না, যেন খেলা ধূলায় কোথা হইতে আনন্দ আসিল।

নিজে গাছে উঠিয়া বিহারী, টুনীর জন্য পাখীর ছানা পাড়িয়া আনিত। ভিক্ষার্জ্জিত পয়সা দিয়া একটী ছোট খাঁচা কিনিয়া দিল। টুনী নিজে যাহা খাইত পাখীকেও তাহাই খাওয়াইত। বিহারী আদর করিয়া টুনীকেও পাখী বলিত। বলিত "ও শালিক পাখী, তুই টুনটুনী।" টুনটুনী বিহারীর গলা জড়াইয়া হাসিত। তাহারা কাহারও হিংসা করিত না, অদৃষ্টের নিন্দা করিত না, হাসি খুসিতে কাল কাটাইত। কোন দিন ভাল খাওয়া হইত না, কোন দিন অনাহারে থাকিত। কিন্তু তাহাতে তাহারা কষ্ট বুঝিতে পারিত না, কেন না চিরকাল তাহাদের ঐ রূপ গিয়াছে। বিহারীর

মনে পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু বল হইল। এখন যেন আর এক জনের ভার তাহার উপর পড়িল। সুখ দুঃখের যেন একজন ভাগী হইল। জীবনের যেন একটা উদ্দেশ্য হইল, পৃথিবী তাহার চক্ষে যেন সুন্দর হইল।

৩

ভিক্ষা করিয়া খাইলেও মানুষের—বিশেষ ছেলে মানুষের মনে যে সাধ হয় না এমন কথা বলা যায় না। বিহারী ও টুনী গাড়ী দেখিত কিন্তু গাড়ী চড়িতে পাইত না। সময়ে সময়ে তাহাদের গাড়ী চড়িবার সাধ হইত। কিন্তু গাড়ীর ভিতরে ত চড়িবার যো নাই, গাড়ীর পিছনে কখন কখন চড়িত। টুনী আগে যেমন ভীত ছিল, এখন তেমনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিন এক-খানা গাড়ী যাইতেছিল, টুনী দৌড়িয়া তাহার পিছনে চড়িয়া বসিল। বিহারী পথে দাঁড়াইয়া-ছিল।

রাস্তায় দুই একটা দুষ্ট বালক চেঁচাইল, "কোচম্যান, পিছনে চাবুক।" কোচম্যান সেই কথা শুনিয়া পিছনদিকে চাবুক হাঁকাইল। চাবুক খাইয়া টুনী গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। নামিতে গিয়া পড়িয়া গেল। পিছনে আর এক-খানা গাড়ী আসিতেছিল। টুনী উঠিবার পূর্ব্বেই গাড়ীখানা তাহার উপর আসিয়া পড়িল। টুনী চাকার তলায় পড়িল।

"হা হা" করিয়া চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। গাড়ী থামিল। চাকার তলা হইতে টুনীকে টানিয়া বাহির করিল। বালিকা মূর্চ্ছিতা, তাহার মাথার পিছন দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তাহাকে তুলিয়া হাঁসপাতালে লইয়া গেল। বিহারী সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অনেকক্ষণ পরে বালিকার চৈতন্য হইল। অনেক কষ্টে মাথা ফিরাইয়া ডাকিল "বিহারি!"

বিহারী মাটিতে বসিয়াছিল। উঠিয়া শয্যার পাশে গিয়া কহিল "টুনী কোন ভয় নাই, সেরে যাবে।"

বালিকা ক্লিষ্ট স্বরে কহিল, "হাঁ, সেরে যাবে।" বালিকা আর একবার চক্ষু ফিরাইল। বিহারী তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া খাঁচাসুদ্ধ পাখী তুলিয়া ধরিল। টুনী অল্প হাসিল। কথা কহিতে বড় যন্ত্রণা বোধ হইতেছিল।

তাহার পর জ্বর হইল, বিকার হইল। সেই অবস্থায় বালিকা কেবল ডাকিত, "বিহারি, আমার পাখী!"

বিহারী বসিয়া বসিয়া দেখিত। ধীরে ধীরে, দিন কয়েকের পর, টুনী চলিয়া গেল। মৃত দেহ গৃহের বাহিরে লইয়া গেলে পর বিহারী ঘরের বাহিরে আসিল। খাঁচা খুলিয়া পাখীকে উড়াইয়া দিল। কহিল, "টুনটুনী উড়ে গিয়াছে! তুইও তার সঙ্গে যা!



ধন্য তব মহিমায়।

কে জানে আদেশে কার
মৃদুল মলয়ানীলে
প্রভাতে কানন মাঝে;
ফুলকুল সুখে দোলে।
রাঙ্গা রবি হেঁসে হেঁসে
নীলাকাশে উঠে ভেসে,
ঘুম ভাঙ্গা গীতি পাখী
গায় যে মধুর বোলে,
আমারে সে ভালবাসে
তাই বুঝি দেয় ব'লে।

সারাদিন জীবকুল
আমোদে ডুবায় প্রাণ—
হেসে খেলে সকলেরি
হয় দিবা অবসান;—
মধুর সাঁঝের বেলা,
অস্ফুট জোছনা খেলা,
ফুটে ওঠে চাঁদ তারা,
পুন পাখী ধরে তান।
তাঁহারি মহিমা গেয়ে
চলে যায় দিন মান।

ধীরি ধীরি নদী ধায়
গগণের পানে চায়
চাঁদ, তারা হেঁসে হেঁসে
চেয়ে রয় তার পানে;
হেথায় আঁধার হ'তে
জোনাকীরা ওঠে মেতে
চিকিমিকি জ্বলে সবে
আকুলি ব্যাকুলি প্রাণে
"ঝিঁ" "ঝিঁ" রবে "ঝিঁ" "ঝিঁ" কুল
ডাকে তাঁরে এক তানে।

আয় ভাই ভগ্নী মিলে
প্রকৃতির সাথে সবে
আমরাও ডাকি তাঁরে
কেন গো নীরব রবে?
তাঁহারি করুণা বলে
এসেছি এ ধরাতলে,
চাঁদ তারা ফুল পাখী
তাঁহারিত করুণায়!
জয় জয় বিশ্বনাথ
ধন্য তব মহিমায়।



আত্মোৎসর্গ।

একদা দুই ব্যক্তি একটা গভীর খনির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বারুদ প্রয়োগে এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর বিদীর্ণ করিবার আয়োজন করিতেছিল। যে পলিতা সংযোগে বারুদ প্রজ্জলিত করা হইবে দৈবযোগে তাহাতে অগ্নি সংযোগ হইল। পর-মুহূর্ত্তেই অগ্ন্যুৎপাত অবশ্যম্ভাবী। যে ব্যক্তিদ্বয় খনির অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছিল তাহারা আসন্ন

বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশায়, আকরের অভ্যন্তর হইতে অল্প সময়ের মধ্যে উপরে উঠিবার জন্য যে লম্বমান রজ্জু ও তাহার প্রান্ত সংযুক্ত লৌহময় আসন থাকিত, তদুপরি উভয়ে আরোহণ করিল। কিন্তু উভয়ের ভার এত গুরু হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে সমকালে উপরে উত্তোলন করা অসম্ভব হইল।

এই সঙ্কট কালে বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কহিল;—ভাই, তুমি আপনার প্রাণ রক্ষার্থ সচেষ্ট হও, তোমার স্ত্রী ও পুত্র আছেন, তাঁহাদিগের মুখ পানে চাহিয়া আত্ম-রক্ষার্থ যত্নবান হও এই বলিয়া নিমেষ মধ্যে সেই আসন হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিম্নে অবতরণ করিল; বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ উপরে উত্তোলিত হইল।

ইহার অব্যবহিত পরেই একটা হৃদয় বিদারক ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আকর ধূমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারময় হইয়া গেল। পরে ধূম বিনির্গত হইলে উপরিস্থ ব্যক্তিগণ খননকারীর দেহ বিশেষ অন্বেষণ মানসে খনির অভ্যন্তরে অবতরণ করিয়া যখন দেখিল যে সেই তরুণবয়স্ক ব্যক্তি খনির এক প্রান্তে ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড সমূহে সমাচ্ছাদিত হইলেও অক্ষত শরীরে জীবিত রহিয়াছে, তখন তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পরার্থে আত্ম বিসর্জ্জন করিবার জন্য সকলেই সেই খননকারীকে ভূয়োভূয়ঃ সাধু বাদ প্রদান করিতে লাগিল।



আগ্নেয় গিরি।



নেকদিন পরে এট্‌না আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎগমের কথা শুনা গেল। গত ১০ই জুলাই রবিবার প্রথমে প্রবল ভূমিকম্প হয়; কিছুকাল পরেই ভীষণ বেগে এটনার গহ্বর হইতে ধূম এবং ক্রমে অগ্নি, জলন্ত প্রস্তর ও গলিত ধাতু প্রভৃতি উত্থিত হইতে থাকে। এই অগ্ন্যুৎগীরণ কয়েকদিন পর্য্যন্ত ছিল। নিকলসি নামক একখানি গ্রাম একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি দ্রাক্ষা ক্ষেত্র এবং বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রায় বার হাজার লোক প্রাণ-ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বিসুভিয়স নাকি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

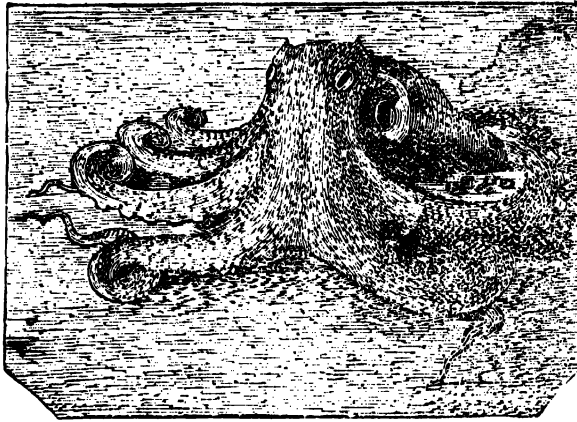
ইউরোপে যে সকল আগ্নেয় গিরি আছে, তাহার মধ্যে এট্‌নাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এট্‌না একটী বিচ্ছিন্ন পর্ব্বত—সিসিলি দ্বীপের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত; এটনার পূর্ব্বদিকে ভূমধ্যসাগর, সাগরের তীরস্থ প্রায় ত্রিশ মাইল স্থান এট্‌নার গহ্বর হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থে পরিপূর্ণ। এট্‌নার তলদেশের পরিধি প্রায় ৯০ মাইল। পরে ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। বহু বৎসরের উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সকল জমিয়া এই বৃহৎ পর্ব্বত নির্ম্মিত হইয়াছে, এটনার এখন উচ্চতা ১০৮৭৪ ফিট। পর্ব্বতের শিরদেশে যে একটী কোণ আছে তাহাই গহ্বরস্থ পদার্থ সকল উদ্গীরণ করিবার প্রধান মুখ। তদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি

* আগ্নেয় পর্ব্বতের ছবি ৩য় ভাগ সখার ৮২ পৃষ্ঠায় দেখ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ আছে, কতক গুলি অন্যান্য বড় বড় মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এট্‌নার উপরের অংশে প্রায় ৮৫টী মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সকল গুলিই এট্‌না পর্ব্বতের। ইহাদিগের কতকগুলি ভয়ঙ্কর, বৃক্ষ লতা পরিপূর্ণ কিছুই দেখা যায় না। আবার কতকগুলি ছোট বড় বৃক্ষ, সুন্দর লতা পুষ্পে শোভিত।

এটনার উপরিভাগ এত উচ্চ যে সেখানে কোন প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মে না। কোথায় বরফে আবৃত থাকায় শুভ্র ও অন্যান্য স্থান ঘোর ধূসর বর্ণ দেখা যায়। এই মরুময় প্রদেশের নিম্নে ছয় সাত মাইল বৃক্ষ লতাদিতে পরিপূর্ণ এবং তল দেশে নানা প্রকার কৃষি হইয়া থাকে। এই স্থানে শস্য, এবং নানাপ্রকার সুগন্ধি লতাদি জন্মিয়া থাকে।

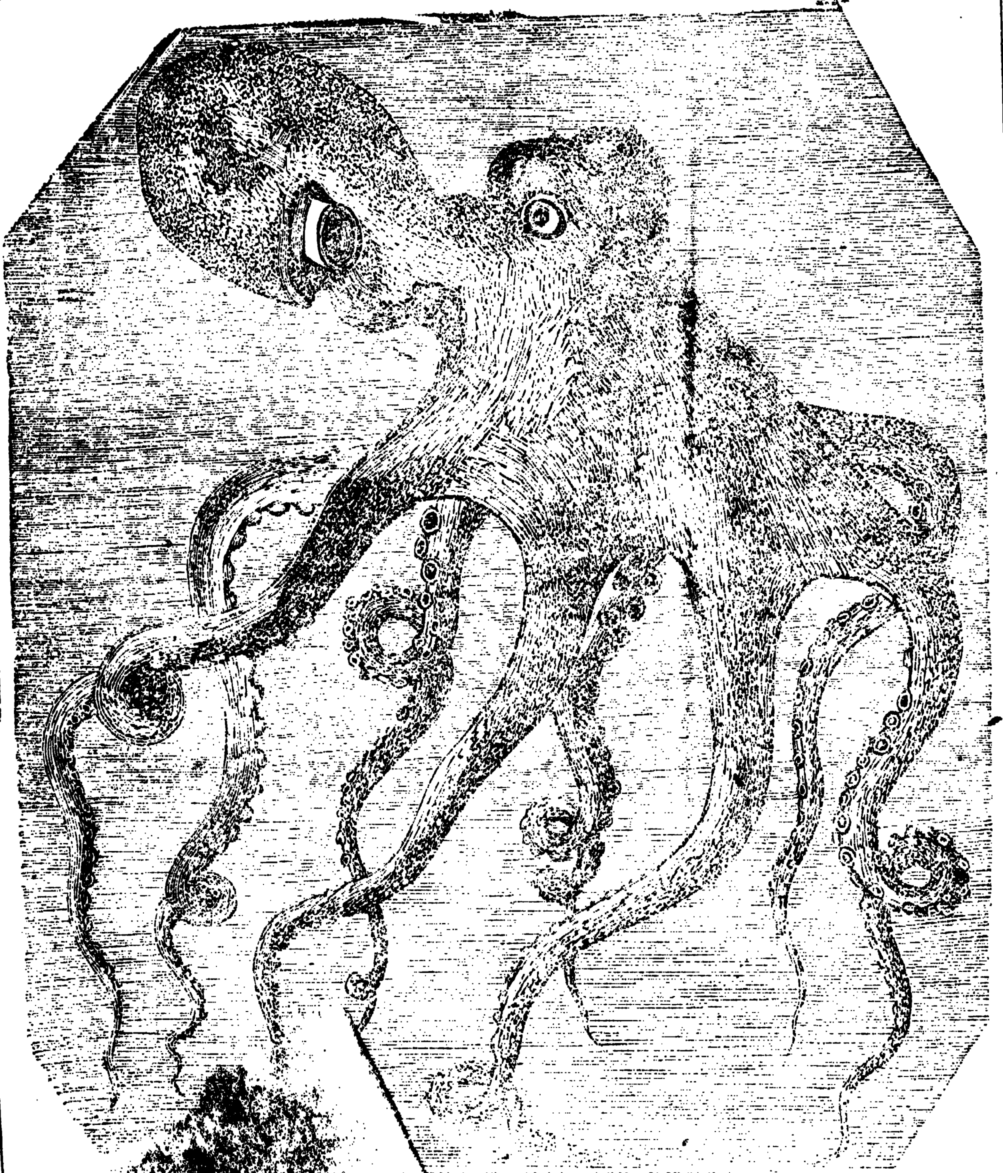
অষ্টপদী জলদৈত্য।



ঠাকুরমার কাছে ছেলেবেলা অনেক ভূত পেত্নী, দৈত্য দানব, রাক্ষস রাক্ষসীর গল্প শুনিয়াছি; জ'লো ভূতেরও দু একটা গল্প না শুনিয়াছি এমন নয়, কিন্তু ঠাকুরমা অষ্টপদী জল-দৈত্যের কথা জানিতেন না, জানিলে অবশ্যই বলিতেন। তাই প্রথম যে দিন এই জল-দৈত্যের কথা একখানি গল্পের পুস্তকে পড়িলাম এবং পুস্তকের পৃষ্ঠায় ইহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল, সেদিন বড়ই ভয় হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুরমার ভূতের গল্পের মত এ জল-দৈত্যের কথাও 'গল্প'—মনকে এই আশ্বাস দিয়া ভূতের ভয়ের মত এ জল-দৈত্যের ভয়ও কতক এড়াইয়াছিলাম। কিন্তু আর তাহা পারিলাম কৈ? প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের [illegible] বসিয়া কাজ নাই, কোথায় সমুদ্র মধ্যে দৈত্[illegible] করিতেছিলেন, চক্রান্ত করিয়া[illegible]ছেন। সুতরাং যে ভয়ের [illegible]ছি সে

ভয়ের কারণ এখন ষোল আনাই বর্ত্তমান। যে ভয়ঙ্কর জীবের ছবি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেখিতেছ, উনিই সেই অষ্টপদী জল-দৈত্য; উঃ কি ভয়ঙ্কর চাহনী।

বিদেরা এই সমস্ত জীবদিগকে আকৃতি ও গঠন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার একটী বিভাগের কথা এখানে বলা



অ[illegible] কার কীট পৃা[illegible] দং-

আবশ্যক। প্রাণীদিগের মধ্যে পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতির মেরুদণ্ড আছে এবং কীট পতঙ্গ, কোন

কোন মৎস্য ও কোন কোন সমুদ্রবাসী জীবের মেরুদণ্ড নাই। যাহাদিগের মেরুদণ্ড আছে পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে মেরুদণ্ডযুক্ত (Vertebrata) এবং যাহাদের মেরুদণ্ড নাই তাহাদিগকে মেরুদণ্ডহীন বা (invertebrata) বলিয়া থাকেন।

মেরুদণ্ড শূন্য জলচর জীবের মধ্য এক জাতীয় জীব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগের হাত অথবা পা মুখের চারিদিগে মাথা হইতে বাহির হইয়াছে। পণ্ডিত কুভের এই জন্যই ইহাদিগকে মস্তকপদী (Cephalopoda) নাম দিয়াছেন। মেরুদণ্ড শূন্য জলচর জীবের মধ্যে এই জাতিই প্রধান। আমাদের দেশে অষ্টপদী জল-দৈত্য এই জাতীয় জীব—এই মস্তকপদী জীবদিগের মধ্যে আবার দু একটী শ্রেণী দেখা যায়, এক শ্রেণীর সামুকের মত একটা কঠিন আবরণ আছে, আর এক শ্রেণীর তাহা নাই। অষ্টপদী দৈত্য এই শেষ শ্রেণীভুক্ত। আবরণ বিশিষ্ট জীবদিগের মধ্যে নটিলাস (Nautilus) এর একটি ছবি আমরা দিলাম। এই নটীলাস একটী অদ্ভুত সমুদের জীব। ইহার সম্বন্ধে ইউরোপের সর্ব্বত্রই অতি অদ্ভুত গল্প সকল প্রচলিত ছিল। এরিষ্টটল বলিয়াছেন যে, যখন বড় বৃষ্টি না থাকিত, সমুদ্র যখন ধীর স্থির প্রশান্ত থাকিত, তখন এই নটিলস্ দুইখানি পাল তুলিয়া দিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিত, এবং ইহার আর ছয়খানি হাত, ছয়টী দাঁড়ের কার্য্য করিত। বাতাস উঠিলে আবার পাল নামাইয়া সমুদ্র গর্ভে চলিয়া যাইত, নৌকা ও জাহাজের ন্যায় নটিলাসের ঝড় বৃষ্টিতে কোন ভয় ছিল না। মানুষ নাকি ইহারই নিকট পাল তুলিয়া সমুদ্রে চলিতে প্রথম শিক্ষা করে। সে কালে প্রাণি-তত্ত্ববিদেরা এ সমস্ত বিশ্বাস করিতেন। বাইরণ পোপ প্রভৃতি কবিরাও এই সমুদ্রগামী নাবিকের কত গুণগাণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, যে নটিলাসের পাল তুলিয়া সমুদ্রে বিচরণ করার কথা গল্পমাত্র।

সে যাহাহউক আমাদের অষ্টপদী জল-দৈত্যকে প্রাণি-তত্ত্ববিদেরা অক্টোপোডা (Octopoda) নাম দিয়াছেন অর্থাৎ আটখানি হাত এই জন্যই ইহার এই নাম। ৪৬ প্রকারের অষ্টপদী এপর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। উষ্ণ প্রধান সমুদ্রের সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সমুদ্রের মধ্যে বাস করে বটে, কিন্তু জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চমাসে ডিম পাড়িবার জন্য সমুদ্র তীরস্থ পর্ব্বতময় স্থানে আসিয়া থাকে। কখন কখনও ইহাদিগকে সমুদ্র তীরেই বাস করিতে দেখা যায়।

ইহাদিগের হাত বা পায়ের আকৃতি ও গঠন একই প্রকার, কিন্তু সবগুলি সমান নয়। প্রত্যেক হাতেই শোষণ করিবার জন্য ৩০টী করিয়া ছিদ্র আছে। শরীরের মধ্যে ইহাই ইহাদের প্রধান অঙ্গ, ইহাদ্বারা ইহারা [illegible] আহার সংগ্রহ করে, [illegible]র সহিত যুদ্ধ

করে এবং তাঁহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে। ইহাদিগের এই হস্তে অসীম বল। একবার ইহাদিগের হস্তে পড়িলে রক্ষা থাকে না। ক্রোধ-উদ্দীপ্ত হইয়া যখন এই ভীষণ বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া দুইশত চল্লিশটী শোষণ ছিদ্র দ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন ইহাদিগের অপেক্ষা অধিক বলশালী জীবেরও আর নড়িবার শক্তি থাকে না। সমুদ্র মধ্যে যত প্রকার ভয়ঙ্কর জীব আছে, এই অষ্টপদী জল-দৈত্য তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ ডেলি, ডি, মণ্টমোর্ট একখানি প্রাণি-বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি বলেন যে একটী অষ্টপদী একখানা তিন মাস্তুলের জাহাজ তাহার বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিল। ইটালী দেশের ডুবুরীরা ইহাদের ভয়ে সদা সশঙ্কিত। বেশী দিনের কথা নয় ১৮৭৯ সন ৪ঠা নবেম্বর স্মেল নামক এক জন গবর্ণমেণ্টের ডুবুরী অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণের কাছে একস্থানে সমুদ্র গর্ভে এক অষ্টপদীর হাতে পড়িয়া মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে একখানা অস্ত্র ছিল তাহাদ্বারা ক্রমাগত আঘাত করিতে করিতে অষ্টপদীর শরীর খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল, অবশেষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। স্মেল্ বলেন যে এই অষ্টপদী জলদৈত্য পাঁচ-ছয় জন লোককে অনায়াসে কবলিত করিয়া রাখিতে পারে। স্তন্যপায়ী জীবের জিহ্বার ন্যায় ইহারা ইহাদের এই বাহুগুলি ইচ্ছামত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারে অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে খুব ছোট করিতে পারে আবার খুব বড় করিতেও পারে, এবং বাকাইতে ও সকল দিকেই পরিচালিত করিতে পারে। বাদুড়ের ন্যায় ইহারা দিনের বেলা বড় বাহির হয় না, [illegible] অন্বেষণে বাহির হয়। সমুদ্রে [illegible] পর্ব্বতের গায়ে মিলিয়া থাকিয়া দু তিনটী বাহু প্রসারিত করিয়া থাকে যখন কোন শিকার আসে অমনি তাহাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া গ্রাস করে। ইহারা মাংসাশী জীব।

ইহারা খুব দ্রুত গমন করিতে পারে, যখন দেখে পলাইবার আর উপায় নাই, তখন এক প্রকার ঘোর মেটে রং শরীর হইতে বাহির করিয়া জল এমন বিবর্ণ করিয়া দেয় যে, আর ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধরা পড়িলেও বাহুদ্বারা সমুদ্র বা পর্ব্বতের গায়ে এমন আকর্ষণ করিয়া থাকে যে, কোন মতেই তাহাকে ছাড়াইয়া আনা যায় না। ইহারা আবার ইচ্ছামত শরীরের রং বদলাইতে পারে।

ডার উইন বলেন যে রাত্রিতে অষ্টপদী শরীর হইতে এক প্রকার কি জ্যোতি বাহির হইয়া থাকে। অষ্টপদীরা এক একবারে চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার ডিম পাড়ে, সবগুলি কিছু ফোটে না; ফুটিতে পঞ্চাশ দিন লাগে। ছোট বাচ্চাগুলি স্বচ্ছন্দে আলোতে জলের উপর খেলা করিয়া বেড়ায়, বড় হইলে আলো পরিত্যাগ করে এবং কেবল অন্ধকারে বাহির হয়। ইহার মাংস মানুষে খাইয়া থাকে। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী দেশ সমূহে ইহার মাংসের খুব আদর।



মোকদ্দমার পরিণাম।*

মাদের দেশ আজ কাল মামলায় উচ্ছন্ন যাইতেছে। লোকের ধন মান, প্রাণ সম্ভ্রম সমস্তই মামলায় যায় যায় হইতেছে। মামলায় ধর্ম্মনাশ দেখিয়া মনে বড় দুঃখ উপস্থিত হয়। সত্যবাদী মামলায় পড়িয়া অসত্যবাদী হইতেছে, ধার্ম্মিক মামলায় গিয়া অধার্ম্মিকের একশেষ হইয়া পড়িতেছে; এবং সতী স্ত্রীলোক তাহার সতীত্ব হারাইতেছে। মামলায় প্রকৃত উত্তর না হওয়ায় দোষীকে নির্দ্দোষী বলিয়া, আর নির্দ্দোষীকে দোষী বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক আমাদের দেশে মামলায় যে কত কি ক্ষতি হইতেছে তাহা মামলাভোগী লোক মাত্রেই জানে। যাহারা মামলা করে, কেবল তাহারা যে পাপ করে এমন নয়; তাহাদের পক্ষ হইয়া যাহারা সাক্ষী এবং যাহারা তাহাদের উকীল বা মোক্তার হয়, তাহারাও মিথ্যা কথা বলে এবং প্রবঞ্চনা প্রভৃতি খারাপ কায করিয়া থাকে। মামলার দ্বারায় যে কিরূপ ক্ষতি ও বিবাদ বিসম্বাদ হয়, এবং তাহার শেষ দশা যে কি রূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ গতবারের (এপ্রেল মাসের) সখার চিত্রে পাওয়া যায়। যতদূর সাধ্য সেই চিত্রকে গল্প আকারে লিখিতে চেষ্টা করিতেছি।

হরিহর গ্রামে এক বাটীতে দুইভাই বাস করিত তাহাদের মধ্যে বড়টীর নাম নিধু ও ছোটটীর নাম বিধু ছিল, তাহাদের দুইভায়ের মধ্যে খুব ভালবাসাও ছিল৷ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই যে কিরূপ তাহারা তাহা জানিত না। তাহাদের বাটী দেখিলে বোধ হইত যেন লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। ঘরটী পরিষ্কার দেখিতে বড় সুন্দর, তাহাদের দুভায়ে মিলে মিশে সকল কাজ সুন্দর রূপে শেষ করিত; কোন কাজ করিতে কষ্ট পাইত না; একত্রে খাওয়া দাওয়া করিত। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হইত যেন দুটী ফুল এক বোঁটায় বাঁধা ছিল। কিন্তু সকল দিন সমান যায় না; তাহাদের মধ্যে বিবাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। দৈবাৎ একদিন নিধু মনে করিল, কেন আর চিরদিন একস্থানে থাকি। আমার পরিবার অল্প, আর বিধুর স্ত্রী পুত্রাদি অনেক, আমি যদি পৃথক হই, তাহা হইলে আমার অনেক পুঁজি হইবে, কেননা আমার পরিবার অল্প। এই ভাবিয়া কলে কৌশলে নিধু ছোটভাই বিধুর সঙ্গে বিবাদ করিল; পঞ্চায়ত করিয়া সমস্ত বিষয়ের অৰ্দ্ধেক করিয়া লইল। তাহাদের একটী গাভী ছিল, এটী তাহাদের উভয়ের প্রাপ্য, কারণ এই গাভীটি তাহাদের বৃদ্ধা মাতার ছিল। তাহাদের মাতা মরণ কালে কাহাকেও দিয়া যান নাই। বড়ভাই ছোটভাইকে বলিল আমি এই গাভী তোমাকে দিব না, আমি লইব; ছোটভাই বলিল বাঃ আমি তোমাকে কেন দিব? তা দিব না, আমি ইহা লইব। এইরূপে এই গাভী লইয়া দুই ভায়ে মস্ত বিবাদ করিল; দেশের ভদ্র লোকেরা বিবাদ মিটাইতে চাহিলেন কিন্তু তাহারা শুনিল না। বড় বলিল মা আমায় বড় ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহার গাভী লইব। ছোট বলিল মা আমায় ছোট বলিয়া তোমা অপেক্ষা বড় [illegible] বাসিতেন সুতরাং আমি

* গত এপ্রেল মাসের সখায় রচনা লিখিবার জন্য একটী চিত্র দেওয়া হইয়াছিল। মহিষাদল স্কুলের ছাত্র শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাসের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় আমরা তাহা সখায় প্রকাশ করিলাম। ইহাকে পারিতোষিক প্রেরিত হইয়াছে। পারিতোষিকের মূল্য ৫৲ টাকা। নরেন্দ্র নাথের বয়স ১৪ চোদ্দ বৎসর।

তাঁহার গাভী লইব। তাহারা অবশেষে বিচারালয়ে উপস্থিত হইল; মোকদ্দমা চলিল কোর্ট ফি উকিলের ফি,মোক্তারের ফি,সাক্ষিকে ঘুষ ইত্যাদি কারণে সর্ব্বস্বান্ত হইল; তাহাদের সুন্দর গৃহ শীঘ্রই শোভা শূন্য হইল। তাহারা পথের কাঙ্গাল হইল। মোকদ্দমা খরচের জন্য মহাজনদিগের নিকট যে টাকা কর্জ লইয়াছিল তজ্জন্য সমস্ত ঘর বাড়ী নিলাম হইল।

এই গল্প আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে গাভীরূপ সম্পত্তির অগ্র পশ্চাত ধরিয়া নিধু ও বিধু টানাটানি করিতেছে আর মোকদ্দমা রূপ দোহন কর্ত্তা দুগ্ধরূপ সমস্ত কাটাকড়ি আত্মসাৎ করিতেছে, অর্থাৎ এক গাভীকে লইয়া দুইভাই টানাটানি করিল, মোকদ্দমা করিতে লাগিল আর উকীল মোক্তার প্রভৃতি গাভীর দুগ্ধরূপ ধনসম্পত্তি প্রভৃতি দোহন করিয়া লইল। সুতরাং মোকদ্দমা করা কোন মতে উচিত নয়। এখানে আরও একটুকু ভাবিলে যথেষ্ট হয় যে, যদি তাহারা পরস্পর গাভীকে মিলে মিসে কোন মতে লইত তাহা হইলে কি এত দূর দুর্দ্দশা ঘটিত? কখনই না। সুতরাং মোকদ্দমা করিতে না গিয়া সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

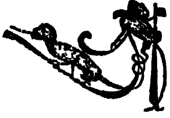
(প্রাপ্ত)

পুতুলের বিয়ে।

ছেলে মেয়ে ছুটির পরে মিলে মিসে সবে,
"পুতুল বিয়ে 'পুতুল বিয়ে' মেতে গেল রবে।
এ আনছে শা[illegible] আনছে ফুল,
বিয়ে পাড়ায় [illegible]েন কুল।
কেউবা লয়ে অলঙ্কার কনেয়ে সাজায়,
পুতুলের সখী যারা বসে গান গায়।
কেউবা লয়ে দাসীদেরে কেনা বেচা করে,
ধুলা মাটি শাকশব্‌জি এনে রাখে ঘরে।
কেউবা এসে বঁটি লয়ে কাটে শাগের ডাল,
ডাল্‌না হবে বলে তাঁরা ভুলেছে মার গাল।
কারুর মেয়ে এসে ব'সে উৎসাহ বাড়ায়,
ঘর-কন্না গিন্নী-পানা সবারে দেখায়।
একি হোল একি খেলা পুতুলের বিয়ে,
নিমন্ত্রনে যত পুতুল এ'ল দেখ্‌তে ঝিয়ে।
ছেলে বুড়োয় বিয়ের বাড়ী হ'ল ভরপুর,
থেকে থেকে ছেলের কান্না—উঠ্‌ছে নানা সুর
ওদিকেতে কর্ত্তা বাবু বসে আছেন দ্বারে,
এমন সময় দেখা গেল বরযাত্রী দূরে।
গাড়ী করে আস্‌ছে বর কিবা শোভা তার,
ধরাতলে এমন ব্যাপার ঘটে কয়জনার।
বিয়ের বাড়ী বরের গাড়ী আসিয়া লাগিল,
বরের সাথে সবাই এসে আসরে বসিল।
কন্যা-কর্ত্তা ছিলেন যিনি ভুঁড়ি-আলা বাবু,
চল্‌তে ফির্‌তে সময় নষ্ঠ নিহাত তিনি কাবু।
কি করিবেন সম্প্রদান কথা নাহি-সরে,
পুরুত-ঠাকুর মন্ত্র প'ড়ে কনে দিল বরে।
এমন সময় মেয়ের পালে উলু দিয়ে উঠে,
শুন্‌তে পেয়ে গিন্নীমাদের চড় উঠ্‌ল পিটে।
সাঙ্গ হ'ল 'পুতুল বিয়ে' নীরব সবাই,
যা'দের নিয়ে এতই কাণ্ড তা'দের প্রাণ নই।
নড়ি চড়ি যাহা করি মূল শক্তি তিনি,
পুতুলের খেলা যেন তাঁরে নাহি চিনি।



দাক্ষিণাত্য।

রতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া সম্মুখে রাখ, দেখিবে বিন্ধ্য পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরাংশকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণাংশকে দাক্ষিণাত্য বলে। দাক্ষিণাত্যের মহিলারা বাঙ্গালার মহিলাদের ন্যায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ঘরের কোণে থাকেন না। তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই। ইঁহারা প্রকাশ্য স্থানে ঘোম্‌টা না দিয়া গমনাগমন করেন। কখন কোন বিদেশীয় নিমন্ত্রিত হইয়া কাহার বাড়ী উপস্থিত হইলে মহিলারা স্ব হস্তে অতিথিকে অন্ন পরিবেশন করেন ও মধুর আলাপে তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন। কিন্তু কোন কোন স্থলে একটী উপহাসস্কর প্রথা প্রচলিত আছে—এই স্ত্রীলোকেরাই আবার বিনাচ্ছাদনে যানারোহনে কোথায়ও গমনাগমন করেন না।

দাক্ষিণাত্যে প্রকৃতির বাহ্য শোভা যেরূপ বিচিত্র, ইহার অধিবাসিগণের আচার ব্যবহারও তেমনি বিচিত্র। যাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আচার ব্যবহার দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান জাতি বাস করে, এক স্থানের হিন্দু মুসলমানগণের আচার ব্যবহার দেখিলেই সকলকে জানা যায়; বস্তুতঃ তাহা নহে। মুসলমানগণের আচার ব্যবহার অনেক স্থানে এক রকম হইতে পারে, কারণ তাহাদের একটী সাধারণ জাতীয় আচার ব্যবহারের আদর্শ আছে, হিন্দুদের সেরূপ কিছু নাই। হিন্দুগণের উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক মধ্যে এক ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীস্থ অন্যান্য যাঁহারা এদেশে আছেন, অন্যত্র তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। পশ্চিমে এদেশীয় কায়স্থদিগের সদৃশ লালা নামা যে এক শ্রেণীর লোক আছেন, মুসলমানগণের সংশ্রবে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার এত ভিন্ন হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহাদিগকে আর এখন ইহাদের সঙ্গে এক শ্রেণীর লোক বলিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না। তথাপি হিমালয়ের নিম্নস্থ উত্তর পশ্চিম দেশের অধিবাসীর সহিত বাঙ্গালার লোকগণের আচার ব্যবহারে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য হিন্দুগণের আচার ব্যবহার দেখিলে এরূপ কখন প্রতীত হয় না যে, এপ্রদেশীয়েরা কোন কালে ঐ সকল জাতির সহিত এক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

অনেকে ইঁহাদিগকে আর্য্য জাতীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। দক্ষিণ প্রদেশে মহারাষ্ট্রী, তুলু, কোঙ্কাণী, সারস্বত প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। এদেশীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে ইঁহাদের আচার ব্যবহারের অনেক সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, কতকগুলি বিষয়ে ইঁহাদের আচার ব্যবহার এত ভিন্ন যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

আমাদের দেশীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রাভিলাষিণী মহিলাগণ যেমন পরিচ্ছদের জন্য দর্শনের অযোগ্য হন, তাঁহারা সেরূপ নহেন, কিন্তু কাছা দেওয়া পরিচ্ছদও সময়ে সময়ে এরূপে পরিহিত হয় যে স্থূল বস্ত্র সত্বেও তাঁহাদের পরিচ্ছদকে সভ্য পরিচ্ছদ বলা যাইতে পারে না। শূদ্রদিগের মধ্যে এই দোষটী নাই। ধেড় নামা এক অতি নীচ [illegible] তাহাদের স্ত্রীগণ বৃক্ষের পত্র দ্বা[illegible] করে, কেবল নগর মধ্যে [illegible] ভয়ে এক খানি [illegible] আচ্ছাদন দেয়।

মলয় প্রদেশের স্ত্রীগণের শুদ্ধ মধ্য দেশ আবৃত, উপর ও নিম্নভাগ নগ্ন।

এই সকল প্রদেশে বাল্য-বিবাহ হয় বটে, কিন্তু এ দেশের শাশুড়ীগণ বৌ লইয়া ঘরকন্না করিতে যেমন নিতান্ত অনুরাগিণী সে দেশে তেমন নহে। বিবাহের পর অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকারা বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। শূদ্রগণের মধ্যে বিবাহ কেবল সম্মতি বা দান মাত্র, কোন প্রকার অনুষ্ঠান নাই এবং বিবাহ বন্ধন অতি শিথিল। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে একটী ব্যবহার চলিত আছে। আমাদের দেশে বর জামাজোড়া বা চেলী পরিয়া ধুম ধামের সহিত বিবাহ করিতে যান, সে দেশে তাহার বিপরীত। কোথায় বর রাজবেশ পরিবেন, না বিবাহের পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর বেশে সাজেন। এরূপ করিবার অর্থ এই যে বর কাশী যাইব বলিয়া ব্রহ্মচর্যের বেশ ধারণ করেন। কন্যার পিতা আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, "একাকী এতদূরে যাইতে ক্লেশ হইবে, সঙ্গে একটী পরিচারিকা গ্রহণ করুন, তিনি পথে এবং দূর দেশে আপনার পরিচর্য্যা করিবেন।" নবীন ব্রহ্মচারী ইহাতে সম্মত হয়েন এবং কন্যা দান গ্রহণ করেন কিন্তু বিবাহের পর কাশীতে গমন করা দূরে থাকুক ঘোর সংসারী হইয়া পড়েন।

আমরা বলিয়াছি সে প্রদেশের রমণীগণের স্বাধীনতা আছে; কিন্তু তাহা বাহ্যিক বস্তুতঃ যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা অতি বিরল। এত স্বাধীনতা সত্বেও জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে প্রায় কাহারও সম্বন্ধ নাই। মূর্খতাতে যে সকল দোষ সঙ্ঘটিত হয়, সে [illegible] তাহাদিগের মধ্যে যথেষ্ট আছে। [illegible] বিধবাগণের ন্যায় ইহারা এত ক[illegible] বিধবামাত্রেরই মস্তক মুণ্ডন [illegible]

দাক্ষিণাত্যের শূদ্রগণকে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিতান্ত ঘৃণা করেন। তাহাদের সংশ্রব রাখা দূরে থাকুক, কোন কোন জাতিকে তাঁহারা স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। ইহাতে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সম্পূর্ণরূপে সেখানে ঘটিয়াছে। শূদ্রগণ উচ্চ নীতি জানে না, সুতরাং তাহাদের মধ্যে আচার ব্যবহার অতি কদর্য্য ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার এত অসহনীয় যে, সে সকল কথা শুনিলে হৃদয় অস্থির হইয়া উঠে। ইহাদিগের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীলোকেরা পিতৃগৃহে বাস করে এবং দাম্পত্য প্রণয় ও সতীত্ব কাহাকে বলে জানে না। কোন ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করা এবং পরিত্যাগ করা তাহাদের স্বেচ্ছাধীন, এরূপ ব্যবহার জন সমাজে কিছুমাত্র দূষ্য বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ ধর্ম্মনীতির অভাবে পিতা এবং পুত্রের সম্বন্ধ কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই কারণে ইহাদিগের উত্তরাধিকারের নিয়মও আশ্চর্য্য। পিতার বিষয় পুত্রে পায় না, মাতুলের বিষয়ে ভাগিনেয় অধিকারী হয়। ইহা দ্বারা সামাজিক নিয়ম কতদূর বিকৃত ও বিশৃঙ্খল হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সমাজ মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা কম এবং আমাদের যাহা আছে তাহাই ভাল, পৃথিবীতে আর কাহারও কিছু ভাল নাই—এই প্রকার বিশ্বাসে, কখন মানবের মঙ্গল এবং উন্নতি হয় না। সর্ব্বদাই জ্ঞানের সাহায্যে অন্যের সহিত নিজেদের ভাল মন্দ বিচার করিয়া, মন্দ ভাগ ত্যাগ এবং অন্যের ভাল আচার ব্যবহার, রীতিনীতি গ্রহণ করিলে মানবের সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি হয়।

—



নভেম্বর, ১৮৯২।



বিবিধ।

আকাশে বিজ্ঞাপন।—ইউরোপে এক ব্যক্তি আকাশের গায়ে বিজ্ঞাপন দিবার কৌশল বাহির করিয়াছেন। কলের সাহায্যে আকাশপটে বিজ্ঞাপন প্রকটিত হইবে। অদ্ভুত কাণ্ড এই অভিনব কলের পরীক্ষা হইতেছে।

*
* *

নক্ষত্রের আলেখ্য।—ক্রাস্ নাম্নী জনৈক ইংরাজ মহিলা নক্ষত্রের আলেখ্য তুলিবার এক প্রকার ফটোগ্রাফ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। গ্রিনুইচের মান-মন্দিরে এক্ষণে তাহার পরীক্ষা হইতেছে। হারবার্ডের মান-মন্দিরে শেষে এই যন্ত্রটী স্থাপিত হইবে।

*
* *

সৎ কাজের পুরস্কার।—প্রায় ৭ মাস হইল একটা উড়িয়া মালী ৫০০ শত টাকার দুইখানা নোট পথে পায়। সে তৎক্ষণাৎ তাহা পুলিষের নিকট দেয়। ৬ মাসের মধ্যে কেহ সেই নোট দুইখানার দাবী না করায় পুলিষ সেই মালিকে নোট দু-খানা দিয়াছেন।

*
* *

রুষ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর দয়া।—রুষ রাজ্যে ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক দিন রুষ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গের হাসপাতালে ওলাউঠা রোগীদিগকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সম্রাট প্রত্যেক পুরুষ রোগীর নিকট গিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন এবং সম্রাজ্ঞীও স্বামীর অনুকরণে স্ত্রী রোগীদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন। রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে করিতে জনৈক শুশ্রূষাকারিণীর ওলাউঠা হইয়াছিল, সম্রাজ্ঞী অতি যত্নের সহিত তাহার অবস্থা শুনিয়া তাহার দুটী গণ্ডদেশ চুম্বন করিয়াছিলেন।

*
* *

বানরের ভাষা।—মার্কিন দেশীয় অধ্যাপক গার্ণার বানরের ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, এবং ইতিমধ্যেই কতকগুলি শব্দ তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। ফনোগ্রাফে বানরের নানা প্রকার কিচির মিচির শব্দ লিপিবদ্ধ করিয়া [illegible] সেই শু[illegible] সম্মুখে [illegible] অর্থও

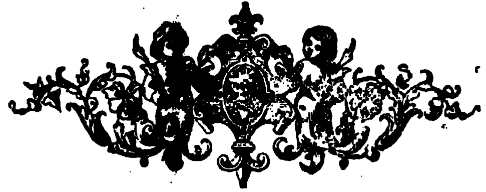
অনেকটা নির্ণয় করিয়াছেন। সম্প্রতি আফ্রিকার গরিল্লা ও শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বনমানুষদের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন। বানরের ভাষা শিক্ষা করিতে পারিলে, উহাদের দ্বারা অনেক কাজ করান যাইবে; এক সময়ে উহাদের আকৃতিগত ও ভাষাগত অনেক পরিবর্ত্তন হইবে।

*
* *

মঙ্গল গ্রহ।—১৪৯২ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে এসিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ ভিন্ন আর কোথায়ও মানুষ ছিল, কেহ জানিতেন না। আমাদের পৃথিবীর সহিত মঙ্গল গ্রহের আকৃতিতে অনেক সাদৃশ্য আছে। এই গ্রহের মেরুদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্ব তুষারাবৃত। মঙ্গল গ্রহে, আমাদের চন্দ্রের ন্যায় উপগ্রহও আছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে মঙ্গল গ্রহেও ধীশক্তিসম্পন্ন জীব বাস করে। এই গ্রহে কখন কখন একটী ত্রিকোণাকার আলোক দেখা যায়। সম্ভবতঃ উহা আমাদের প্রতি সঙ্কেত। আমাদের পৃথিবীতে ৬ মাইল দীর্ঘ একটী উজ্জ্বল আলোক দিলে মঙ্গল গ্রহবাসীর নয়নগোচর হইতে পারে। বিজ্ঞানের বলে এমন এক দিন হয় ত আসিবে, যখন উভয়গ্রহবাসী একে অন্যের সহিত যে কোন উপায়ে আলাপ করিতে সমর্থ হইবেন।

*
* *

সংবাদপত্র।—আমাদের দেশে সংবাদপত্রের ৮ কি ১০ হাজার গ্রাহক হইলেই আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই। ফ্রান্সের লা পেতিত জরন্যাল (*La Petit Journal*) প্রত্যেক দিন ১২,০০,০০০ লক্ষ ছাপা হয়। প্রায় [illegible] হইতে ৫০,০০,০০০ লক্ষ লোকে পাঠ করে। [illegible] দেশে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি [illegible] শুনি নাই, আর এই পেতি[illegible] বিজ্ঞাপন দিলে প্রত্যেক লাইন ৬০৲ টাকা এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ৩০ টাকা হিসাবে দিতে হয়; অবশ্য একবারের জন্য। অধিক দিনের বা দীর্ঘ বিজ্ঞাপন হইলেও কখন মূল্যের তারতম্য হয় না। এই কাগজের ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় কখন স্বত্বাধিকারী বিজ্ঞাপন নেন না। লা পেতিতে ফ্রান্সের বিখ্যাত লোকেরা লিখিয়া থাকেন। এক একটী প্রবন্ধের জন্য লেখক কখন কখন ১৫০০ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। এই সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর নাম এম,ক্যাসিগ্‌নিউএল। ইনি এক সময়ে ইটালিতে কম্পোজিটারের কাজ করিতেন, এক্ষণে ইনি প্রায় ৪৫,০০০,০০০ টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে এ স্বপ্ন।



পরির গল্প।

—*—


জ শনিবার; সন্ধ্যা হইয়া আসিল প্রায়; ছেলে মেয়েদের বড়ই স্ফূর্ত্তি। সকলেই খুব ছুটাছুটী করিতেছে, তাহাদের লেখা পড়ার ভাবনাটা তত নাই—কাল রবিবার পড়া মুখস্থ করিবার অনেক সময় রহিয়াছে। ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল, আর একটী দুটী করিয়া আমাদের বাড়ীর ছেলে মেয়েরা হাত পা মুখ ধুইয়া ঠাকুরমার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। অগ্রহায়ণ মাস, শীত তত কন্‌কনে নয়, ঠাকুরমা আগুনের তাওয়া সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছেন। টেপা বলিল "ঠাকু'মা একটা উপকথা বল"। নলিনী "পদ্মাবতীর" কথা

শোনার জন্য জেদ করিতে লাগিল। বিধুর "সোণার কাঠী রূপার কাঠী" বড়ই প্রিয়। এই প্রকারে যাহার যেটী প্রিয় গল্প, সে সেটী শুনিবার জন্য ঠাকুরমাকে জেদ করিতে লাগিল। আস্তে আস্তে একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইল। আমাদের শৈল এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল; সে এখন ঠাকুরমাকে বলিল "কাকীমাকে যে পরিতে পেয়েছিল, তা তুমি জান, সেইটা বল, ওদের কথা শুন না।" গোলমাল থামিয়া গেল; পরির গল্প শুনিবার জন্য সকলেরই যেন ইচ্ছা হইল। জানি না এইটী শুনিবার জন্য সকলে কেন একমত হইল। ঠাকুরমা পরির গল্প বলিলেন। তাঁহার গল্প বলিবার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল; গলার স্বর নানারকম করিতে পারিতেন; কখন বা কাঁদিতেছেন, কখন বা হাসিতেছেন, কখন বা গলা সপ্তমে উঠাইতেছেন, ছেলে মেয়েগুলি অমনি ভয়ে জড় সড় হইতেছে। তিনি বাস্তবিকই দশ জনের কথা একলা দশজন হইয়া বলিতে পারিতেন। গল্পের সময় তাঁহার কান্না শুনিয়া ছেলে মেয়েগুলি কাঁদিয়া ফেলিত; অট্ট হাসিতে উহারা "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিত। তিনি যে রকম করিয়া পরির কথা বলিয়াছিলেন, আমাদের পক্ষে সে প্রকারে লেখা অসম্ভব। আমরা পরির কথা সংক্ষেপে সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিব।

"আমাদের পাড়ার অক্ষয়ের স্ত্রীর নাম মেনকা। মেনকাকে রোজ রাত্রিতে পরিতে লইয়া যাইত। এই পরি পরমা রূপবতী, তাহার সৌন্দর্য্যে মেনকার অন্ধকার ঘর আলোকিত হইত। পরিটী সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিতে, বেণীর মধ্যে তাহার দুটি পাখা ছিল। পরি আসিবার সময় হইতেই মেনকার ঘর সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইত, তাহার কিছুকাল পরেই পরি আসিয়া উহাকে লইয়া যাইত; পরির সঙ্গে অক্ষয়ের স্ত্রী আকাশে উঠিত। পরি মেনকাকে ছুঁইত না অথচ কি এক আশ্চর্য্য শক্তিতে উহার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে এক নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্রে, ক্রমে চাঁদে, বেড়াইত। এই সকল গ্রহ উপগ্রহে বেড়াইবার সময় মেনকা কখন ভয়ে জড় সড় হইয়া পরিকে ধরিতে চেষ্টা করিত এবং ছুইতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। আবার কখন নন্দনকাননের শোভায় আনন্দে উৎফুল্ল হইত।

"পরি মেনকাকে, নানা রকম সুমিষ্ট ফল খাইতে দিত। আমাদের বোম্বাই আম, কাবুলের ফল, তাহাদের তুলনায় কিছুই নয়। অক্ষয়ের স্ত্রী পরির নিকট হইতে নানারকম ঔষধ পাইত এবং তাহা দ্বারা কতশত অসাধ্য রোগীকে আরোগ্য করিত। পরির প্রসাদে মেনকার কোন রকম অভাবও ছিল না। মেনকার ঘরে যে



দিন অন্ত লোক থাকিত, সেদিন আর পরি অনুগ্রহ করিতেন না।"

মেনকাকে পরিতে পাওয়ার গল্প শুনিয়া আমাদের বালক বালিকাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিল, "আহা, আমায় যদি পরিতে পাইত!"

সুশীলা অন্যান্য সকলের অপেক্ষা বড়। সে ঠাকুরমার নিকট হইতে উঠিয়া জানালার নিকট বসিয়া পরির কথা ভাবিতে লাগিল। (ছবি দেখ) ইচ্ছা মেনকার মত তাহাকেও পরিতে পায়। কিছুকাল পরে সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িল। সুশীলা ঘুমের মধ্যে একটী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিল;—তাহাদের বাড়ীতে ডাকাত আসিয়াছে, সকলকেই খুব মারিতেছে, তাহার ছোট ভাইকে খুন করিবার জন্য দা উঠাইয়াছে। ভয়ে হঠাৎ সুশীলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখে সে একাকী জানালার ধারে বসিয়া আছে, আর কোথাও কিছু নাই। এবং ঘরের মধ্যে আর আর সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজকর্ম্ম করিতেছেন। সুশীলা সে রাত্রে কাহাকেও কিছু বলিল না।

কোকিলের দুঃখ।

—*—



দুখের কথা মনের ব্যথা
আর কাহারে বা ক'ব,
এমন ক'রে বেঁচে ম'রে
কত দিন আর র'ব?

কপাল পোড়া—জগৎ যোড়া
শীত হয়েছেন রাণী,
আমরা সারা, লক্ষ্মীছাড়া
পাইনে "দানা পানি!"

ভাঙ্গা গলায় গাছের তলায়
জীবন-মরা আছি,
আর পারি না, বসন্ত দা'!
দেখা দাও যে বাঁচি!

হায় রে সেকাল, সকাল বিকাল
আমের ডালে যবে,
বসে' বসে' গাইতাম সে
"কুহু কুহু"র রবে!

সকল ফুলে ঘোম্‌টা খুলে
শুনতো আমার গান,
গোলাপ বকুল আমের মুকুল
হেসেই আট খান।

দলে দলে ছেলের দলে
মিশে আমার সনে,
কুহুর রবে তা'রাও সবে
মাতিয়ে দিত বনে!

আমি তখন হতেম যেমন
তাদেরি এক ভাই,
হায় রে কপাল আমার সেকাল্‌
কোথায় গেল ছাই!

তা'রা কোথায়, আমি কোথায়,
আজ্‌ যে মুলুক ছাড়া,

বঙ্গ-কানন আর তো এখন
পায় না আমার সাড়া!
আর কি মোরে মনে করে'
আর কি তা'রা ডাকে,
সুখীর সখা অনেক মিলে,
দুখীর ক'জন থাকে?
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু
অধমতারণ হরি!
"কোকিল" ব'লে চরণতলে
স্থান দিয়েছ, মরি!
পশু পাখী সবাই থাকি
ঐ করুণার তরে,
যাবে কুদিন, পাব সুদিন
তোমার দয়া-বরে!
দুঃখ ক্লেশ হলে শেষ
বাঁচবে পোড়া প্রাণ,
বসন্ত দা' দিবেন দেখা
আবার গাব গান!

মর্য্যাদাবোধ।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! কিরূপে নীতি ও চরিত্র উন্নত করিয়া, মন্দ হইতে, পাপ হইতে ভালর দিকে যাইতে পার তাহার দুইটী সঙ্কেত ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছ। ১মতঃ—মন্দকে সর্প-বৎ বিষম শত্রুজ্ঞানে ভয় কর; ২য়তঃ—তাহার কুৎসিত কদর্য্যতা ও মলিনতা দৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে দূরে থাক। আশা করি যে, তোমরা নিজ নিজ জীবনে এই দুইটী উপায়ই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছ।

সুনীতিরক্ষার তৃতীয় সঙ্কেত—"আত্মমর্য্যাদা-বোধ" অর্থাৎ আপনাকে সম্মান করা, আদর করা। আপনার অন্তরে যে সদ্ভাবের অঙ্কুরগুলি আছে, যত্ন পূর্ব্বক তাহার পোষণ করা ও বর্দ্ধন করা। আত্মমর্য্যাদা অল্প বা অধিক পরিমাণে সকলেরই আছে। অনেক স্থলে উহা সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষার অভাবে বিকৃত ভাবে থাকে। এই বিকৃত অবস্থার নাম অহঙ্কার। অহঙ্কারী ব্যক্তি প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা জানে না। সে হয় ত আপনার ধনের গর্ব্বে অন্য লোককে ছোট মনে করে, নতুবা নিজ বিদ্যা বুদ্ধির গুমরে অপরকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করে। কেহ বা ভাগ্যক্রমে কোন উন্নত পদ ও ক্ষমতা লাভ করিয়া, ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে ও সকলের প্রতি রূঢ় ও কঠোর ব্যবহারে আপনার আধিপত্য দেখাইতেছে। এ সমুদয়ই বিকৃত আত্মাদরের উদাহরণ। অহঙ্কারী কেবল আপনার রূপ কিম্বা উচ্চ পদ কিম্বা লোক-দেখান পুণ্যকর্ম্মের গর্ব্বেই উন্মত্ত; আসল আত্মমর্য্যাদা অর্থাৎ—আত্মার মর্য্যাদা সে কি জানে! কিসে আমার আত্মা আরও সৎ, আরও সাধু আরও পবিত্র হইবে, কি উপায়ে আত্মার দয়া, সত্যনিষ্ঠা, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে, এ সব চিন্তা তাহার নাই। সে ব্যক্তি ভাবিতেছে, হাজার টাকা আছে কিসে দশ হাজার টাকা হইবে, ম্যাজিষ্ট্রেট আছি কিসে কমিসনর হইব, এখন একটা সহরের লোক আমাকে জানে কি উপায়ে দেশশুদ্ধ লোক আমাকে মানিবে এবং আমার যশ ও নাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

সাবধান! আত্মমর্য্যাদা ও অহঙ্কারের প্রভেদ যেন বিস্মৃত হইও না।

তোমাদের বাড়ীতে পূজার ঘর আছে। সে ঘরটী অন্য ঘর অপেক্ষা বেশী যত্নে পরিষ্কার রাখা হয়। মলিন বসনে বা অপবিত্র পায়ে কেহ সেখানে যায় না, কোন রূপে ঠাকুর ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করাই চাই। স্নান করিয়া, পবিত্র ধৌত বসন পরিধান করিয়া, শুদ্ধ মনে সে ঘরে গিয়া থাক। সে গৃহটী যেন বাড়ীর শ্রেষ্ঠ স্থান। প্রাণ গেলেও তথায় মলমূত্রত্যাগ বা অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম কর না। ইহাকেই মর্য্যাদা করা বলে।

আমাদের দেশে প্রাচীন বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সে কালের লোকদিগের মর্য্যাদা-বোধ অতিশয় প্রবল ছিল। এক একটী কথা রক্ষার জন্য তাঁহারা কি উৎকট কষ্ট সমস্ত অম্লান-বদনে সহ্য করিতেন! রামায়ণ ও মহাভারতে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া আমরা অবাক হইয়া থাকি। অধুনাতন পুরাবৃত্তেও রাজপুত-গণের জাতীয় মর্য্যাদাবোধ, এবং সত্যনিষ্ঠা ও বীর-ধর্ম্মের অনুরোধে অনির্ব্বচনীয় স্বার্থত্যাগ দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও চমৎকৃত হইয়াছেন; ভারতীয় রাজাদের আত্মমর্য্যাদার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

ইউরোপের ইতিহাসেও দেখিতে পাইবে, কত হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। কত লোককে বা শূলে দিয়া মারিয়াছে, কাহাকেও নদীর জলে জীয়ন্ত ডুবাইয়া মারিয়াছে, কাহারও গায়ের মাংস সাঁড়াশী দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিয়াছে। কাহাকেও খুঁটিতে বাঁধিয়া পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে মারিতে বিনাশ করিয়াছে। দুরাত্মারা মানুষ মারিবার যত রকম নিষ্ঠুর কৌশল বাহির করিতে পারে, তাহার কিছুই বাকি রাখে নাই। পড়িতে পড়িতে গায়ে কাঁটা দেয়, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়, মানুষ পাগল হইয়া যায়। কিন্তু ঐ মহাত্মারা আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল্য এত অধিক বুঝিয়াছিলেন যে, এই সমুদয় উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা হাসিতে হাসিতে সহিয়া প্রাণ দিয়াছেন। কিন্তু একটী মুখের কথা বলিলে নিস্তার পাইতেন, সেই মিথ্যা কথাটী কিছুতেই তাহাদিগকে বলাইতে পারে নাই।

"জর্জ কখনও মিথ্যা কথা কহে না"—এই গল্পটী বোধ হয় সকলেই পাঠ করিয়াছ। 'পিতার প্রিয় মূল্যবান ফুলগাছ কাটিয়া নষ্ট করিয়াছি, না জানি তিনি কতই বকিবেন, কি মারিবেন' এ ভয় সেই শিশুর মনেও হইল না। "না বাবা আমি করি নাই" এই কথাটী বলিলেই সব তিরস্কার ও প্রহার হইতে বাঁচিয়া যাইবে—এ চিন্তাটী একবারও মনে হইল না। বরং পিতার সম্মুখে শিশু জর্জ নির্ভয় চিত্তে বলিয়া উঠিল "কেন বাবা আমাকে তুমি সন্দেহ করিতেছ; জর্জ কখনও মিছা কথা কয় না। আমিই তোমার গাছ নষ্ট করিয়াছি।" জর্জের নিকট "মিথ্যাবাদী" অপেক্ষা গুরুতর গালি বা ভৎসনা আর কিছু হইতে পারে না, ইহা প্রহারের চেয়েও কঠিন শাস্তিজনক। একটা দোষ করিয়াছি আবার মিথ্যা বলিয়া তাহা লুকাইব, ইহা ত ছোট লোকের কাজ। বরং তাহার যা শাস্তি তা পাওয়াই ঠিক। তাই পিতার সন্দেহে বালকের অভিমান হইল। সে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—"আমি বুঝি মিছা কথা কহিব মনে করিয়াছ, কখনই না।"

তোমরা সকলেই জান এই দর্পিত শিশুটী কে। নিজ জন্মভূমি আমেরিকার উদ্ধারকারী জগদ্বিখ্যাত মহাবীর জর্জ ওয়াশিংটন। ইহাঁর নির্ভীক তেজস্বিতাতেই আমেরিকা আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বাধীন দেশ। ইহাঁর সুনীতি ও

সাধুতার দৃষ্টান্তে আজ আমেরিকান জাতির মুখ উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত। এ তেজ কিসের!— আত্মমর্য্যাদার।

বৌ-বাজারে রামগোপাল বাবু খুব ধনী লোক। তাঁহার মাসে আয় প্রায় হাজার টাকা। ইঁহার বাড়ীতে একটী দরিদ্র নিরাশ্রয় বালক প্রতিপালিত হয়। বাবু তাহার অন্ন বস্ত্র ও বিদ্যাশিক্ষার সমুদয় খরচ দেন, শান্ত সুশীল বলিয়া ১২ বৎসরের ছেলে বিনয়কে বড় ভাল বাসেন। বিনয়ও তাঁহাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।

একদিন রাত্রে রামবাবুর বাড়ীতে কয়েক জন বন্ধু আসিয়াছেন, খুব আহ্লাদ আমোদ হইতেছে, মদ্যপান চলিতেছে ও নানাবিধ বহুমূল্য ও উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। বাবুরা মদ্যপান ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত বস্তু আহার করিতেছেন। খুব আমোদের গল্প চলিতেছে। এমন সময়ে রামগোপাল বাবু বিনয়কে ডাকাইলেন। সে আসিলে বলিলেন "বাবা বিনয়, তুমি আমার সন্তানের তুল্য। উত্তম উত্তম খাবার হইয়াছে তুমি কিছু খাও, নহিলে আমার মন কেমন করে।" অমনি সকল বন্ধুগণও বার বার সেই মত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বিনয় বলিল, আমি ওসব জিনিষ খাই না, আমার অভ্যাস নাই, রুচিও হয় না। আপনারা আহার করুন। আমি পড়িতে ছিলাম, পড়ি গিয়ে।"

রামবাবুর তখন নেশা হইয়াছে। গরম হইয়া বলিলেন "কি? এঁরা সব ভদ্রলোক অনুরোধ করিতেছেন, আমি তোমায় এত ভাল বাসি, প্রতিপালন করিতেছি, তুমি এঁদের insult (অপমান) করিবে? আমারও কথা রাখিবে না? নিরাশ্রয় বালকের এত স্পর্দ্ধা! তোমাকে অবশ্যই খাইতে হইবে। না খাও তো আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাও।"

বিনয় নীরবে সমুদায় শ্রবণ করিল। নিরাশ্রয় বালক আপনার অবস্থা একবার ভাবিল, গণ্ডদেশে অশ্রুজল বহিয়া পড়িল। আর কেহই দেখিল না; অথবা দেখিবার ক্ষমতাও ছিল না। সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল, সে দিন আর লেখা পড়া কিছুই হইল না।

পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল।

ভাই পাঠক, এটী সত্য ঘটনা। বল দেখি, এ তেজ কিসের?—আত্মমর্য্যাদার। সেই বালকই আজ কাল আমাদের দেশের মধ্যে পরম সম্মানিত মহাপুরুষ।

যাহার এরূপ মর্য্যাদাবোধ আছে পাপ ও প্রলোভন সম্মুখে আসিলে সে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে সন্দেহ নাই। যাহার আত্মমর্য্যাদা বোধ নাই সে নীচ, সে ছোট লোক, সে পশু। যে নিজেই নিজের আদর করে না, সম্মান করে না, অপরে তাহাকে কেন মানিবে! সেত নিজের চক্ষেই নীচ, অপদার্থ, অসার ও ঘৃণিত। কথায় বলে আপনার মান আপনার ঠাঁই। নিজে যদি নিজেকে মান্য করি লজ্জা করি, তাহা হইলে নির্জ্জনেও কোন কুকার্য্য বা কুচিন্তা করিতে পারি না। কারণ তাহা হইলে আর শেষে নিজের কাছে নিজের মান থাকে না। নিজে নিজেই লজ্জা করে, বোধ হয় যেন সকলে জানিতে পারিয়াছে। বুক ঠুকিয়া আর বলিতে পারি না যে আমি এমন ছোট লোক নই যে এ কায করিব। অতএব বালক বালিকাগণ, আদর মর্য্যাদা করিতে চেষ্টা কর।

বয়সে ও আকারে ছোট বলিয়া তোমরা ছোট লোক নও। এখন যাঁহারা দেশের বড়লোক তাঁহারাও প্রথমে তোমাদেরই মত বালক ছিলেন। তোমরাই দেশের বড়লোক হইয়া দেশের গণ্য মান্য

ও প্রধান লোক হইবে। এইবেলা হইতে মর্য্যাদাবোধ অভ্যাস কর। এগুণ না থাকিলে কেহ কখনও মহৎ হইতে পারে না। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে তোমরা পরে বড়লোক হইবে। কার্য্য করিবার বা কথা কহিবার সময় বিবেচনা করিবে যে এ কায কি এ কথা কিরূপ লোকের যোগ্য। যদি ছোট লোক কি নীচ লোকের যোগ্য হয়, ত কদাচ করিবে না। লোকে বলে "মনের অগোচর পাপ নাই"। আপনার চক্ষে, নিজে মনে মনে আপনাকে সত্য সত্যই ভাল বলিয়া বিশ্বাস হওয়া চাই। যাহাতে ঐ বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয় ও ক্রমে আরও সৎ হইতে পার সে জন্য যত্ন করিতে হইবে। সাধু মহাজন ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত খুব মন দিয়া পাঠ করিবে, ও আপন জীবনে যত দূর সম্ভব তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে।

ঈশ্বর সর্ব্বগুণাকর। সব সদ্গুণ তাঁহারই রূপা। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু সৎ ও ভাল, সে সবই তাঁহার। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বর রহিয়াছেন। এখন দেখ দেখি তোমরা কত বড়। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, আর তিনি স্বয়ং তোমাদের মধ্যে। এ কথা মনে হইলেও মনে গৌরব হয়। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। তোমাদের ঠাকুর-ঘরের যেমন নিষ্ঠা ও যত্ন কর, নিজে তুমিই যে সেই রূপ এক ঠাকুর ঘর। কোন রূপ মন্দ ভাব বা মলিনতা এই ঠাকুর ঘরের নিকটেও আসিতে দিবে না।

ইহাই নীতির তৃতীয় সঙ্কেত।



হিমালয় ভ্রমণ।

(৪৩ পৃষ্ঠার পর।)



পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাড়াতাড়ী চা পানের পর মধ্যাহ্নের আহার সাঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার গন্তব্য পথে যাত্রা করিলাম। যদিও আমরা ৪ টার সময় উঠিয়াছিলাম, কিন্তু যাত্রা করিবার জিনিস পত্রাদি সংগ্রহ করিতে প্রায় ৬ টা বাজিয়া গেল। সুখিয়াপুকরী হইতে টংলু ১৮ মাইল রাস্তা; ক্রমেই পথ দুর্গম ও বন্ধুর হইয়া আসিতেছিল। খুব তাড়াতাড়ী না চলিলে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে সম্মুখের ডাক বাঙ্গালায় পৌঁছা অসম্ভব, কাজেই দ্রুত গতিতে পথ চলিতে লাগিলাম। রাত্রিতে এ পথে চলা ভয়ানক ব্যাপার। শীতে হাত পা যেন অবশ হইয়া যাইতেছিল। আমাদের মধ্যে অনেকেই শীতের তাড়নায় হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা হাঁটিতে তত পটু নহেন তাঁহাদিগকেও শীতের জ্বালায় দ্রুতবেগে হাঁটিতে হইল। আজ রাস্তার দুই ধারে কেবল ঘোর জঙ্গল ও বড় বড় গাছ। এ নিবিড় বনে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বে, দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলের কথা পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু কল্পনার সাহায্যেও ধারণা করিতে পারিতাম না; আজ কতকটা আভাষ পাইলাম। আজ এ ঘোর বনে পৌঁছিয়া মনে হইল যেন, দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিতেছি। ক্রমে ইংরাজ ও নেপাল রাজ্যের সন্ধিস্থলে পৌঁছিলাম। কতকগুলি ছোট ছোট স্তম্ভ দ্বারা নেপাল হইতে ইংরাজ রাজ্য বিভিন্ন করা হইয়াছে।

এই স্থানে এক পর্ব্বত শৃঙ্গে বসিয়া আমরা মধ্যাহ্নের আহার করিয়া লইলাম। স্তম্ভের সীমা অতিক্রম করিলেই নেপালরাজ্য। দুই এক পা চলিলে ইংরাজ সীমা অতিক্রম করিয়া নূতন রাজ্যে যাইতে পারিব মনে করিয়া যেন কেমন একটা ভাব হইল, সকলেই সম্মুখের পর্ব্বতে উঠিলাম। অনতিদুরবর্ত্তী নেপালের দৃশ্য পরিষ্কার রূপে দৃষ্টিগোচর হইল। নেপাল রাজ্যে গিয়াছি বলিয়া মনে একটু গর্ব্বও জন্মিল। এই খানে আমাদের এক কুলি বলিয়াছিল, "আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের এই সকল জিনিষ লইয়া পলাইতে পারি। তোমরা আমাকে তথাপি কিছু করিতে পারিবে না, কারণ এখন ত আর আমি ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে নহি, এখন আমি নেপালের মধ্যে"। এই কথা শুনিয়া আমাদের খুব ভয় হইয়াছিল কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সে তাহার এই সকল কথা কার্য্যে পরিণত করে নাই। সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া পাহাড়ের গা হইতে যে সব জল রাস্তায় পড়ে তাহা শুকাইতে না পারিয়া রাস্তা অত্যন্ত পিচ্ছল হইয়াছিল, তাহাতে আবার পথ অতিশয় দুরারোহ, এরূপ রাস্তায় ঘোড়ায় যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া সকলেই ঘোড়া হইতে নামিয়া সাবধানে চলিতে লাগিলাম। সহিসেরা ঘোড়াগুলির মুখ ধরিয়া অতি ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। কিছু দুর এই রূপ চলিবার পরে আমাদের সহিস ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া ঘাস খাওয়াইতে লাগিল, হঠাৎ কি জানি কি দেখিয়া ঘোড়া ভয়ঙ্কর দৌড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা রাস্তার পাশে কতকগুলি সুন্দর ফল সংগ্রহ করিতেছিলাম; পায়ের শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি আমাদের প্রিয় "টমি" বেগ সামলাইতে না পারিয়া তীরের মত নিম্ন ভূমির দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমরা ত তাড়াতাড়ী এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম। ঘোড়া ছুটিয়া আমাদের পাশ ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। সহিসও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। পথ যে রূপ ঢালু ও পিচ্ছল, তাহাতে যে ঘোড়া বেগ সামলাইতে পারিবে, তাহা বোধ হইল না। এ রূপ স্থলে বেগ সামলানও অসম্ভব; আর বেগ সাম্‌লাইতে না পারিলে নিশ্চই মৃত্যু। সুতরাং ঘোড়াকে যে জীবিতাবস্থায় দেখিব সে আশা রহিল না। আমাদের এত হাসি, গল্প হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল। ঘোড়ার সংবাদ জানিবার জন্য আমি আর সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলাম। পথে ঘোড়ার পদচিহ্ন লক্ষিত হইল, কিন্তু স্থানে স্থানে যখন আর কোন চিহ্নই দেখিতে পাই না, তখন ভাবি এই স্থান দিয়া হয় ত আমাদের প্রিয় "টমি" খাদে গড়াইয়া গিয়াছে, তাই কোন পদচিহ্ন নাই। এই প্রকার নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া পৌঁছিয়া দেখি, অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে আমাদের "টমি"ও সুখে ঘাস খাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই। ঘোড়াকে এই রূপে অক্ষত দেখিয়া যে আনন্দ হইল তাহা বর্ণনার অতীত। ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত কতই ধন্যবাদ দিলাম। ক্রমে ক্রমে সকলেই পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে একটু বিশ্রামের পর পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এই বার কেবল উপরে উঠিতে হইবে। প্রচণ্ড রৌদ্রে এত উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইবে ভাবিয়া একটু মাথা ঘুরিয়া গেল। পুনরায় ঘোড়ায় চড়িলাম। কিছু দুর যাইয়া রুষ দেশীয় দুই জন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের এক জনের নাম "ব্যারণ ডিনল্‌ডি" আর এক জনের নাম মনে নাই, কিন্তু তিনিও এক জন কাউণ্ট।

তাঁহারা দুই বন্ধু ফেলুট দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে-ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের দুই চারিটি কথাও হইল। আমরা ফেলুট যাইতেছি শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এই দুইটি সম্ভ্রান্ত লোক নাকি সিকিম, তিব্বত ইত্যাদি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে রুষিয়ার চর সন্দেহ করিয়া যাইতে দেন নাই। সম্মুখের পথ তুষারপাতে ধবল বেশ ধারণ করিয়াছে, তাঁহাদের নিকট এ সংবাদ পাইয়া মন অসীম উৎসাহে পূর্ণ হইল। ভাবিতে লাগিলাম কতক্ষণে তথায় পৌঁছছিব।

সূর্য্য অস্তাচলে ডুবিবার একটু পূর্ব্বে সেই আকাশভেদী টংলু শৃঙ্গে পৌছিলাম। বাঙ্গালায় পৌছিবামাত্র প্রাঙ্গণে স্তুপাকার বরফ রাশি দেখিয়া পথের সকল শ্রান্তি দূর হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যতটুকু পারি স্বভাবের সেই বিচিত্র শোভা দেখিব ভাবিয়া দূরবীক্ষণ হস্তে সম্মুখের উচ্চ শৃঙ্গে উঠিলাম। এখান হইতে দর্জ্জিলিং সহর অতি চমৎকার দেখাইতেছিল। গৃহ গুলি ধবল বিন্দুর ন্যায় মনে হইতেছিল। আর "এভারেষ্ট" যেন হাতের কাছে, উন্নত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শীতের তাড়নায় অধিকক্ষণ বাহিরে থাকা ঘটিল না। বাধ্য হইয়া ভিতরে আসিয়া চিম্‌নির নিকট আশ্রয় লইলাম। জল জমে কি না দেখিবার জন্য এক গ্লাস সরবত রাত্রে বাহিরে রাখিয়া দিয়াছিলাম; পর দিন সকালে উঠিয়া দেখি, তাহা জমিয়া পাথরের মত কঠিন হইয়া রহিয়াছে। রাত্রিতে এত শীত পড়িয়াছিল যে, তাপ ২৯ ডিগ্রীর উপরে উঠে নাই।*

ক্রমশঃ—

* গত মার্চ্চ মাসের সখাতে ৪২ পৃষ্ঠায় "ফেলুট দার্জ্জিলিং হইতে ৪৮ মাইল ও ৫০০ ফিট উচ্চ" মুদ্রিত হইয়াছে।" ৫০০ শত ফিট স্থানে ৫০০ হাজার ফিট হইবে।

ব্যাডমিনটন খেলা।

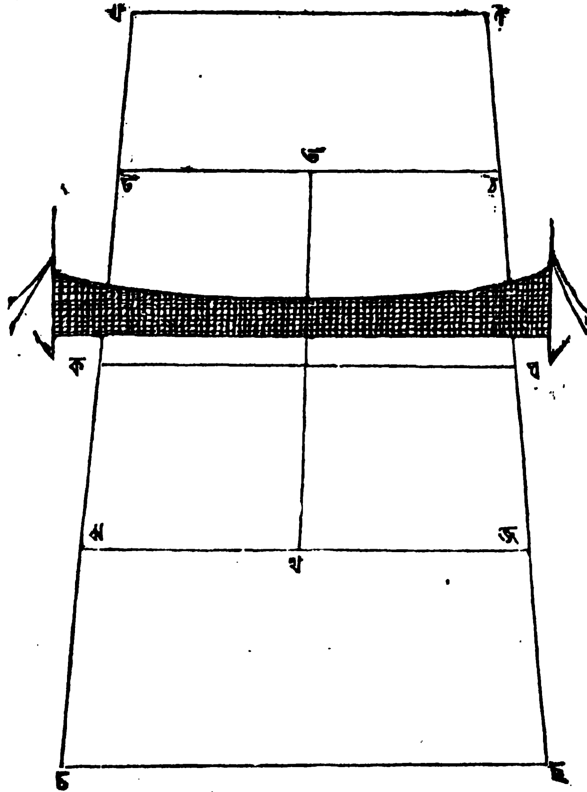
শরীরের পক্ষে আহার যেমন প্রয়োজন ব্যায়ামও তদ্রূপ। আহারের অভাবে শরীর শীঘ্রই দুর্ব্বল হয়, ব্যায়ামের অভাবে আমরা অল্পায়ু হই। যে সকল খেলায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা হয় তাহাও ব্যায়াম বিশেষ। খেলায় শরীর চালনা ও আমোদ দুই হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে অনেক প্রকার খেলা প্রচলিত ছিল, ধীরে ধীরে সে গুলি লোপ পাইতেছে। কিন্তু সে গুলির স্থান একটী মাত্র বিদেশী খেলা অধিকার করিয়াছে। কেন যে আমাদের দেশী পূর্ব্বের খেলা গুলি অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতেছে, বুঝিতে পারি না।—সে, বিদেশী খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেট খেলা অর্থ, সময়, স্থান এবং লোকবল-সাপেক্ষ, কেহ মনে করিও না আমরা ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি না।

অল্প স্থানে অল্প লোকে কখন ২ জন মাত্র লোক হইলেও হয় এ রূপ অত্যন্ত আমোদপ্রদ একটী খেলার কথা আজ তোমাদিগকে বলিব।



খেলাটী বিদেশী; ক্রিকেটের মত আজও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। আমাদের সুবিধার জন্য অনেক ছুঁটিয়া ছুঁটিয়া, আমাদের উপযোগী করিয়া ইহাকে

দাঁড় করিতে চেষ্টা করিব। এই খেলায় একটী ফুল (Shuttlecock) যত জন লোক খেলিবে, তত খানা ব্যাট (Battledores), (পূর্ব্বের পৃষ্ঠায় ছবি দেখ) এক খানা জাল ও ২টী খুঁটির (post) দরকার। মধ্যস্থলে কোট আঁকিয়া বেশ খেলা করা যাইতে পারে। ইহার ইংরেজী নাম Badminton। নিম্নের চিত্রটী দেখিয়া ২৪ হাত লম্বা ও ১৬ হাত পাশে একটী খগছচ কোট আঁক। অল্প লোক হইলে



এই খেলায় জোড় সংখ্যার প্রয়োজন, যেমন ২ জন, ৪ জন, ৬ জন, অথবা ৮ জন।

বেশী বাতাসে এই খেলার সুবিধা হয় না। বাড়ীর প্রাঙ্গণে অথবা বৃষ্টির সময় বড় ঘরের

ইচ্ছা মত কোটটী ছোটও করা যাইতে পারে। মধ্য স্থলে কঘ রেখার দ্বারা খগছচ কোটটীকে সমান দুই ভাগ কর। এক্ষণে কখগঘ ও কচছঘ সমান ২টী কোট হইল। আবার কখগঘ কোটটীকে

টঠ রেখা দ্বারা এবং কচছঘ কোটটীকে ঋজ রেখা দ্বারা সমান দুই ভাগ কর। এক্ষণে সমস্ত কোটটী ৪টী সমান ভাগে বিভক্ত হইল। কঘ রেখার দুই পাশে খুঁটি পুতিয়া জাল টানাও। টঠ রেখার মধ্য বিন্দু ত হইতে ঋজ রেখার মধ্য বিন্দু থ পর্য্যন্ত আর একটী রেখা অঙ্কিত কর। এক্ষণে আমাদের কোট আঁকা সম্পূর্ণ হইল। টঠ ও জঝ রেখা দ্বয়কে (Service line) সার্ব্বিস্ লাইন এবং ট ও জ কোটকে (Service court) সার্ব্বিস্ কোট বলে।

কি প্রকারে খেলিতে হয় আমরা এক্ষণে তোমাদিগকে বলিব।

জালের দুই পাশে সমান দুই ভাগে ব্যাট হাতে দাঁড়াইতে হয়।

সার্ব্বিস কোট হইতে খেলা আরম্ভ করা নিয়ম। বাম হাতে ফুল ধরিয়া ডান হাতের ব্যাট দিয়া ঘা দিয়া জাল পার করিতে হয়। সর্ব্বদাই প্রথমে সার্ব্বিস কোট হইতে খেলিতে হয়। মনে কর দাক্ষণের দিকের লোকেরা প্রথম খেলা পাইল। তাহাদের মধ্যে এক জন জ কোণ হইতে খেলিয়া ট কোটের মধ্যে ফুলটী দিবে। এই ফুল দেওয়ার সময়, ইহা জালে অথবা ট কোটের বাহিরে গেলে যে খেলিয়াছিল সে পঁচা (out) হইল। অথবা ট কোটের মধ্যে যে খেড়ু দাঁড়াইয়াছিল, সে ফুলটীকে ফিরাইবার সময় জালে ফুল বাধিলে অথবা কচছঘ সমস্ত কোটের বাহিরে গেলে, যাহারা প্রথম খেলিতেছিল তাহাদের ১ হইল। ফুলটীকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের খেড়ুরা ঘা দিয়া উপরে রাখিতে পারে, কোন পক্ষেরই কোন ত্রুটী না হয়, ততক্ষণ কোন পক্ষেরই কিছু হইবে না। ১ম খেড়ুর ১ হইলে সে ঝ কোট হইতে খেলিবে এবং যতক্ষণ না সে পঁচে ততক্ষণ কোট পরিবর্ত্তন করিয়া খেলিতে পারিবে। সে পঁচিলে, যে কোট হইতে সে পঁচিবে, সেই কোট হইতে তাহার অন্য সঙ্গী খেলিবে, এবং তাহার বিপরীত কোট হইতে প্রথম ফুলটী ফিরাইতে হইবে। তাহার পর সমস্ত কোটের মধ্যস্থিত যে কোন স্থান হইতে ফুল ফিরাইতে পারা যায়। যে এক বার পঁচিল সে তাহার অন্য সঙ্গীর সহিত ফুল ফিরাইতে পারিবে কিন্তু পুনরায় খেলিতে পারিবে না। এই পক্ষের সকলের খেলা শেষ হইলে বিপক্ষেরা ফুল পাইবে, এবং তখন তাহারা পূর্ব্বের মত খেলিতে আরম্ভ করিবে। এবং পূর্ব্বের নিয়মানুসারে ১, ২ হইবে। এই প্রকারে যাহাদের আগে ২০ হইবে তাহারাই খেলায় সেবার জিতিল। এক পক্ষ জিতিলে কোট পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। বাতাসের দরুণ কোন পক্ষের সুবিধা অথবা কোন পক্ষের অসুবিধা হইয়া থাকে। তাই কোট পরিবর্ত্তন করিলে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

এই ব্যাট, জাল ও ফুল খুব অল্প মূল্যে কলিকাতায় পাওয়া যায়। ফুলগুলি শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হয়। হাঁসের পালক কর্কের মধ্যে পুতিয়া ঘরে ফুল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।



বিলাতের গল্প।

লণ্ডন।



আমাদের দেশের যেমন কলিকাতা, বিলাতের সেই রকম রাজধানী লণ্ডন। লণ্ডনের মত প্রকাণ্ড নগর পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। উহা কলিকাতার চারগুণ বড়, আর সেখানকার লোক সংখ্যা কলিকাতার আট গুণ। আমাদের দেশে অনেক পাড়াগেঁয়ে লোক প্রথম প্রথম সহরে এসে—"ও বাবা! রাস্তায় এত ভিড়"—বলিয়া চমকিয়া যান; কিন্তু তাঁহারা এক বার বিলাতের রাজধানীতে গেলে এক পা চলিতেও থম্‌কাবেন—সেখানে এমনি লোকের ঠেলাঠেলি!

আবার লণ্ডন এত বড় ও লোকপূর্ণ হলেও এখনও উহার শেষ নাই। আমাদের যেমন ভবানীপুর, শ্যামবাজার প্রভৃতি সবার্বের যোগে কালকাতা ক্রমে বাড়িতেছে, লণ্ডনও ঐরকম চারি দিকের ছোট ছোট পল্লীতে মিশিয়া দিন দিন আরও প্রকাণ্ড হইয়া পড়িতেছে। পাচ বৎসর পূর্ব্বে উহার চারি পাশে যে সকল মাঠ ছিল, এখন সেখানে ঘাসের পরিবর্ত্তে অসংখ্য বাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখে বিশ্বাস হয় না, যে কয়েক বৎসর আগে সে স্থান একেবারে পাড়া গাঁ ছিল।

বাহির হইতে দেখিতে বিলাতের রাজধানীটী বড় সুন্দর নয়। উহাতে আমাদের সহরের মত ধপ্‌ধপে চুণকাম করা বড় বড় বাড়ী নাই, আর তাহাতে সবুজ খড়খড়ের বাহারও নাই। যেখানে যাও দেখিবে রাস্তার দুই পার্শ্বে কেবল এক রকম ধোঁয়াটে রঙের কাল কাল বাড়ী, সার বেঁধে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেশের মত বাড়ী গুলির মধ্যে খোলা জায়গা বা কিছুমাত্র ফাঁক নাই। আবার সব রাস্তার দুই পার্শ্বে যেমন সার গাঁথা বাড়ী, অনেক রাস্তার দুই পার্শ্বে তেমনি কেবল দোকান—এমন বাড়ী ও দোকানের মালা এ দেশে নাই। বোধ হয়, কলিকাতায় সবশুদ্ধ যত বাড়ী আছে, লণ্ডনে শুধু দোকানের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। রাত্রিতে দোকানের শোভা দেখিতে বড় চমৎকার হয়; সে দেশে অতি সুন্দর ও পরিপাটী রূপে দোকান সাজায়, আর গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক আলোতে ভিতরের সব জিনিস ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে।

লণ্ডন অতি প্রকাণ্ড সহর বলিয়া ডাকিবার সুবিধার জন্য উহাকে উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, মধ্য প্রভৃতি আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐ নগরে তোমাদের কোন বন্ধুকে চিঠি লিখ্‌তে হলে বাড়ীর নম্বর ও রাস্তার নাম ছাড়া কোন্ ভাগে সে রাস্তা আছে, তাহাও লিখে দিতে হয়। লণ্ডনের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অধিকাংশ বড় মানুষেরা থাকে—ঐ ভাগের রাস্তা গুলি অন্যান্য ভাগের চেয়ে ভাল বাঁধান ও অতি পরিষ্কার, আর দোকান সকলও অধিক দামী জিনিসে সাজান। মহারাণী ও যুবরাজের প্রাসাদ এই ভাগে আছে।

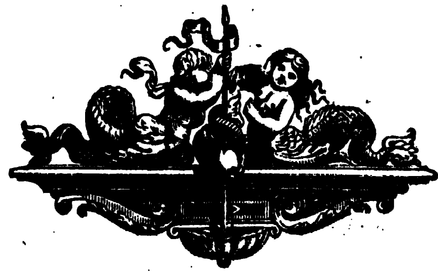
পূর্ব্ব-মধ্য ও পশ্চিম-মধ্য ভাগে যত কাজের স্থান; পশ্চিম-মধ্য ভাগে অনেক স্কুল, কলেজ, থিয়েটার ও বড় বড় আপিস আছে, আর দোকানেরও ত ছড়াছড়ি। পূর্ব্ব-মধ্য ভাগকে 'সিটি' বলে। ঐ স্থানটী দেখিলে কলিকাতার বড়বাজারের কথা মনে পড়ে। অবশ্য, আমাদের বড়বাজারের মত উহা অত অপরিষ্কার নয়। যত ব্যাঙ্ক, বড়

বড় কারখানা ও আড়তে 'সিটী' পূর্ণ; প্রতি বাড়ীতেই অনেক দোকান বা আফিস আছে; আর এক একটী বাড়ী সাত আট তালা উঁচু—কাজেই বুঝিতেছ জায়গার কি টানাটানি। ঐ ভাগে অনেক ছোট ছোট গলি ও সরু রাস্তা আছে। আর দু পাশের বাড়ী গুলি প্রকাণ্ড বটে কিন্তু এত কাল যে, মনে হয়, যেন কেউ উহাদের গায়ে পাঁক লেপে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। বিলাত শীতের দেশ বলিয়া প্রায় বার মাসই সব লোকের বাড়ীতে, ঘরে, দেয়ালের গায়ে কয়লার আগুন জ্বলে,—বিশেষ লণ্ডনে অনেক বড় বড় কারখানা আছে বলিয়া প্রত্যহ যত ধোঁয়ানল (চিম্‌নী) থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া বাহির হয়, শীতকালে সেই সব ধোঁয়া উপরে উঠিতে পারে না, বাড়ীর গায়ে ও গাছ পালায় লাগিয়া সব কাল করিয়া দেয়—এই কারণেই বাহির থেকে দেখিতে লণ্ডন এত কাল।

আমাদের দেশে দুর্গা পূজার ভাসানের দিন রাস্তায় যেমন লোকের ও গাড়ীর ভিড় হয়, সে বড় বড় রাস্তায় রোজই সেই রকম ভিড় হয়ে থাকে। রাস্তায় এত লোক ও গাড়ী ঘোড়ার ঠেলা ঠেলি যে খুব সাবধানে চলিতে হয়, ও অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকিতে হয়।

কলিকাতার ইড্‌ন গার্ডেনের মত লণ্ডনে অনেক গুলি সুন্দর বেড়াইবার স্থান আছে; উহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়টীর নাম রিজেন্টস্ পার্ক; উহা লণ্ডনের উত্তর পশ্চিম ভাগে স্থিত ও বেড়ে প্রায় দেড় ক্রোশ। শীতকালে ঐ খানে বেড়াতে তত আমোদ নাই; সব গাছ পাতা-শূন্য, কোন রকমের ফল ফুল নাই। জমিতে কেবল শুক্‌না ঘাস—দূর থেকে দেখিলে বের গা শিউরে উঠে। কিন্তু একবার যদি তোমরা ভিতরে যাও তাহা হলে আর বাহিরে আসিতে চাহিবে না। মাঠের উপর কত ছেলেমেয়ে দড়ি ডিঙ্গিয়ে লাফাচ্ছে ও ব্যাট বল খেলা কর্‌ছে। ঝিলের জলে রাজহাঁস, পাতি হাঁস, পেরু প্রভৃতি নানা রকম জলচর জন্তু সাঁত্‌রে বেড়াচ্ছে, আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মা বাপ বা ঝিয়ের সঙ্গে এক এক ব্যাগ পুরিয়া রুটি এনে ঐ হাঁস প্রভৃতিকে খেতে দিচ্ছে।

পার্কের ভিতর কোন স্থানে বা জল একটু জমিয়া গিয়াছে আর বড় বড় ছেলেরা তার উপর হড় হড় করে পা হড়কিয়া 'স্লাইড' কর্‌ছে, ঐ রকম খেলিতে খেলিতে কেউ বা পা পিছলিয়া পড়িয়া গেল, আর তার চারিদিকের লোক হো হো করে হেসে উঠল। তার কিন্তু হাসা বা লাগার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আবার উঠিয়া স্লাইড করিতে লাগিল। এই সবে নবেম্বর মাস এখনও পার্কের বড় বড় ঝিল জমিয়া যায় নাই, নহিলে পোষ মাঘ মাসে বরফের উপর ছেলেদের স্কেটিংএয়ের ধুম দেখে কে? এই সব নানা রকম ক্রীড়া ও আমোদ দেখে মন এমন ভুলিয়া যায় যে, শীতে হাত পা কাঁপিলেও ঐ বাগান ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করে না।



ফ্লোরা ম্যাগ্‌ডোনাল্ড।



১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে যুবরাজ চার্লস স্কটলণ্ডে পুনঃ আগমন করেন। এডিনবরা অধিকার এবং তৎপরে নানা স্থানে বিপক্ষ সৈন্যদিগের প্রতি অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অধিকাংশকে বিনাশ করিয়া, অবশেষে কলোডেনের যুদ্ধে তিনি পরাভূত হইয়া ফ্রান্সের উদ্দেশে পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন। এ দিকে স্কটলণ্ডের শাসনকর্ত্তাগণ দেশের সমূহ বিপদ দেখিয়া এই কথা চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি যুবরাজ চার্লসকে হত্যা করিতে পারিবে তাহাকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড (৪৫০০০০ টাকা) পুরস্কার প্রদান করা যাইবে। টাকার লোভে চার্লসের উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। তৎকালে স্কটলণ্ডবাসীদের অবস্থানুসারে সাড়ে চার লক্ষ টাকা কম নয়। ইহার দ্বারা বড় রকমের বিষয়াদি করা যাইত। সুতরাং চার্লসের হত্যার জন্য লোকের অভাব হইল না। চার্লস নিজের সমূহ বিপদ জানিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। সামান্য ইতর লোকের পরিচ্ছদে পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যুবরাজ ক্লানরান্যাল্ড নামক জনৈক লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্যক্তি এবং ইহার স্ত্রী উভয়েই যুবরাজকে অতি সংগোপনে রাখিলেন। কিন্তু চার্লস যে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, এই কথা সত্বরই প্রকাশ হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে শত্রু সমূহ চার্লসকে ঘেরিয়া ফেলিল। ক্লানরানল্ড সস্ত্রীক অনেক চেষ্টা করিয়াও চার্লসকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। চার্লস যেদিকে অগ্রসর হন, সেই দিকেই শত্রুর কোলাহল শুনিতে পান। ক্রমাগত বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন, কখনও বা পর্ব্বত গহ্বরে লুক্কাইত থাকিতেন। কোন সময়ে একা, এবং কখনও বা একটী মাত্র সঙ্গী লইয়া চার্লস বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু স্বীয় প্রাণ বাঁচাইবার কোনই উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। চার্লস আজ যে রূপ বিপদে পড়িয়াছেন, বল দেখি এই রূপ বিপদের সময়ে কয় জন লোক সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়? এ রূপ বিপদের মধ্যে কয়টা প্রাণ ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হয়?

ফ্লোরা চার্লসের এই ঘোরতর বিপদের সময় তাহাকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যে কাজে পুরুষেরা অগ্রসর হইতে ভীত হইতেছিলেন, সেই কাজ সম্পন্ন করিতে এক জন সামান্য যুবতী রমণী অগ্রসর হইলেন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহার দায়িত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। হয় ত এই কার্য্যেই তাঁহার ও যুবরাজ চার্লসের জীবন শেষ হইতে পারে, জানিতেন। তথাপিও এই বিপদের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইলেন। যুবরাজকে রক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, কে যেন তাঁহাকে

ডাকিয়াছিল, সেই ডাক শুনিয়া তিনি আর অন্য কোনই আপদ বিপদের কথা ভাবিতে পারিলেন না।

১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলাণ্ডের দক্ষিণ উইষ্ট দ্বীপে ফ্লোরা ম্যাকডোনাল্ড জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মিলটন অব ম্যাকডোলাণ্ড। ইনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। ফ্লোরার জন্মের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ফ্লোরা ম্যাক্‌ডোলাণ্ড অব আরমাডেলের তত্বাবধানে স্কাই দ্বীপে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। ইনি সাধারণ রকম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ বার্ষয়া যুবতী রমণী ফ্লোরা যুবরাজের বিপদের কথা শুনিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, শীঘ্রই তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, যুবরাজের সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ফ্লোরা যুবরাজ চার্লসের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, যে যুবরাজ কিছুদিন পূর্ব্বে মহা পরাক্রমশালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন, যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বীরের ন্যায় শত্রু সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তিনি আজ আহারের জন্য নিজ হস্তে রুটি প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ দশা দেখিয়া উপস্থিত লোক জনের মধ্যে অনেকেই চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

পরদিন প্রাতে ফ্লোরা চার্লসকে লইয়া রওনা হইবেন। উদ্দেশ্য—নিরাপদে তাঁহাকে ফ্রান্সে পৌছান। চারিদিকে চার্লসের বিরুদ্ধে যেরূপ লোক ঘুরিতেছে তাহাতে তাঁহার পালাইবার সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু ফ্লোরা বিপদের দিকে দৃক্‌পাৎ না করিয়া, নিজের জীবনের পানে একটী বারও না তাকাইয়া, চার্লসের জীবনের ভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চার্লস স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। যুবরাজ সঙ্গে একটী বাহক লইতে চাহিলেন কিন্তু ফ্লোরা তাহাতে বাধা দিলেন।

নিকটে নৌকা প্রস্তুত ছিল। তাঁহারা সেই নৌকায় পলায়ন করিবেন এই ইচ্ছায় কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে ঘোর শত্রুগণ ভ্রমণ করিতেছে। সুতরাং রাত্রের অপেক্ষায় তাঁহারা লুক্কাইত থাকিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা রাত্রে নৌকাযোগে রওনা হইলেন; মনে করিলেন যে কেহই তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে পারিবে না—কিন্তু তাঁহারা পথিমধ্যে শত্রু হস্তে পতিত হইলেন। ফ্লোরাকে শত্রুরা তাহাদের অধিনায়কের নিকট লইয়া গেল। ফ্লোরা যাইয়া দেখেন তাঁহার পালন কর্ত্তা ম্যাকডোলাণ্ড অব আরমাডেল সেই সৈন্যদিগের অধিনায়ক। তাঁহার সহিত ফ্লোরার কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল আমরা জানি না, কিন্তু তিনি তাঁহার নিকট হইতে অন্য আর একটী দ্বীপে যাইবার জন্য এক খানা পাস লইলেন। সেই পাশ লইয়া ৩ জনের যাইবার অধিকার ছিল।

তিনি, যুবরাজ এবং আর একটী ভৃত্য, পুনরায় নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন এবং পথি মধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া যুবরাজ চার্লসকে লইয়া ওয়াটারনিসের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে উপনীত হইলেন।

এই গ্রাম সার য়্যালেকজাণ্ডার মেক্‌ডোলাণ্ডের বাসস্থানের অতি নিকটেই ছিল। স্যার য়্যালেকজাণ্ডার এই সময় নিজ বাসস্থানে অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা দয়াবতী পত্নী লেডী ম্যাক্‌ডোলাণ্ড তৎকালে মাছগেটনগরে অবস্থান করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ।)



ডিসেম্বর, ১৮৯২।



বিবিধ।

রমণী গ্রাজুয়েট।—জনৈক ইংরাজ রমণী গত এম, এ, পরীক্ষায় লাটিনে প্রথম হইয়াছেন।

*
* *

রমণী চিকিৎসক।—শুনা যাইতেছে বঙ্গদেশীয় গভর্ণমেণ্ট কতিপয় রমণী চিকিৎসককে সাধারণ চিকিৎসালয়ের ভারার্পণ করিবেন।

*
* *

মঙ্গল গ্রহে আরও নূতন আবিষ্কার।—অধ্যাপক পিকারিং এই গ্রহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চল্লিশটী হ্রদ আবিষ্কার করিয়াছেন। নিয়াপেরিলি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, এই মঙ্গল গ্রহে খালও আছে।

*
* *

জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি।—এবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন এলাহাবাদে হইবে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির কাজ করেন।

*
* *

ক্রিকেট খেলা।—ক্রিকেট খেলার কথা তোমরা সখায় অনেক পড়িয়াছ। অনেকের বিশ্বাস, খেলা ছেলেমানুষদের জন্য, কিন্তু তা নয়, অঙ্গচালনার জন্য ক্রীড়া কৌতুকের প্রয়োজন। সংপ্রতি ইংলণ্ড হইতে লর্ড হকের অধীনে এক দল লোক ক্রিকেট খেলিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহারা ইতি-মধ্যে কোন কোন স্থানে জয়ী এবং কোন কোন স্থানে পরাজিত হইয়াছেন। ইহাঁরা কলিকাতায় ৪ঠা, ৬ই এবং ৭ই জানুয়ারী খেলিবেন।

*
* *

বার দিনে বিলাত গমন।—দিন দিনই বিলাত যেন আমাদের বাড়ীর কাছে সরিয়া আসিতেছে। এক দিন ছিল, যখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া বিলাত যাইতে ছয় মাস লাগিত। ক্রমে নূতন পথ ও দ্রুতগামী সমুদ্র-যান প্রস্তুত হওয়ায় বিলাত গমনের সময় ৪ সপ্তাহে পরিণত হইল। সংপ্রতি "হিমালয়" নামক এক খানি পোত ১৩ দিনে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ডে পৌছিয়াছে। সুয়েজ খালে বিলম্ব না হইলে এই জাহাজ আরও এক দিন পূর্ব্বে বিলাত পৌছিত। যে রেলপথের জল্পনা হইতেছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, ৪।৫ দিনে ইংলণ্ডে গমন করা যাইবে।

*
* *

বো-বৃক্ষ।



তোমরা কি কখন ৫০০।৬০০ বৎসর জীবিত থাকে এমন কোন বৃক্ষের কথা শুনিয়াছ? সিংহল দ্বীপে অনুরাজপুর সহরে একটী বো-বৃক্ষ আছে, তাহার বয়স প্রায় ২১০০ বৎসর হইয়াছে। মগধরাজ অশোক খ্রিষ্ট জন্মের ২৪৫ বৎসর পূর্ব্বে উরুওয়ালা হইতে এই বৃক্ষটীকে অনুরাজপুরে পাঠান। বৃক্ষের কথা কহিবার শক্তি থাকিলে, এই বৃক্ষ মানবের কত শত অজ্ঞাত ইতিহাসের কথা বলিত।

অশথ, বট প্রভৃতি বৃক্ষকে অনেকে ভক্তি করিয়া থাকেন। কখন কখন পূজা করিতেও দেখা যায়। বৌদ্ধেরা বো-বৃক্ষকে অত্যন্ত ভক্তি করেন, এবং প্রত্যেক বৌদ্ধ-মন্দিরের নিকট এই শ্রেণীর বৃক্ষ রোপিত আছে।

গৌতম যে বৃক্ষতলে বসিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই বৃক্ষটী সেই পবিত্র বৃক্ষের ডাল। ইহা অপেক্ষা অধিক দিনের কোন বৃক্ষ আমাদের এই পৃথিবীতে জীবিত আছে, এরূপ বোধ হয়, কেহই জানেন না।

সূয্যি-মামা।

সূয্যি মামা, সূয্যি মামা, রোদ কর-না।
ভাগ্নে তোমার শীতে মরে কোলে কর-না॥
কোন্ সকালে ঘুম ভেঙেছে ঠিকানা তার নাই।
থাক্‌তে শুয়ে আর পারি নে উঠে এলেম তাই॥
এ'টে সেঁটে পর্‌নু কাপড় শীতের ভয়ে মামা।
গায়ে দিলুম গায়ের কাপড়, তার ভিতরে জামা॥
পায়ে দিছি মোজা জুতো, মাথায় দিছি টুপি।
জান্‌তে দিলুম না কো মাকে, এলুম চুপি চুপি॥
আকাশ চেয়ে কখন্ থেকে ব'সে আছি এসে।
রোদ্ কর গো সূয্যি মামা মিষ্টি হাসি হেসে॥
আর ক'রো নে দেরি, মামা, আর ক'রো নে দেরি।
কাক পক্ষী ডেকে গেছে আবাহনের ভেরী॥
উত্তর থেকে বইছে বাতাস শীত মাখান তায়।
ঠোঁট কাঁপ্‌চে, বুক কাঁপ্‌চে, দিচ্চে কাঁটা গায়॥
গায়ে গরম হাত দে মামা চেপে ধর-না।
সূয্যি মামা, সূয্যি মামা, রোদ কর-না॥

সূয্যি মামা, সূয্যি মামা, রোদ কর-না।
ভাগ্নে তোমার শীতে মরে কোলে কর-না॥
শিশির জলে ভিজে গেছে বনে ফুলের কলি।
শীতে আকুল কাঁপ্‌চে বনের ছোট পাখিগুলি॥
গায়ে গায়ে শুয়ে আছে ছাগলছানা দুটি।
রোদ উঠ্‌লে চর্‌তে তবে যাবে গুটি গুটি॥
পুকুর-ধারে গাছের ডালে বকটি গুঁজে ঘাড়।
ধরেছে আজ জড়া'য়ে তার সর্ব্বাঙ্গে জাড়॥
দুঃখী গরিব কত ছেলের গায়ের কাপড় নাই।
'সূয্যিমামা' ব'লে শুয়ে ডাক্‌চে কতই তাই॥
মামা—গো, মামা—গো, কেমন তোমার প্রাণ।
কাতর হ'য়ে রোদ মাগ্‌চি, দাও না কথায় কাণ॥
আকাশেতে তবে কি আজ রাত এখনো আছে।
কাকেরা সব ঘুমিয়ে আছে যে যার বাসায় গাছে॥
তা—হয় কি, তা—হয় কি, সে বা কেমন কথা।
আকাশেতে রাত থাক্‌লে ভোর হয় কি হেথা?
তোমার মা কি তবে তোমায় আজ রেখেছেন ধ'রে।
উঠ্‌তে তাতেই পাচ্চ না কো উঠি উঠি ক'রে॥—
সূয্যি মামার মা গো মা তুমি কেমন মেয়ে!
শীতে মরি আমরা তুমি দেখ্‌লে না কো চেয়ে॥
হিম পড়ে না, শীত লাগে না, তোমার ছেলের গায়।
আমার মায়ের মতন কেন আট্‌কে রাখ তাঁয়॥
কোন্ সকালে কাক ডেকেছে, ঘুম ভেঙেছে কবে।
বিছানাতে শুয়ে ছেলে এখনো কি রবে?
সূয্যি মামায় দাও না ছেড়ে, সূয্যি মামার মা।
তোমার ছেলে থাক্‌লে শুয়ে রাত পোহাবে না॥
একটু আগে ঊষারাণী চ'লে যেতে যেতে।
তোমার ছেলের তরে গেলেন সোনার আসন পেতে॥
ঐ দেখ-না ঝক্‌ছে আসন নীল আকাশের গায়।
ঝলমলিয়ে তোমার ছেলে বসুন এসে তায়॥—
সূয্যি মামা, মামা গো, ওঠ গো একবার।
তোমার মা ত তোমায় কিছু বল্‌বেন না আর॥
লাল গামছা কাঁধে তোল, রাঙা জামা গায়।
সোনা মাণিক মুক্তো দেওয়া জুতো পর পায়॥
শিয়রেতে হীরের মুকুট মাথায় পর না।
সূয্যি মামা, সূয্যি মামা, রোদ কর-না॥



ফ্লোরা ম্যাক্‌ডোনাল্ড্।

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

চার্লস্ যখন দক্ষিণ উইষ্ট্ দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই লেডী ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাঁহার সহিত চিঠি পত্র লিখিতেন, এবং চার্লস্ যে শীঘ্রই স্কাই দ্বীপে আগমন করিবেন এ কথা তিনি জানিতেন। যখন স্ত্রীরূপধারী চার্লস্ ও ফ্লোরা এইখানে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহারা ম্যাক্‌ডোনাল্ডের স্কুবাসে আশ্রয় লইবার অভিপ্রায়

স্থির করিলেন। চার্লস্‌কে বনের কোন এক নিভৃত প্রান্তভাগে লুকাইয়া রাখিয়া ফ্লোরা, য়্যালেক্‌জাণ্ডারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এইখানে অন্যান্য কয়েকজন রাজতন্ত্রীদিগের ন্যায় একজন বিপক্ষদলের অধিনায়কও অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অদ্ভুতশক্তি প্রভাবে ফ্লোরা তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত গোপন করিলেন, এবং বিদ্রোহী দলের অধিনায়কের সঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। ইত্যবসরে ফ্লোরা লেডী ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও অন্যান্য রাজতন্ত্রীদিগের নিকট চার্লসের আগমনকাহিনী বর্ণনা করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই স্তম্ভিত হইলেন, সকলের মুখে একবার চিন্তার ছায়া পড়িল, তাঁহাদের জীবনের ধন রাজকুমারকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিল, তাঁহারা উপায় স্থির করিতে না পারিয়া পোলণ্ড নামক অন্য কোন রাজতন্ত্রীকে উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন।

চার্লস্‌কে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রভুভক্ত প্রজাগণ একটি উপায় অবধারণ করিল। উহাঁদের মধ্যে কিঙ্গ্‌স্‌বর্গের এক জন মানী ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ আলয়ে লইয়া যাইবেন এবং তথা হইতে ক্রমে ক্রমে স্কাই দ্বীপ অতিক্রম করিয়া তাঁহকে পোর্ট্রীতে লইয়া যাইবেন এইরূপ স্থির হইল। তথায় উপস্থিত হইবার সময় হইতে ডোনাল্ড্ তাঁহার রক্ষা করিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

পথে আসিবার সময় স্ত্রীরূপী চার্লস্‌কে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। একটী বালিকা চার্লসের চলনের ভাবভঙ্গী প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিল, "ফ্লোরা, ইনি হয় এক জন আয়র্ল্যাণ্ড নিবাসিনী কিম্বা এক জন ছদ্মবেশী পুরুষ; কারণ আমাদের দেশী স্ত্রীলোকেরা একবারে এতদূর পদবিক্ষেপ করিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া ফ্লোরার মুখে ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু আর কাহাকেও জানিতে না দিয়া তিনি বালিকাকে বুঝাইলেন যে, উনি একজন আয়র্লাণ্ডবাসিনী।

কিঙ্গ্‌স্‌বার্গে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা পোর্ট্রী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার কোন নিভৃত অংশে চার্লস্ তাহার স্ত্রী-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া স্কটল্যাণ্ড-দেশীয় কোন এক যুবা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। এইখান হইতে চার্লস্ রাছে দ্বীপে গমন করিলেন। এবার আর ফ্লোরা তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার কোন দরকার দেখিলেন না; সুতরাং তিনি তাঁহার মাতার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। চার্লস নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য ফ্লোরাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

এই খানেই ফ্লোরার কার্য্যের শেষ হইল, এই খানেই তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইল। কিছুদিন পরে চার্লসের ভ্রমণবৃত্তান্ত সব প্রকাশ হইল। ফ্লোরা ধৃত হইয়া জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে প্রেরিত হইয়া অবশেষে লণ্ডন নগরে আনীত হইলেন। ফ্লোরা নিজের সুখদুঃখের জন্য কোন দিন ভাবিতেন না। যখন তিনি ধৃত হইলেন, যখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত, তখনও তিনি জীবনের জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এক দিন যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, চার্লস ধরা পড়িয়াছেন (কিন্তু বাস্তবিক ধরা পড়েন নাই) তখন তিনি খুব কাঁদিয়াছিলেন। পরের জন্য যে অশ্রু প্রবাহিত হয়, তাহা পবিত্র। তাহা যে স্থানে পতিত হয়, সে স্থানকে পূত করে। পরের জন্য কয় জন কাঁদিতে পারে? যিনি কাঁদিতে পারেন, তিনি দেবতা। ইহার পর যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, চার্লস ধৃত হন নাই, তখন

তাঁহার মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ হইল, সে হাসি পবিত্র, সে হাসি স্বর্গীয়। ফ্লোরার বিচারের দিন আসিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহার বিচারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সকলেই উৎসুক। ফ্লোরার যশোরাশি দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল—এই যশঃ-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার বিচারের দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিচার হইয়া গেল। স্ত্রীলোক ও অনেক ভদ্র লোক তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া ফ্লোরা রক্ষা পাইলেন। তাঁহার জীবনরক্ষায় শত শত লোক আনন্দ প্রকাশ করিল। তিনি বাটী ফিরিয়া আসিলেন; ইহার পর কিন্স্বর্গের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। শান্তিতে জীবনের শেষ কয়েকটী দিন অতিবাহিত করিয়া ১৭৯০ খ্রিষ্টীয় অব্দের ৫ই মার্চ্চ তাঁহার আত্মা পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। পৃথিবী এই প্রকার দয়াবতী রমণীর আবির্ভাবে ধন্য হইল।

ঠাকুরদাদার গল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।



নবীন বাবু এত দিন কার্য্য উপলক্ষে পশ্চিম গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় পৌত্র ও দৌহিত্র-গণ বাড়ীতেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গল্প শুনিবার বিষয়ে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। অন্য অন্য বিষয়ে অন্য লোকের নিকট অনেক গল্প শুনিতে পাইতেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ না পাওয়াতে অমূল্য,মন্মথ, চন্দ্রনাথ, মাখন, দেবেন্দ্র, নগেন্দ্র, নলিন, পুলিন প্রভৃতি ছোট ছোট বালকগুলির মনে বড় কষ্ট হইত। তাঁহারা কেবল দিন গণিতেছিলেন, দাদা বাবু কবে বাড়ী আসিবেন। এখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে নবীন বাবু আসিতেছেন। অমনি সকলে উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া গাড়ী করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরদাদাকে গাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তাঁহাদের দেখাদেখি গ্রামস্থ আরও প্রায় ১০।১২টী বালক বালিকা তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে। অমূল্য বাবু সকলের নেতা হইয়া সকলকে সারবন্দী দাঁড় করাইয়া রাখিতেছেন। কি করিয়া দাদা বাবুকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তিনি আসিবামাত্র কে কে তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিবে, অন্য কাহার উপর কি ভার থাকিবে, তাহার সব ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিতেছেন। ছেলেগুলির উৎসাহ ও আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। কলরবে ষ্টেশনগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

এমন সময় গাড়ী নিকটের ষ্টেশন হইতে ছাড়িল, ঘণ্টা-ধ্বনি হইল, ইঙ্গিতের পাখা পড়িল,বালকসেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া আছে। এক মিনিট,দুই মিনিট,তিন মিনিট কাটিতেছে—বালকদের তাহা বড়ই বিলম্ব বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ধূঁয়া দেখা গেল, বাঁশীর শব্দ হইল, গাড়ী থামিল। দরজা খোলা হইবামাত্র নবীন বাবুও নামিলেন। বালকগণ সকলে মিলিয়া নমস্কার করিলেন। তিনিও সকলের হাত ধরিয়া আদর করিলেন। কাহাকেও কোলে লইলেন, কাহারও মুখচুম্বন করিলেন। সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া তাঁহার জিনিষ পত্র লইয়া গাড়ীতে রাখিলেন। নবীন বাবু সকলকে কয়েকখানি গাড়ীতে একে একে বসাইয়া আপনি এক-

খানি গাড়ীতে বসিলেন। গাড়ী সব ক্রমে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। সকলে পরম আনন্দে বাড়ী আসিলেন। গ্রামে আজ যেন মহা উৎসব।

সকলে নবীন বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। মধু চাকর গুড়গুড়ীতে তামাকু দিয়া গেল। প্রাচীন ঠাকুরদাদা মহাশয় ধূমপান করিতে করিতে বালকগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কেমন ভাই! আমি যতদিন ছিলাম না, তোমরা পড়া শুনা বেশ করিতে ত?"

অমূল্য।—"আজ্ঞা হাঁ, দাদা মহাশয়,—আমরা পড়া শুনা ভালই করিতাম। আর তা ছাড়া আমাদের পুস্তকে বিজ্ঞানের কথাও অনেক শিখিয়াছি। কিন্তু আপনি না থাকাতে তেমন সব উপদেশপূর্ণ গল্প শুনিতে পাই নাই। এখন হইবে। আপনি গেলে পর আমাদের বড় মন কেমন করিত।"

নলিন।—"দাদাবাবু! অমূল্য দাদা আমাদের লইয়া অনেক ভাল ভাল গল্প ও উপদেশ শুনাইতেন; আমরা রোজ সন্ধ্যাবেলা একত্রে বেড়াইতে যাইতাম ও সব রকম বইয়ের কথা শুনিতাম। দাদাও আপনার মতন সহজ সহজ কথায় বিজ্ঞানের গল্প বুঝাইয়া দিতেন। আমিও এবারে অনেক গল্প আপনাকে শুনাইব।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। দাদামহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ভাই, বড় বড় বিজ্ঞানের কথাও অনেক শিখিয়াছ। আমি বুড়া মানুষ, একটা সামান্য কথা বুঝাইয়া দাও ত দেখি।—এই যে তামাক খাইতেছি, নল তো মুখে টানিতেছি, কল্‌কেতে তামাক ও আগুন রহিয়াছে; ধূঁয়া মুখে কি করিয়া আসিতেছে?"

এবার নলিন বাবু বড় গোলে পড়িলেন। বিজ্ঞান ত চন্দ্রে, সূর্য্যে, নদীতে ও বায়ুতে। তামাক খাওয়ার গুড়গুড়ীতেও যে বিজ্ঞানের শিক্ষা আছে, তাহা বেচারীর বুদ্ধিতে আসিল না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল :—

"কৈ অমূল্য দাদা ত তাহা শিখাইয়া দেন নাই?"

তখন সকলেই গুড়গুড়ীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কাহারও মুখে আর কথাটী নাই। নবীন বাবু বেশ নির্ব্বিঘ্নে গড়্‌গড়্‌ গড়্‌গড়্‌ করিয়া ঘন ঘন নলে টান দিতে লাগিলেন ও ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া সকলেই ভাবিতে লাগিল। কেহ কেহ এক একটা উত্তর দিতেও লাগিল। কিন্তু কতক দূর যাইয়াই আট কাইয়া যায়। নিঃসন্দেহ স্থিরমীমাংসা কিছুতেই হইল না। অনেক চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া সকলেই বলিল, "ইহা কঠিন কথা। দাদামহাশয় না বুঝাইয়া দিলে হইবে না।"

তখন মাখন বলিল,—"না, সময় লইয়া ভাবিয়া দেখা যাক। আর দাদা বাবুও আজ ক্লান্ত হইয়াছেন, বিশ্রাম করুন, যদি আমরা ঠিক করিতে না পারি, কাল তখন বলিয়া দিবেন।"*

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বালকগণ নিজ নিজ স্থানে গেল। নবীন বাবু বিশ্রাম করিতে গেলেন।



* যদি সখার কোন পাঠকপাঠিকা এই বালকদিগকে বড় অল্পবুদ্ধি মনে করেন, তবে তিনি এ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইলে, আমরা নবীন বাবুর শিষ্যদিগকে বলিব যে, ইহা তাঁহাদেরও জানা উচিত। লেখক সেই সঙ্গে আপনার বয়স ও কোথায় কোন শ্রেণীতে পড়েন, তাহাও লিখিয়া দিবেন। ইহার উত্তর পাইলে বাস্তবিক আমরা সুখী হইব

স্বর্গের ছবি।

প্রাণগত একান্ত ইচ্ছা থাকিলে কার্য্যে নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হওয়া যায়। এক ব্যক্তি ৫০ বৎসর চাকুরি করিয়া প্রায় ৪,০০,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম জন উস্‌লি। উস্‌লি সাহেবের প্রথম ৪৫০ টাকা বাৎসরিক আয় ছিল, তখন ৩০ টাকা দান করিতেন। যখন তাঁহার আয় ৯০০ শত টাকা হইল, তখনও ৪২০ টাকার অধিক বৎসরে খরচ করিতেন না। ইহার পরে ১৩৫০ টাকা আয় হইলেও খরচ বৃদ্ধি করেন নাই। এবং শেষে ১৮০০ শত টাকা আয় হইলে, ৪২০ টাকার বেশী কখন ব্যয় করেন নাই। বাকি টাকা সমুস্তই দান করিয়া গিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে তাঁহার ৫০ বৎসরের চাকুরিতে তিনি প্রায় ৪০০,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

একদিন একটী ১৫ বৎসরের বালিকা লণ্ডনের কোন মিঠাইওয়ালার দোকানে কিছু খাবার কিনিবার জন্য যাই গিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি একজন ভিখারিণী সেই বালিকাটীর নিকট গিয়া কিছু চাহিল। বালিকা পয়সা কয়েকটী বৃদ্ধাকে দিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। যাইবার সময় "খাবার কেনা অপেক্ষা এই ভাল" এই কথাটী তাহার মুখে শোনা গিয়াছিল।

হলদিঘাটের যুদ্ধ ভীষণতম আকার ধারণ করিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী কখন প্রতাপের পক্ষ, কখন বা সেলিমের পক্ষাবলম্বন করিতেছেন। আবার পর মুহূর্ত্তে "জয় প্রতাপের জয়" রবে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। রাণা প্রতাপ সিংহ দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। হঠাৎ নিজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বুঝিলেন এবং আরও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দূরে ঝালাপতি মান্না, রাণার বিপদ বুঝিতে পারিয়া নিজেই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং রাণার নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজচিহ্ন সরাইয়া লইয়া স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। শত্রুরা ঝালাপতি মান্নাকে রাণা মনে করিয়া প্রচণ্ডবেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইল। বীরবর মান্না অদ্ভুত রণনৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক অবশেষে সদলে নিপাতিত হইলেন। জগৎ প্রভু-ভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মান্নাকে আশীর্ব্বাদ করিল। প্রতাপ সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

ক্রমাগত যুদ্ধে রাণা প্রতাপ সিংহ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। নিজের কিছুই নাই। দিল্লীশ্বর আক্‌বরের তাড়নায় আজ কোন পর্ব্বতগুহায়, কাল কোন জঙ্গলে বাস করিতেছেন। সৈন্যদিগকে বেতন দিবেন এমন সংস্থান নাই। চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রী ভাম্‌শা অসীম ধনরাশি লইয়া রাণার চরণে উৎসর্গ করিলেন। সেই ধনরাশির সাহায্যে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যের ভরণপোষণ করা যাইতে পারে। প্রতাপসিংহ সেই বিপুল ধনরাশির সাহায্যে দেবীরক্ষেত্রে মোগলদিগকে পরাভূত করিয়া অল্প কালের মধ্যে বত্রিশটী দুর্গ নিজ হস্তগত করিলেন। ইতিহাসে ভাম্‌শা মিবারের "উদ্ধারকর্ত্তা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন।

ভল্লুকপালিতা কন্যা।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই বালিকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন :—

"গত নবেম্বর মাসে আমি উত্তর-বঙ্গের কোন কোন স্থানে প্রচারে গমন করিয়াছিলাম। জলপাইগুড়ি নগরে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার জেলালুদ্দিন সাহেব তাঁহার গৃহে পরম যত্নে আমাকে অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক, একটি অনাথ শিশুকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন।

কোন অনাথ বালক বালিকা পাইলে আমাদিগের কলিকাতা অনাথাশ্রমে প্রেরণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করায়, তিনি এই বালিকার কথা বলেন। আমি ইহার অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া ইহাকে পাইবার ও দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। তিনি আমায় সঙ্গে লইয়া সহরে ইহাকে অন্বেষণ করিতে চলিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর বাজারে এই অপূর্ব্বমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া বালিকা হাসিয়া অস্থির, হাসি আর থামে না। ডাক্তার ইঙ্গিত করিবামাত্র আমাদের পশ্চাতে হেলিয়া দুলিয়া থপ্ থপ্ করিয়া ভল্লুকের ন্যায় আসিতে লাগিল। মুখের দিকে তাকাইলেই বড় বড় লাটবিচির ন্যায় দুইপাটি দাঁত বাহির করিয়া বিকট শব্দে অনবরত হাসিতেছে, আর দাঁতগুলির ফাটাল ভেদ করিয়া পাহাড়ের ঝরনার ন্যায় টপ্ টপ্ করিয়া লাল পড়িতেছে। হাসিটা দেখিলে এক একবার ভয়ও হয়।

সদয়প্রাণ মিঞা সাহেব ইহাকে বড় ভালবাসিতেন ও যত্ন করিতেন। ইঁহার গৃহে গেলেই বালিকা আহার ও পয়সা পায় সেই জন্যই ইনি ডাকিবামাত্র হাসিতে হাসিতে আসিতে লাগিল, পথে অপর লোকেও ডাকিল, কিন্তু আর কাহারও নিকট গেল না; ইহার হাসি যেমন বিকট হউক না, সর্ব্বদাই হাসে বলিয়া জলপাইগুড়ির আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই নিকট বালিকা প্রিয়। বালক বালিকারা পথে দেখিলেই আমোদ করিয়া ইহার গায় ধূলা দেয়, ঢিল মারে, ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহাতেও ইহার হাসি থামে না।

ইহার মুখের আকারে বুঝা যায় যে, এটী ভুটান পাহাড়ের নিম্নস্থানবাসী অসভ্য লোকের কন্যা। মাথায় লম্বা লম্বা শুষ্ক শোণের ন্যায় চুল চারিদিকে উড়িতেছে, নাসিকারন্ধ্র শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ, দুইটী গাল ও দুইটী কান তৈলাভাবে শীতে ফুলিয়া ফাটিয়া এমন অবস্থা হইয়াছে যে, কুষ্ঠের সঞ্চার বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছিল। আহারীয় বস্তুর রসে মুখমণ্ডল ও হাত দুই খানিতে বেশ এক পুরু কৃষ্ণবর্ণ আবরণ পড়িয়াছে। পথের ছেলেদের কৃপায় আপাদমস্তক ধূলায় ধূসরিত। পরিধানে কোন দয়াবানের প্রদত্ত একখানি রেলি-ব্রাদারের দশহাত থান। কাদায় ধূলায় খাদ্যদ্রব্যের দাগে বস্ত্রের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ভূতেও নিকটে আসিতে অসমর্থ। আমরা ইহাকে সঙ্গে করিয়া জেলাল মিঞার ডাক্তারখানায় আনিলাম, কিছু মিঠাই কিনিয়া দিলাম, আগ্রহের সহিত দুইহাত পাতিয়া আগু বাড়াইয়া লইয়া চপ্ চপ্ শব্দে খাইতে লাগিল।

একটি কমলা লেবু দিলাম। মনে করিলাম বুঝি খোসা শুদ্ধ কামড়াইবে, কিন্তু তাহা না করিয়া খোসা ছাড়াইল, সূতা ও বীচিগুলি শুদ্ধ দুই তিন কোয়া করিয়া গালে দিল এবং দুই একবার মুখ নাড়িয়া বীচি ছিব্ড়া সবশুদ্ধ গিলিতে লাগিল।

আমরা স্থির করিলাম, উহাকে আর যাইতে দিব না। জেলাল মিঞার বাড়ীতে রাখিয়া, যে দিন কলিকাতা যাইব, সেই দিন লইয়া যাইব। কিন্তু একটু অন্ধকার হইবামাত্র কোথা দিয়া যে সে পলাইল, জানিতে পারিলাম না।”

ডাক্তার জেলালুদ্দিন মিঞা ইহার বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—“অনুমান ছয় বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি চা-বাগানের কুলি জঙ্গলে কাজ করিতে গিয়া, একটা ভল্লুকের গর্ত্তে বছর তিনেকের একটি মেয়েকে ভল্লুকের সহিত খেলা করিতে দেখিয়া কৌশল পূর্ব্বক মেয়েকে ধরিয়াছিল। চা-বাগানের সাহেবেরা পুলিষের দ্বারা মেয়েটিকে জলপাইগুড়িতে ডেপুটি কমিশনরের নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি হস্‌পিটালে রাখিয়া দেন।” এই হস্‌পিটাল জেলাল মিঞার ডাক্তারখানার পার্শ্বে থাকায়, মিঞা প্রথম হইতে ইহার সবিশেষ অবগত আছেন। প্রথম যখন হস্‌পিটালে আনা হয়, তখনকার ভীষণ আকৃতি দেখিলে, ইহা মানুষ কি অন্য কোন পশুশাবক তাহা সহসা বুঝা যাইত না। হাড় কয়খানির উপর এক খানি ময়লা চামড়া মাত্র আচ্ছাদিত, লম্বা লম্বা কাদামাখা চুল চারিদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চোক ছুইটি যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে, মুখে অতি বিকট বড় বড় দাঁত, হাতে পায় লম্বা লম্বা নখ। চারি হাতে পায় চলে, মুখ উঁচু করিয়া থাকে, মুখ নীচু করিয়া মাটি হইতে দাঁত দিয়া আহার তুলিয়া খায়। কেহ নিকটে আসিলে বা ধরিতে গেলে তাহাকে আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া দেয়।

মেয়েটি প্রায় দু বছর হস্‌পিটালে ছিল, সেখানেই মানুষের ন্যায় দুই পায় চলিতে, হাতে তুলিয়া আহার করিতে এবং শান্তভাবে মানুষকে ভাল-বাসিতে শিখিয়াছে। ঠিক [illegible] ন্যায় আহার-[illegible] শিখিয়াছে। তথাকার নিয়ম অনুসারে, কোন আরোগ্য-সম্ভব ব্যাধি না থাকা প্রযুক্ত ইহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। অথবা হস্‌পিটালের বাহিরে আপনি গিয়া আহার সংগ্রহ করিতে পারিলে, নিজেই আর হস্‌পিটালে যায় নাই।

এই সময় ইহার প্রতি বাজারের কতকগুলি পতিতা স্ত্রীলোকের অদ্ভুত দয়ার কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। এই পতিতা স্ত্রীলোকেরাই ইহাকে আপনাদিগের কন্যার ন্যায় স্নেহ করিত। তাহাদের অনুগ্রহেই বালিকা বস্ত্রপরিধান, স্ত্রীলোকোচিত লজ্জানিবারণ, জলব্যবহার ও দূরে গিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। উহারা ইহার হাতে চুড়ী পরাইয়া দিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য থাকিলে তাহারা ইহাকে ডাকিয়া খাওয়াইত এবং ইহার তত্ত্বাবধান করিত।”

বালিকা যেখানেই থাকুক, জলপাইগুড়ি জেলার সিবিল সার্জ্জন সাহেবই ইহার অভিভাবক ছিলেন। সেই জন্য আমরা ইহাকে বাজার হইতে ডাকিয়া, একেবারে ইহাকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়া বলিলাম, “আমরা ইহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহি, সেখানে আমাদের অনাথ-আশ্রম আছে, তথায় ইহাকে রাখিব; এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি?” সাহেব জেলাল মিঞাকে ভাল রকম জানিতেন, আমাদের প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিলেন, “আমি জানি ব্রাহ্মদিগের পরোপকারব্রত ঠিক খ্রীষ্টানদিগের মত, এ বালিকা এখানে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আপনারা লইয়া গেলে ইহার বিশেষ উপকার হইবে। এ আমার “সম্পত্তি”, আমি আপনাদিগকে দিতেছি, আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না, আপনারা নির্ভাবনায় লইয়া যাউন।” সাহেব তখন বালিকাকে ইঙ্গিত করিয়া আমার সহিত যাইতে বলিলেন। আমি উহার কর্ণের ও

গণ্ডের ফাটা ও ফুলা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সমস্ত কুষ্ঠব্যাধির সঞ্চার কি না।" সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ও কিছুই নহে।"

দুই তিন দিন চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই রাত্রে ইহাকে আমাদের নিকট রাখিতে পারিলাম না। সন্ধ্যাকালে পলায়ন করিয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট শয়নস্থান—বৃক্ষতলে বালুকার উপর গিয়া শয়ন করিয়া থাকে। শেষ দিন বৈকালে বাজার হইতে ইহাকে একেবারে ষ্টেশনে লইয়া গেলাম এবং গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। জেলাল মিঞা রংপুর যাইবেন, আমাদের গাড়ীতে তিনিও উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় ইহার মুখখানি শুকাইয়া গেল; কি এক প্রকার ভয় পাইল, বুঝিতে পারিলাম না। জেলাল মিঞার সঙ্গে, আবার কতকটা নির্ভয় হইয়া হাসিতে লাগিল। যখন গাড়ী ছাড়িল, তখন গাড়ীর নাড়ার এবং গাছ পালা গুলা দৌড়িতেছে দেখিয়া ইহার মনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল, এদিক ওদিক তাকাইয়া কখন হাসে, কখন বা বিমর্ষভাবে আমাদের দিকে তাকাইয়া দরজা খুলিতে ইঙ্গিত করে। ক্রমে বিমর্ষতাই বাড়িয়া উঠিল, মুখ কাঁদ কাঁদ করিয়া বসিয়া রহিল। খাবার দিলে যে আগ্রহের সহিত দুই হাত পাতিয়া লয়, তাহাকে খাবার দিলাম, ফেলিয়া রাখিল। হালবাড়ী ষ্টেশনে জল খাইবে কি না জিজ্ঞাসা করায়, মুখের কাছে অঙ্গুলি ধরিয়া জল প্রার্থনা করিল। নামাইয়া জল দিলাম, মুখে অঞ্জলি করিয়া জলপান করিয়া আবার গাড়ীতে উঠিল।

পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করিয়া মিঞা সাহেব উহাকে আমার সহিত গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। কোন প্রকার গোলমাল না করিয়া ফুলবাড়ী পর্য্যন্ত আসিল। রাত্রে ফুলবাড়ী ষ্টেশনে নামাইয়া বন্ধুবর বাবু কেদারনাথ বসুর বাসায় ইহাকে লইয়া গেলাম। পথ অনুমান ¼ মাইল, পাছে পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় বাহু ধরিয়া লইলাম, তবুও তিনটা আছাড় খাইল। শরীরটা বড় ভারি, পা এত দুর্ব্বল যে, একটু উচু নীচুতে পা পড়িলেই পড়িয়া যায়। কেদার বাবুর বাসায় ইহাকে একটা মাদুর পাতিয়া শোয়াইয়া, দুইটা খোলে গায়ে চাপা দেওয়ায়, ইহার এত আহ্লাদ হইল যে, কিছুতেই আর হাসি থামে না। প্রাতে উঠিয়া বালকদের সহিত আনন্দে খেলা করিতে লাগিল। পর দিবস হইতে অসংখ্য দর্শক আসিতে দেখিয়া, আবার এমন বিরক্ত হইতে লাগিল যে, এক এক বার তাহাদিগকে তাড়াইয়াও দিয়াছিল। প্রতিবাসীরা সমস্ত দিন অপর্য্যাপ্ত খাবার দেওয়ায় আমাকে বিশেষ কষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল। ফুলবাড়ীর জনৈক ডাক্তার প্রায় অর্দ্ধ পোয়া আদা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ইহার হাতে দিতে লাগিলেন, বালিকা হাসিতে হাসিতে গালে দিয়া অবিকৃত মুখে খাইয়া ফেলিতে লাগিল, ঝাল লাগার কোন চিহ্নই দেখাইল না।

রাত্রের গাড়ীতে আমরা কলিকাতায় রওনা হইলাম। ভোরের সময় সারাঘাটে ষ্টীমারে উঠিলাম, উঠিবার সময় অন্ধকারে কোন গোল করিল না, কিছুক্ষণ পরে ষ্টীমারের বাঁশির শব্দ শুনিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আলো হইলে চারিদিক জলময় দেখিয়া বিষণ্নমুখে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, ষ্টীমার চলিবার সময় তাহার নাড়ার ও জলের তরঙ্গ দেখিয়া ভয়ে ইহার মুখের ভাব এমন হইল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। যখন এ পারে আসিলাম, তখন কিছুতেই নামিবে না, খুঁটি জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক কষ্টে টানাটানি করিয়া তীরে আনিলাম, আর সকল দুঃখ দূর হইল, বেশ হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে আপনি গাড়ী[illegible] উঠিল।

চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, উঠাইয়া দিলাম। উঠিয়া গাছ পালা দেখিয়া ইঙ্গিত করিল যে, এই দিকে চল, জলের দিকে যাও না।

চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট বুঝিলাম যে, ইহাকে একবার নামান নিতান্ত আবশ্যক, নামাইয়া প্রস্রাবের ঘরে বসাইলাম, বড়-রকম আরম্ভ করিল। ও দিকে গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল, ভল্লুককে যত টানাটানি করি, সে বড় ব্যাপারে ব্যস্ত উঠিবে কেন, গাড়ী ছাড়িয়া-দিল। আমার পোর্টমেণ্ট্ বাক্স ও অন্যান্য দ্রব্য কামরায় খোলা ছড়ান রহিয়াছে, সে সমস্ত গাড়ীতেই রহিল। আমি দ্রব্যাদির কথা জানাইবার জন্য ষ্টেশনের ঘরে গিয়াছি; তখন উঠিয়া আসিয়া বাহিরে দেখিল যে, গাড়ীও নাই, আমিও নাই। দেখিয়া প্লাট-ফরমে আছাড় পিছাড় করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। পরে আমি বাহিরে আসিতেছি দূর হইতে দেখিয়া হাসিয়া নিকটে দৌড়িয়া আসিল। জল লইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলাম, মুখ চোক হাত ধুয়াইয়া মিঠাইওয়ালার দোকানে লইয়া আহার করাইলাম, বেশ চারি দিকে বেড়াইয়া খেলা করিতে লাগিল। আমি সমস্ত রাত্রি উহাকে চৌকি দিয়াছিলাম একবারও চক্ষু বুজি নাই। বেঞ্চের উপর বসিয়া একটু ঢুলুনী আসিয়াছে; চক্ষু মেলিয়া দেখি, ভল্লুক নিকটে নাই, চারি দিক অন্বেষণ করিলাম, অনে-ককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন সন্ধান পাইলাম না। প্রস্রাবের ঘরে গিয়া দেখি দুটি পা ময়লা মাখা, ভল্লুক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আছে। অবস্থা দেখিয়া বুঝা গেল, বালিকার পেটের অসুখ হইয়াছে। পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে গাড়ী আসিল, তাড়া-তাড়ি কার্য্য শেষ করিয়া উহাকে লইয়া উঠিলাম এবং সন্ধ্যার পর কলিকাতায় পঁহুছিলাম, পথে কোন প্রকার গোলমাল করে নাই।

২০নং পটুয়াটোলা লেন আমাদের প্রচার-কার্য্যা-লয়। ইহাকে তথায় লইয়া আসিলাম। খুব আনন্দের সহিত হাসিতে লাগিল। রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিয়া রহিল। প্রাতে উঠিয়া দেখি, উঠানটি রীতিমত [illegible]ষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। আমাকে দেখিবা [illegible]িতে লাগিল। আমি উহাকে পরিষ্কার [illegible] দিলাম, হাসিতে হাসিতে [illegible]র্য্যানুরোধে [illegible]রে চলিয়া গেলাম। মধ্যাহ্নকালে আসিয়া দেখি, আমাদের ভৃত্য উহাকে আভাং করিয়া তেল মাখাইয়া কলের নীচে বসাইয়া স্নান করাইয়া দিয়াছে। দেখিয়া বড় আহ্লাদ হইল। ভল্লুক আমায় দেখিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু শুনিলাম, আমি বাহিরে যাইবার পর মহা গণ্ডগোল লাগাইয়াছিল, বার বার রাস্তায় বাহির হইয়া যাইতে চায়। কাঁদিয়া এমন অস্থির হইয়াছিল যে, খাবার দিয়া ও নানা রকম চেষ্টা করিয়া কিছুতেই ভুলাইতে পারে নাই। আমায় দেখিয়া এমন পরিবর্ত্তন, যেন আর সে মেয়ে নয়। ভাত খাইবার জন্য পাচক ডাকিল, কলা পাতা পাতিল তাহার উপর জলের ছড়া দেওয়া হইল, ভল্লুক হাত দিয়া পাতা খানি আমাদের মত মুছিয়া দুই [illegible] তাহার শির ধরিয়া তুলিল এবং বেশ করিয়া জলটুকু ঝাড়িয়া লইল। ভাত, তরকারি ও ডাল দেওয়া হইল, খাবা খাবা করিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাতে খাইবার চেষ্টা করি-তেছে দেখিয়া, বাম হাতটা টানিয়া ধরায় ডান হাত দিয়া আহার আরম্ভ করিল। যেমন করিয়া খাইতে দেখাইলাম, তেমনি করিয়া গুছাইয়া খাইতে লাগিল, ডালের সহিত একটা লঙ্কা ছিল, সেটাও গালে দিল, কিন্তু একটুও মুখ বিকৃত করিল না। আমরা কল-তলায় ডাকিয়া যেমন দেখাইলাম, ঠিক তেমনি করিয়া হাত মুখ ধৌত করিল।

সমস্ত দিন লোকে ইহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া খাদ্যাদি দেওয়ায় খুব খুসী হইয়া থাকিল। বৈকালে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করায়, এক খানি গাড়ী আনাইয়া উহাকে তাহার মধ্যে উঠাইতে যাই, কিছুতেই উঠিবে না, বিরক্তির চীৎকার আরম্ভ করিল, বার বার গাড়ীকে ধাক্কা মারিতে লাগিল। শেষে ফুটপাথে বসিয়া পড়িল, অগত্যা হাঁটাইয়া লইয়া চলিলাম। যথাস্থানে পঁহুছান পর্য্যন্ত আর কোন গোলযোগ হইল না, কিন্তু তাঁহাদের গৃহে জনতা দেখিয়া রাগিয়া উঠিল, একবারও হাসিল না। আসিবার সময় একটা বালিকাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল, পথে ফিরিয়া আসিবার সময় একটা বালককে সম্মুখে পাইয়া সজোরে একটা ধাক্কা মারিল। পরে বাটীর দিকে আর কিছুতেই ফিরাইতে পারি না, বরাবর

সোজা চলিয়া যাইতে লাগিল। কি করিতে চায় দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, পরে বলপূর্ব্বক ফিরান আবশ্যক দেখিয়া তদনুরূপ চেষ্টা করায়, অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল। টানাটানি করায় পথে বসিয়া পড়িল, লোক জমিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একবার তুলিবার চেষ্টা করিয়া সফল হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে গৃহ পর্য্যন্ত আসিল।



আমার স্ত্রী পীড়িতা, অনাথাশ্রম তেমন ঘোরা ঘোরা স্থান নহে, এ অবস্থায় এ জানয়ারকে কোথায় রাখি ভাবিয়া দাসাশ্রমে দয়ালু বন্ধুদিগের নিকট লইয়া গেলাম। ইতিহাস শুনিয়া তাঁহারা রাখিলেন এবং উহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সেখানে ইহাকে দেখিবার জন্য এত অধিক পরিমাণে ভীড় হইতে লাগিল যে, তাঁহাদের আশ্রমের কাজ কর্ম্ম পর্য্যন্ত বন্ধ হইতে লাগিল। অগত্যা অনাথাশ্রমে আনিলাম। এখন বালিকা গাড়ী চড়িতে শিখিয়াছে এটী দাসাশ্রমের [illegible] মহাশয়দিগের কৃপায় শিখিয়াছে। তথায় আরও অনেক বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে। এবার প্রস্তাবক Z ড়িরা যায়, এবং দিন দিন ইহার যে প্রকার দ্রুত উন্নতি হইতেছে তাহাতে দু এক মাস পরে কিরূপ হয় তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে, এজন্য তাহা দেখিয়া আমাদেরও আর একবার ইহার উন্নতির বিষয় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দাসী —সেলাই—দস্তানা, আপনার প্রবন্ধটী শীঘ্রই সখায় বাহির করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা।—নববর্ষ, জানুয়ারী মাসের সখায় প্রকাশিত হইতে পারে।

"গ্যাসের আলোক" লেখকের নাম ও ঠিকানা নাই। নাম ও ঠিকানা না পাইলে আমরা কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না।

বাবু অক্ষয়কুমার সরকার, বোয়ালিয়া।—"রাণী ভবানী"র বাকি অংশ পাঠাইবেন। কিন্তু ইহা সখায় বাহির হইবে কি না এখনও বলিতে পারি না।

সমালোচনা।

Sea-Voyage Movement :—সখায় বালক বালিকাদের উপযুক্ত পুস্তক অথবা সংবাদপত্র ভিন্ন অন্য কিছুর সমালোচনা হয় না।

নীতিগাথা :—শ্রীপ্যারীশঙ্কর গুপ্ত প্রণীত ও বগুড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা। সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য। বালক বালিকারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা পড়িলে আনন্দিত ও উপকৃত হইবে। প্যারীবাবু আমাদের একজন লেখক, এই পুস্তক সম্বন্ধে অধিক কিছুই লেখা আমাদের ভাল দেখায় না।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। আলোক।